আদান
প্রদান

কথা ভারতী:

হিন্দী গল্পগুচ্ছ

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

কথা ভারতী

হিন্দী গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক
ডঃ নামবর সিং
অনুবাদ
ইন্দ্রাণী সরকার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

Original Title :
KATHA BHARATI : HINDI KAHANIA
Bengali Translation :
KATHA BHARATI : HINDI GALPAGUCCHA

ডিসট্রিব্যুটার :
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমাণ্ড ষ্ট্রীট
কলিকাতা-1

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী-16
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-4 থেকে মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

এক বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও একে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সমস্ত দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। ভারতের যত রকমের ভাষা আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো একটি দেশে এত রকমের ভাষা নেই। কিন্তু দুঃখের কথা আমরা নিজেদের প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভাষা সম্পর্কে একান্তই উদাসীন। তাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যতটা জ্ঞান আছে ততটা জ্ঞান নিজেদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নেই।

সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে আমাদের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ মেলে।

পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক, তারা সবাই স্বাধীন। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভাষাও আলাদা, কিন্তু তাদের সাহিত্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান আছে আমাদের নিজেদের ভাষাগুলি সম্বন্ধে ততটা নেই। এ এক অদ্ভুত বৈষম্য। য়ুরোপের যে কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাকী সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়।

অভিন্ন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে একের অন্যের ভাষা জানবার কোনও আগ্রহই নেই। পরিবর্তন সুরু হয়েছে, ধীর মন্থর গতিতে।

এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ সমকালীন সাহিত্য গ্রন্থের অন্যান্য সব ভাষায় অনুবাদ করবার

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এজন্যে সাধারণ পাঠকের রুচিমাফিক বই বেছে নেওয়া হচ্ছে। যেমন গল্প, উপন্যাস, চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মচরিত ইত্যাদি। এই গ্রন্থমালায় নাম করা ও জনপ্রিয় বইগুলিই বেছে নেওয়া হয়। এইগুলির মাধ্যমে সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ভাব-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্খা প্রতি-ফলিত হচ্ছে কিনা সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

আশা করা যায় এই পরিকল্পনা বিভিন্ন ভাষাভাষী নাগরিকদের একের অন্যকে জানতে, বুঝতে ও নিজেদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা ঐকতান সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বাছাই করে অনুবাদ করা বড় সহজ কাজ নয়।

এই ব্যাপারে যাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন আর যাঁরা অনুবাদ করছেন তাঁদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁদের পথনির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এ পরিকল্পনার রূপায়ন সফল হতো না।

বালকৃষ্ণ কেশকর

ভূমিকা

1915 সালে সরস্বতী পত্রিকায় চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর 'উসনে কহা থা' প্রকাশিত হয়। এই কাহিনী ভবিষ্যতে গোগলের ওভার-কোটের মত হিন্দী সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করবে কেউই তখন তা ভাবতে পারেন নি। 'উসনে কহা থা'কে হিন্দী সাহিত্যের ঠিক প্রথম গল্প বলা যায় না।

সম্ভবতঃ কিশোরীলাল গোস্বামীর 'ইন্দুমতী' (রচনাকাল 1900) কিংবা তাঁর 'প্রণয়িণী পরিণয়' (রচনাকাল 1887)-ই হিন্দী সাহিত্যের প্রথম গল্প। সমকালীন অন্য কোনো গল্পও থাকতে পারে।

'উসনে কহা থা'-র আগেও হিন্দী সাহিত্যে বঙ্গমহিলার 'দুলাই-ওয়ালী' (1907), বৃন্দাবন লাল বর্মার 'রাখী বন্ধ ভাই' (1909), জয়শঙ্কর প্রসাদের 'গ্রাম' (1911), রাজা রাধিকারমণ প্রসাদ সিংয়ের 'কাণো মেঁ কঙ্গনা' (1913), বিশ্বম্ভর- নাথ শর্মা কৌসিকের 'রক্ষা-বন্ধন' (1913) প্রভৃতি মৌলিক রচনারও নজির আছে। গোড়ার দিকের এইসব কাহিনীর উল্লেখ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসেই শুধু আছে। কিন্তু হিন্দী পাঠকদের মনে 'উসনে কহা থা' আজও অবিস্মরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে গুলেরীজীও এই একটি রচনার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন। এই গল্প রচনা তাঁর জীবনে একটা দৈবানুগ্রহ। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। ভাষাশাস্ত্র ও পুরাতত্ত্বে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিলো। তিনি আরও দুটি গল্প লেখেন: 'বুদ্ধু কা কাঁটা' (1911) আর 'সুখময় জীবন' (1911 থেকে 1915-র মাঝামাঝি)। তিনি জাত গল্প-লিখিয়ে ছিলেন না, মাঝে মধ্যে কখনও-সখনও লিখতেন। 37 বছর বয়সে 1920 সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সব দিক বিচার করলে দেখা যায় যে হিন্দী গল্পের ইতিহাসে 'উসনে কহা থা' একটি সুখপ্রদ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

তবুও 'উসনে কহা থা'-র মত গল্প নিতান্তই অভাবনীয় নয়, এর বিষয়বস্তু যুগোপযোগী আদর্শের আলেখ্য—প্রেমে আত্মবলিদান।

প্রথম দিকে আদর্শের জন্যেই গল্পটি প্রশংসালাভ করে। রচনা-শৈলির সংযম ও নিখুঁত বাস্তব চিত্রাঙ্কনের দিকেও লেখকের সজাগ দৃষ্টি ছিলো। রামচন্দ্র শুক্লার সমালোচনায় এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন: 'এই বাস্তবমুখী কাহিনীর মধ্যে দিয়ে রুচিবোধ ও ভাবের উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে। অতি সাধারণ, মামুলী কাহিনী, কিন্তু এতে প্রেমের এক স্বর্গীয় ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে—প্রেমের স্নিগ্ধ কমণীয়তা, প্রেমের নির্লজ্জ রূপ নয়। কাহিনীর কোথাও প্রগলভতা কিংবা বেদনার বীভৎস বর্ণনা নেই। মনের সুকোমল বৃত্তির ওপর কোথাও আঘাত করা হয়নি। ঘটনাই কাহিনী বিবৃত করেছে, গল্পের চরিত্র নয়। লেখকের সংযত রচনা-ভঙ্গী গল্পের আদর্শবাদের চেয়েও প্রশংসনীয়। সমকালীন অন্যান্য গল্পের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। বাস্তব-বাদই এই সংযত রচনার আধার। প্রাণবন্ত, সজীব ও মর্মান্তিক ঘটনার চয়ন ও সুসামঞ্জস্য বিন্যাসই লেখকের বাস্তববোধের নিদর্শন। কাহিনী লেখা হয়েছে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পটভূমিকায়। বর্তমান হিন্দী গল্পের বৈশিষ্ট্য এই, এখান থেকেই তার প্রারম্ভ। অমৃতসরের বাজারের হৈ-হট্টগোল, জার্মানীর যুদ্ধক্ষেত্রে শিখ সিপাইদের পাঞ্জাবী লোকগীত, মরণাপন্ন লহনা সিং-এর প্রলাপের মধ্যে তার দেশের ঘর-বাড়ীর হুবহু বর্ণনার মধ্যেই লেখক স্থানীয় পটভূমিকার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দী কাহিনীর মধ্যে রহস্যের জাল বুনে পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখার প্রচলিত পথ বর্জন করে তিনি বাস্তবধর্মী মানবজীবনের কাহিনীকেই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হন। ভাষার ক্ষেত্রেও 'উসনে কহা থা' এক নতুন পথের দিশারী। কাহিনীর ভাষা প্রাণবন্ত, হিন্দী কাহিনীর ক্ষেত্রে এও অভিনব। এরই অভাবে হিন্দী গল্পের গতিপথ এতদিন অবরুদ্ধ ছিলো।

এছাড়া এই গল্পে ফ্ল্যাশ-ব্যাকেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পঁচিশ বছরের ঘটনা এই পদ্ধতির সাহায্যে অতি সুনিপুনভাবে বলা হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে কাহিনীকার ফ্ল্যাশ-ব্যাকে ঘটনার বর্ণনায়

সিদ্ধহস্ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয় 1914 সালে। আর এই কাহিনী লেখা হয় 1915 সালে। যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পে সেই সময়কার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। ভারতীয় গল্পের ইতিহাসে এর নজীর বড় একটা নেই।

হিন্দী গল্পের সুরু এইভাবে। এটা হিন্দী গল্পের পক্ষে সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়।

হিন্দী গল্পের বিকাশকে অপ্রতিহত রাখতে এগিয়ে এলেন অমর কথাশিল্পী প্রেমচন্দ (1880-1936)। 'সরস্বতী'-তে 1915 সালে প্রকাশিত হয় 'উসনে কহা থা'। 1916 সালে প্রেমচন্দের 'পঞ্চ পরমেশ্বর'। 'উসনে কহা থা'-র পর প্রেমচন্দ হিন্দী গল্পকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে একেবারে গ্রামের পটভূমিকায় নিয়ে গেলেন। 'পঞ্চ পরমেশ্বর' গ্রামের পটভূমিকায় লেখা।

প্রাচীন উপাখ্যান ও কাহিনীর এই সাবলীল ও সজীব রূপান্তর পাঠকদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনলো। ইংরেজি ও বাংলা গল্পের সঙ্গে হিন্দি গল্পের যোগসূত্রের কথা এতদিন ধরে যাঁরা চিন্তা করে আসছিলেন তাঁদের চিন্তায় ছেদ পড়লো।

হিন্দী গল্পের মৌলিক অবদান পাঠকসমাজের কাছে স্বীকৃতি পেলো। প্রেমচন্দ গ্রামের পটভূমিকায় ও গ্রাম্য ভাষায় অনেক কাহিনী লিখেছেন। ওঁর বেশ কয়েকটি গল্প সরাসরি এইভাবে সুরু হয়েছে : "কোন এক গাঁয়ে শঙ্কর নামে এক চাষা থাকতো। জাতে সে কুরমী। সহজ সরল গরীব লোক। নিজের ধান্ধা নিয়েই ব্যস্ত। কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। একদিন সন্ধ্যায় এক সন্ন্যাসী তার দোরে আস্তানা গাড়লো।" ('সওয়া সের গেহুঁ')। বলাই বাহুল্য, সোজা ও সহজভাবে গল্প বলার এই রীতি ভারতের প্রতিটি গ্রামের প্রতি জনেরই জানা। প্রেমচন্দ তাঁর নিজস্ব রচনা-শৈলীর সাহায্যে কাহিনীগুলোকে এমন সরস ও সহজ করে লিখলেন যেন মনে হয় কেউ গল্প বলে চলেছে, আর শ্রোতা গল্প শুনে যাচ্ছে। পড়ার চেয়ে শোনায় বেশী আনন্দ।

এই ধরাবাঁধা কাঠামোয় প্রেমচন্দ তাঁর সমস্ত কাহিনী রচনা করেন নি। উনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন 'কাহিনী অনুভূতির বস্তু, তাকে নিয়মে বাঁধা যায় না। ভাবপ্রকাশে যখন সাহায্য করবে তখনই নিয়ম মানবো, ভাবপ্রকাশে বাধার সৃষ্টি করলে তা সর্বতোভাবেই পরিহার্য।' তাই প্রয়োজনমত তিনি তাঁর রচনাভঙ্গীর পরিবর্তন করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনায় তিনি বিভিন্ন রচনা শৈলী গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব যেমন নেই, তেমনি তার প্রকাশ-ভঙ্গীর। ভাষা, ভাব আর কাহিনীর চমৎকারিত্বে তিনি একজন অপরাজেয় কথাশিল্পী। 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী'র মির্জা ও মীর চরিত্র থেকে সুরু করে 'দো বৈলোঁ কী কথা'-র প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। তাঁর বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রেমচন্দ সবশুদ্ধ দুশো পাঁচিশটি গল্প লিখেছেন। সমানে বিশ বছর ধরে তিনি একভাবে লিখে গেছেন। আদর্শমুখী বাস্তববাদ থেকে সুরু করে সমালোচনামুখী বাস্তববাদের দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন। স্বভাবতই এই সময়ে গল্প সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে। পরিণত সাহিত্যিক জীবনের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ দেখা যায় তাঁর শেষের দিকের রচনায়। 'পুষ কী রাত' (1930) ও 'কফন' (1936) তাঁর কাহিনীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় প্রেমচন্দ নিজের নোটবুকের এক জায়গায় লিখেছিলেন: Tales of misery told in joyful style—অর্থাৎ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে আনন্দ ধারায়। 'পুষ কী রাত' আর 'কফন' এর এটাই সারমর্ম। চেখবের রচনা-বৈশিষ্টের কিছুটা ছাপ এই দুই গল্পে সুস্পষ্ট। প্রেমচন্দ হিন্দী গল্পকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

জয়শঙ্কর প্রসাদ (1889-1937) হিন্দী গল্প-সাহিত্যে প্রেমচন্দের প্রায় সমসাময়িক। হিন্দী গল্প সাহিত্যকে তিনি তাঁর কাব্য ও নাটকীয় প্রতিভায় সমৃদ্ধ করেন। প্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক

ও সৌন্দর্যবোধ ছন্দবহুল। তাঁর হাতে পড়ে হিন্দী গল্প-সাহিত্য রোমান্টিক ও কাব্যময় হয়ে ওঠে। তাঁর বেশীর ভাগ গল্পই রোমান্টিক প্রেমের। গল্পের মধ্যে তিনি সুন্দর রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলতেন। তাই তাঁর গল্পে পাওয়া যায় প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্যের কাব্যময় বর্ণনা, অতীত দিনের হুবহু নিখুঁত ও মনোমুগ্ধকর চিত্রাঙ্কন। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই মধ্যযুগীয় শৌর্যের প্রতীক। এই সব চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে রোমাঞ্চকর কার্যাবলীর মাধ্যমে। তাঁর গল্পের ভাষাও অতিমাত্রায় নাটকীয় ও মার্জিত, কাব্যময় ও ভাবময়। গল্প রচনায় প্রসাদ বাস্তবের চেয়ে বেশী কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে এক মায়াবী কুহকের সৃষ্টি করতেন যা সৌন্দর্যে মনোরম। তাঁর বিভিন্ন গল্প-সংগ্রহ 'ছায়া', 'ইন্দ্রজাল', 'আকাশদীপ' ইত্যাদির নামই গল্পের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। তাঁর গল্প এতো রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর কোথাও না কোথাও স্থানীয় পরিবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে 'গুণ্ডা' বেনারসী প্রসাদের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প বলা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রেমচন্দ ও প্রসাদ দুজনেই বেনারসের বাসিন্দা। একই সময়কার গল্পলেখক হয়েও তাঁদের রচনাশৈলী ভিন্নমুখী। এঁদের এই বিভিন্নতার ফলে হিন্দী গল্প সাহিত্যে এককালে দুটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়—প্রেমচন্দ-গোষ্ঠী ও প্রসাদ-গোষ্ঠী। তৎকালীন লেখকরাও এই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন—যাঁরা প্রেমচন্দকে অনুসরণ করতেন তাঁরা প্রেমচন্দ-গোষ্ঠী, আর যাঁরা প্রসাদকে অনুসরণ করতেন তাঁরা প্রসাদ-গোষ্ঠী। এখনও কিছু লোক আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে হিন্দী গল্পের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে এঁদের দুজনের ভিন্নমুখী রচনাশৈলীতে। কিন্তু এই ধরণের মন্তব্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। খুব বেশী বললে এই কথা বলা যেতে পারে যে হিন্দী কাহিনীর বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেমচন্দ যদি হিন্দী

গল্পকে বাস্তবমুখী করায় প্রয়াসী হয়ে থাকেন তো প্রসাদ তাকে সংবেদনশীল করায় সচেষ্ট হন। এই যুগে আরো অনেক কাহিনী-কারের আবির্ভাব হয় যাঁদের নাম প্রসঙ্গক্রমে করা যেতে পারে। এঁরা হচ্ছেন সুদর্শন, বিশ্বম্ভর নাথ শর্মা কৌশিক, পাণ্ডেয় বেচন শর্মা 'উগ্র', চতুরসেন শাস্ত্রী ও ভগবতী প্রসাদ বাজপেয়ী। এঁদের প্রত্যেকেরই গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গী ছিলো। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান কথাশিল্পী।

প্রেমচন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আর একজন প্রতিভাশালী গল্প লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। এঁর নাম জৈনেন্দ্র কুমার (1905)। প্রেমচন্দের প্রভাবযুক্ত হয়েও তাঁর রচনা এতো ভিন্ন-মুখী যে এঁদের দুজনের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করা দুষ্কর। জৈনেন্দ্রের গল্প লেখার সহজ ও সরল ভঙ্গীটি প্রেমচন্দের কাছ থেকেই নেওয়া। গল্প লেখার এই সহজ ও সরল ভঙ্গিমাটি জৈনেন্দ্র কুমারের হাতে আরো পরিচ্ছন্ন রূপ পায়। আর হিন্দী গল্প সাহিত্য সম্ভবত এই প্রথম জৈনেন্দ্রের সুনিপুণ রচনাশৈলীর মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদালাভ করলো। তাঁর গল্পগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাঞ্জল ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল—যা অন্যত্র দুর্লভ। যে কোনো বিষয়, যে কোনো পরিবেশ তাঁর সৃজনী প্রতিভায় গল্পে রূপান্তরিত হতে পারতো। সমস্যাসঙ্কুল জীবনের বড় বড় সমস্যা তাঁর গল্পে স্থান পায়নি। জীবনের ছোট ছোট সমস্যা ও তার সুষ্ঠু সমাধানই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। তাই হিন্দী সাহিত্যে তাঁকে একজন 'মনোবৈজ্ঞানিক' ও 'মনোবিশ্লেষণী' গল্প লেখক হিসাবে অভিহিত করা হয়। এটা কিন্তু অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জৈনেন্দ্র হিন্দী গল্পকে ঘটনাবহুল বাহ্য ঘটনা থেকে সরিয়ে এনে মনের অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন—হৃদয়ের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতি তাঁর গল্পে স্থান পেলো। ঠিক এই কারণে কোনো কাহিনী-কারকে 'মনোবিশ্লেষণকারী' বলা যেতে পারে না। জৈনেন্দ্রের অধিকাংশ গল্পই অন্তর্মুখী চিন্তার বিশ্লেষণ ও সত্যের অনুসন্ধান।

মহাত্মা গান্ধীর গদ্য রচনার মধ্যে যেমন স্বচ্ছ, সাবলীল ও অকপট সত্য নিহিত আছে, ঠিক তেমনি আছে জৈনেন্দ্রের গল্প রচনায়। প্রেমচন্দ তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে সামাজিক বিপ্লব আনার চেষ্টা করেন, জৈনেন্দ্র কুমার গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার প্রয়াসী হন। জৈনেন্দ্র কুমার প্রায় শ' খানেক গল্প লিখেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্প নৈপুণ্যের জন্যে গোটা বারো গল্প চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এর পরেই গল্পের ক্ষেত্রে দুজন নতুন লেখকের আবির্ভাব: যশপাল (1903) আর অজ্ঞেয় (1911)। এঁরা আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন প্রেমচন্দ ও প্রসাদের যৌথ অবদানের কথা। 1940-এ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটা ঢেউ আসে। যশপাল ও অজ্ঞেয় ঠিক এই যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁদের লেখনী ধরেন। সামাজিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। জীবনবোধের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন সঙ্কট দেখা দেয়। গান্ধীবাদের আদর্শে আস্থা না থাকায় নব্য-পন্থীরা মার্কস্ আর ফ্রয়েডের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। বিচার-বোধের এই দ্বন্দ্বের ছাপও সাহিত্যের ওপর এসে পড়ে। সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য ও অসাম্যের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয় যশপালের গল্পে। অজ্ঞেয় এর অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন মানুষের জীবনের সুপ্ত কামনা-বাসনায় জটাজালই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হলেও তাঁরা পূর্ব-সূরীদের গতানুগতিক আদর্শ ছেড়ে সমালোচনামূলক বাস্তবমুখী কাহিনী রচনায় অগ্রণী হলেন। যশপালের প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'পিঁজরে কী উড়ান' (1938) আর অজ্ঞেয়ের প্রথম কাহিনী-সংগ্রহ 'বিপথগা' (1937) প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই দুই গ্রন্থে এঁদের ভিন্নদৃষ্টি সুস্পষ্ট। অজ্ঞেয়ের প্রথম দিকের রচনায় ভাবের প্রাধান্য ছিলো। ভাষাও ছিলো অতি মাত্রায় কাব্যময়। তাঁর চিন্তাধারার জটিলতা ক্রমশঃ পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট রূপ

নেয়। 'রোজ' গল্পের সঙ্গে তখনই পাঠকদের পরিচয় ঘটে। এই গল্পই পরে 'গেংগ্রীন' নামে প্রকাশিত হয়। 'রোজ' বা 'গেংগ্রীন'এর সুরু এইভাবে: 'দুপুরে সেই নির্জন আঙ্গিনায় পা দিতেই মনে হোলো যেন কোনো অভিশাপের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, অভিশপ্ত ও বিষাক্ত আবহাওয়া, তবু কেমন যেন কম্পমান, ঘনীভূত ও থমথমে।' এই রকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন হিন্দী গল্প সাহিত্যে শুধু যে এটা অভিনব তাই নয়, ভাষায় ব্যক্ত পরিবেশও সম্পূর্ণ নতুন। অজ্ঞেয় হিন্দী গল্প-সাহিত্যে এক নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক।

অন্যদিকে যশপাল। তাঁর 'দুঃখ কা অধিকার' (জ্ঞান-দান) গল্পটি ব্যঙ্গরসাত্মক। তাঁর গল্প পড়লে সামাজিক বৈষম্যের চিত্র পাঠকদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং সেটাই তাদের সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। একদিকে এক পুত্রশোকাতুরা গরীব মালিনী, সমর্থ ছেলের মৃত্যুতে যার কাঁদবার পর্যন্ত অধিকার নেই। অন্য দিকে ধনী মহিলা, যার শোক প্রকাশের কথা সারা সহরের লোকের মুখে মুখে। যশপাল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ও সুকৌশলে এই সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন—সুখভোগেরও অধিকার যেমন অর্জন করতে হয়, তেমনি দুঃখেরও। যারা গরীব তাদের দুঃখ প্রকাশেরও কোনো সহজাত অধিকার নেই। এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে যশপাল তাঁর গল্পে ব্যঙ্গ রসের সৃষ্টি করে সমাজ-ব্যবস্থাকে কশাঘাত করেছেন। প্রথমে তিনি একটি বিষয় ঠিক করে নিতেন। তারপর ঠিক করতেন তাঁর বক্তব্য। তার সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা সাজিয়ে তিনি গল্প লিখতেন। পাঠক মনকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে তাঁর ব্যঙ্গ কশাঘাতে বিপর্যস্ত করে তুলতেন। প্রেমচন্দের মত একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে যশপালও গল্প লিখতেন। শ্লেষের মধ্য দিয়ে শ্রেণী-বৈষম্যকে আঘাত করা এবং শ্রেণী-বৈষম্যের ভণ্ডামির আবরণ উন্মোচন করাই ছিলো তাঁর গল্পগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ফুলো কা কুর্তা' কাহিনীটি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দী

গল্পে অজ্ঞেয় মানুষের সুপ্ত কামনা-বাসনার রূপকেই সংবেদনশীল করে তুলেছেন। আর যশপাল গল্পে মানুষের অধিকারের বাস্তব রূপটাই ফুটিয়েছেন।

ভগবতী চরণ বর্মা আর উপেন্দ্র নাথ অশ্কের আবির্ভাবও ঠিক এই সময়ে। অশ্ক প্রেমচন্দের বাস্তবমুখী কাহিনীর মূল সুরকে গ্রহণ করে তাঁর কাহিনীকে আরও বাস্তবমুখী করে তুলতেন। ভগবতী চরণ বর্মার লেখা পড়ে 'ফসান–এ-আজাদ'-এর লেখক সরশারের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। তাঁর লেখার মধ্যে ফক্কুড়ি পর্য্যায়ের চটুলতা থাকতো। তাঁর নামকরা গল্প 'দো বাঁকে'-তে তার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম করা যেতে পারে। ইনিও ছোট চটুল গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত। 'নিরালা' আর একজন উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প লেখক। তাঁর অনুপম প্রতিভার বলেই তিনি হিন্দী গল্প সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

পরবর্তী কয়েক বছরের হিন্দী গল্প সাহিত্যের ইতিহাস গতানুগতিকতার ইতিহাস। ভারত স্বাধীন হবার পর নতুন যুগের সূচনা। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃজনী-প্রতিভার আবির্ভাবই স্বাভাবিক। 1960-এর গোড়ায় নতুন চেতনার উন্মেষ দেখা দেয়। 'নতুন কবিতা'র ধাঁচে 'নতুন কাহিনী' লেখার তাগিদ দেখা দেয়। নতুন যাঁরা এলেন, অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে তাঁরা সবাই যে নতুন ধাঁচে গল্প লিখতে সুরু করলেন তা নয়। কিন্তু একদল নবীন কাহিনীকারের সৃষ্টি হোলো যাঁরা গল্প লেখায় সক্রিয় অংশ নিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: রাঙ্গেয় রাঘব, ফনীশ্বর নাথ রেনু, দ্বিজেন্দ্রনাথ মিশ্র, 'নির্গুন' ভীষ্ম সাহানী, কৃষ্ণা সোবতী, কৃষ্ণ বলদেব বৈদ্য, রাম কুমার, কমল যোশী, লক্ষ্মী নারায়ণ লাল, হরিশঙ্কর পরসাই, মোহন রাকেশ, অমরকান্ত, উষা প্রিয়ংবদা, মন্নু ভাণ্ডারী, নির্মল বর্মা, মার্কণ্ডেয়, রাজেন্দ্র যাদব, কমলেশ্বর, শেখর যোশী, শিবপ্রসাদ সিং, ধর্মবীর ভারতী, রঘুবীর সহায়, মনোহর শ্যাম যোশী, শৈলেশ মাটিয়ানী।

হিন্দী গল্প সাহিত্যে এতগুলি সৃজনী-প্রতিভার একসঙ্গে সমাবেশ সত্যিই এক অভাবনীয় ঘটনা। ভৈরব প্রসাদ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'কহানী,' পরে 'নঈ কহানিয়াঁ'-তে এই লেখকগোষ্ঠী তাঁদের কাহিনী প্রকাশের প্রচুর সুযোগ পান। আঞ্চলিক পটভূমিকার দুর্লভ চিত্রের যথাযথ রূপ দিয়ে কিংবা ব্যক্তি চরিত্রের বাস্তব ও সজীব চিত্রাঙ্কন করে এই গোষ্ঠীর কিছু লেখক হিন্দী গল্প-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সহরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষোভ, ক্ষেদ ও দ্বন্দ্বের প্রাণস্পর্শী চিত্র অঙ্কন করে এই গোষ্ঠীর আর একদল লেখক হিন্দী গল্পকে আরও প্রগতিশীল করে তুলেছেন। এই দশকে সুগঠিত একটা আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দী গল্পের সৃজনী প্রতিভাকে সীমায়িত করার চেষ্টা হলেও তা বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন লেখক গোষ্ঠীর এটাই বিশেষত্ব। ভীষ্ম সাহনীর সহজ ও সরল লেখনভঙ্গী, রামকুমারের মানবতাবোধ, নির্মল বর্মার ভাষার সংবেদনশীলতা, অমরকান্তের ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষ, রঘুবীর সহায়ের মানবজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা, রাজেন্দ্র যাদবের শিল্প-নৈপুণ্য, রেণুর আঞ্চলিকতা, মার্কণ্ডের গ্রাম্য সরলতা আর পরসাই-এর প্রখর সামাজিক-চেতনা এই সময়কার হিন্দী-সাহিত্যকে বর্ণ বৈচিত্র্যে রাঙিয়ে তোলে। গল্পের মাধ্যমে সুকুমার শিল্পকে যে পরিবেশন করা যায়, এই সিদ্ধান্ত এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখকই স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তাঁরা গল্প লেখার গতানুগতিক পথ ছেড়ে জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে গল্পের মধ্যে পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কেতাবী জীবনদর্শন ছেড়ে, আজ তাঁরা জীবন দিয়ে যে সত্যকে উপলব্ধি করেন, বাস্তবে যা কিছু ঘটতে দেখেন, তাকেই গল্পের মধ্যে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এই চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষ কিছু নতুনত্ব না থাকলেও হিন্দী গল্প সাহিত্যের এই যুগ সন্ধিক্ষণে এটা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে, সৃজনী প্রতিভা আরো

বাড়িয়ে তোলে। সাহিত্যের চুল-চেরা বিচারে এই সময়কার পনেরো-বিশটা গল্পকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর গল্প হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

1960-এ হিন্দী গল্প সাহিত্যে আর একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের প্রখর বাস্তব জ্ঞানের কাছে ষষ্ঠ দশকের কাহিনী-কারদের বাস্তবধর্মী গল্পগুলোকে নেহাতই জোলো ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে এঁদের লেখনী দেহগত প্রেমের মধ্যেই সীমিত ছিলো। 1960-এর উদীয়মান লেখকদের মধ্যে একদল এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে লেখাই বন্ধ করে দিলেন; আর একদল নতুন পথের কোনো দিশা না পেয়ে তাঁদের নিজস্ব পুরোনো ঢঙে গল্প লিখতে লাগলেন। 1960-এর লেখকরা বাস্তবধর্মী গল্প লেখার গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নতুন রচনাশৈলীতে কাহিনীকে আরও বাস্তবমুখী করে তুললেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়-ভীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়ে এই নতুন লেখকগোষ্ঠী আরো গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গল্পের মধ্যে মানুষের জীবনের পরিব্যপ্ত অজ্ঞতা, আত্ম-নির্বাসন, অমানুষিকতা ও সন্ত্রাসের সজীব চিত্র রচনা করতে লাগলেন। 'ক্লাড ইথরলী' আর 'বিপাত্র' জাতীয় মুক্তি-সন্ধানী গল্পই এইসব নব্য লেখকদের বড় আপন মনে হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সমকালীন জগতের ভয়াবহ রূপের ভীতিপ্রদ কল্পনাকে (ফ্যান্‌ট্যাসি) উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করেন। 1970-এ এই জাতের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: শ্রীকান্ত বর্মা, মহেন্দ্র ভল্লা, জ্ঞানরঞ্জন, কাশীনাথ সিং, দুধনাথ সিং, রবীন্দ্র কালিয়া, কামতা নাথ, সুধা অরোরা, রমেশ বক্‌সী, প্রবোধ কুমার ও বিজয় চৌহান। এইসব লেখকদের অধিকাংশেরই এক-আধটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা তরুণ তাঁরা একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক গল্প রচনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে

বলা যেতে পারে যে এইসব লেখক হিন্দী গল্প-সাহিত্যে এক নতুন সৃজনী প্রতিভার প্রবর্তন করেছেন।

গত সত্তর বছর ধরে হিন্দী গল্প সাহিত্যের বিকাশ ক্রমান্বয়ে পরিণতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্য যে কোনো ভাষায় গল্পের বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এতো অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে কিনা সন্দেহ; অন্য ভাষায় এতোটা উন্নতি হতে প্রায় এর দেড় কি দ্বিগুণ সময় লেগেছে। সম্ভবতঃ হিন্দী সাহিত্য-রথীদের হিন্দী কবিতা ও উপন্যাস লেখার দিকে বেশী ঝোঁক থাকায় হিন্দী সাহিত্যে গল্প লেখার রেওয়াজ নিঃসন্দেহে একটু দেরীতেই সুরু হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই অল্প পরিসরে হিন্দী গল্প সাহিত্য তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। শুধু ভারতীয় গল্প সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের গল্প-সাহিত্যেও হিন্দী গল্প নিজের বিশিষ্ট আসন দাবী করতে পারে। আশা করি এই গল্প-সংকলন পাঠকসমাজের কাছে হিন্দী গল্পের এই বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে এই সংকলন সম্বন্ধে দু'একটি কথা। এই সংকলনকে হিন্দী গল্পের প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন বলা যায় না। এতে কয়েক-জন স্বনামধন্য লেখকের কাহিনীও সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হয়নি। রচনাশৈলীর বহুমুখী পরীক্ষানিরীক্ষাও এই সংকলনে সংগ্রন্থন করা যায়নি। গল্পের বিভিন্নমুখী ধারাকে এই সংকলনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। সংকলনের নির্দিষ্ট কলেবর ও সেই অনুসারে সম্পাদকের গল্প চয়নই এর জন্যে দায়ী। সামাজিক বাস্তববাদের দিকেই লক্ষ্য রেখে গল্পগুলি চয়ন করা হয়েছে। সংকলনের গল্পগুলি পড়লেই এর যথার্থতা বোঝা যাবে। হিন্দী গল্প সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরায় সচেষ্ট হয়েছি। যে কোনো সংকলনের মতই এই সংকলনে সম্পাদকের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটাও থেকে গেছে, এটা স্বীকারে কোনো সঙ্কোচ নেই। লেখকের অনুমতি না পাওয়ায় অজ্ঞেয়ের 'গৈংগ্রীন' এই

সংগ্রহে সমাবেশ করা গেলো না বলে সত্যিই দুঃখিত। এই সংকলনের কৃতিত্ব এইসব লেখকদেরই যাঁরা তাঁদের গল্প ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হোত না।

নামবর সিং

সূচীপত্র

ও যে বলেছিলো

বড় বড় শহরে একাগাড়ীর গাড়োয়ানের বোলচালের ঘা খেয়ে পিঠ শক্ত আর কান যাঁদের ঝালাপালা হয়েছে তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ একবার অমৃতসরের বস্থুকার্টে গিয়ে সেখানকার গাড়োয়ানদের বোলচাল শুনে তাঁরা যেন পিঠের জ্বালা জুড়িয়ে আসেন। বড় বড় শহরে চওড়া রাস্তা দিয়ে ঘোড়াকে চাবকাতে চাবকাতে গাড়োয়ানরা ঘোড়ার দিদিমার সঙ্গে তাদের নিকটতম সম্বন্ধ স্থির করতে যখন ব্যস্ত, আর পথচারীদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়ে অন্ধ-কানা বলে দরদ দেখায়, সোজা গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে চলতে তখন ভাবে যে দুনিয়ার যত সমস্যা যেন তাদের। সংসারের যত গ্লানি, নিরাশা আর দুশ্চিন্তা যেন তাদেরই অতিক্রম করে চলতে হয়। এদের জ্ঞাত ভাই অমৃতসরের গাড়োয়ানরা সরু আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে যাবার সময় পথচারীর আর ঠেলাগাড়ীর পথ করে দিয়ে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। নানান কথায় এরা পথচারীদের হুঁসিয়ার করে দেয়। 'খালসাজী একটু সামলিয়ে,' 'দাদা একটু সরে,' 'একটু থেমে দাদা,' 'লালাজী পথ ছেড়ে,' 'খোকা একটু দেখে,'—এইসব নানান রকম সম্ভাষণ করতে করতে সাদা পাগড়ী পরা জনসমুদ্র পার হয়ে, খচ্চর, পাতিহাঁসকে পাশ কাটিয়ে, আখওয়ালা, ফেরিওয়ালা ও বাসনওয়ালাদের ভিড় ঠেলে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে যায়। এদের এই অতি বিনয়ে ভরা 'জী' আর 'সাহেব' সম্ভাষণ পথচারীদের পথ ছাড়বার আগে শুনতেই হবে। গালাগালি যে এরা দিতে জানেনা তা নয়, মিষ্টি বুলিতে মিছরির ছুরির কাজ হয় দেখে এরা পথচারীদের জন্যে এইরকম ভাষা কাজে লাগায়। বারবার হুঁশিয়ার করে দেবার পরও বুড়ীরা যখন নির্বিকার

হয়ে চলে তখন তাদের উদ্দেশ্যে এরা বলে ওঠে, 'হ্যাট্ যা, জিণে জোগীয়ে,' 'হ্যাট্ যা করমাওয়ালিয়ে,' 'হ্যাট যা পুত্তাঁপ্যারিয়ে,' 'বচ্ যাঁ লম্বীউমরওয়ালিয়ে।' অর্থাৎ এদের বক্তব্য, 'বুড়ী সরে দাঁড়া', 'তোকে এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে,' 'তুই অনেক কপাল করে এসেছিস,' 'তোর ছেলেদের তুই চোখের মণি,' 'একটু সামলে, এখনও তোর অনেক আয়ু,' 'তুই কেন আমার গাড়ীর তলায় এসে মরতে চাস,' সরে যা।

বম্বুকার্টের এইরকম রাস্তা পার হয়ে চকের এক মনোহারীর দোকানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটির মাথার ঝুঁটি আর মেয়েটির ঢিলে পাজামা দেখে বোঝা যায় এরা ছজনেই শিখ। ছেলেটি তার মামার মাথা ঘসার দই আর মেয়েটি রান্নার জন্যে বড়ি কিনতে এসেছে। দোকানদার তখন এক খদ্দেরের সঙ্গে বচসায় ব্যস্ত, খদ্দেরটি এক সের ভিজে পাঁপড় না গুনে নিতে রাজী নয়।

'তোর বাড়ী কোথায়?' ছেলেটি প্রশ্ন করে।

'শহরের শেষ প্রান্তে, আর তোর?'

'শহরের মধ্যে···এখানে থাকিস কোথায়?'

'অতর সিং-এর বৈঠক খানায়, ইনি আমার মামা।'

'আমিও মামার বাড়ী এসেছি, আমার মামার বাড়ী গুরু বাজারে।'

ততক্ষণে দোকানদার বচসা শেষ করে এদের মালপত্তর দিলো। জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে ছজনে চলতে থাকে। খানিকদূর এগিয়ে ছেলেটি মুচকি হেসে প্রশ্ন করে, 'তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে?' কথাটা শুনেই মেয়েটি চোখ রাঙিয়ে 'ধ্যেত' বলে ছুটে পালায়। ছেলেটি বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ছ'তিন দিন অন্তর শব্জীর কিংবা ছধের দোকানে এদের ছজনের দেখা হয়। মাস খানেক এইভাবে কাটে। বার ছ-তিন ছেলেটি

সেই একই প্রশ্ন করেছিলো, 'তোর বিয়ের ঠিক হয়েছে ?' জবাবে সেই একই কথা, 'ধ্যেত।'

মেয়েটিকে চটাবার জন্যে আর একদিন ছেলেটি যখন ঐ একই প্রশ্ন করেছিলো, উত্তরে অপ্রত্যাশিত জবাব পেয়েছিলো, 'হ্যাঁ, হয়ে গেছে।'

'কবে ?'

'কাল, রেশমী কাজ-করা গায়ের চাদর, দেখতে পাচ্ছ না ?'

এই কথা বলেই মেয়েটি ছুটে পালায়। ছেলেটিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। পথে যেতে যেতে রাগের মাথায় একটি ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে নালায় ফেলে দিয়ে, ফেরিওয়ালার ঝাঁকা উল্টে, একটা কুকুরকে ঢিল ছুড়ে মেরে আর শেষে কেনা দুধটা কপিওয়ালার ঠ্যালায় ঢেলে দেয়। সদ্যস্নাতা এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শুনতে হোলো 'অন্ধ নাকি'। এই রকম খেল দেখিয়ে বাড়ী ফিরলো।

'রাম রাম, এ আবার কোন দেশী লড়াই ? রাত দিন ট্রেঞ্চে বসে বসে হাত পায়ে তো খিল ধরে গেলো। ঠাণ্ডা তো লুধিয়ানার চাইতে দশগুণ বেশী, তার ওপর বৃষ্টি আর ক্রমাগত বরফ, প্রায় হাঁটু অবধি কাদায় বসে গেছে। শত্রুর দেখা নেই কিন্তু দু-এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর শুধু বোমার কান-ফাটা আওয়াজ। ট্রেঞ্চগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে, মাটি শ' শ' গজ দূরে ছিটকে পড়ে। এই গুপ্ত-বোমার হাত থেকে বাঁচলে তবে তো লড়াই। নগরকোটের ভূমিকম্পের কথা শুনেছি কিন্তু ও রকম ভূমিকম্পতো এখানে দিনে ছত্রিশবার হচ্ছে। ট্রেঞ্চের বাইরে মাথার পাগড়ি কিংবা কনুই বেরুলে আর দেখতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে গুলি। বেইমানরা মাটির সঙ্গে মিশে আছে না ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে—বোঝা শক্ত।'

'লহনা সিং, তিনদিন আর বাকী। চারদিনতো ট্রেঞ্চে কাটিয়ে দেওয়া গেলো। পরশু 'রিলিফ' এসেই যাবে, তারপর তো সাত

দিনের ছুটি। তখন নিজে হাতে পাঁঠা কেটে কড়াই ডুবিয়ে ভরপেট খেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া যাবে। ঐ ফিরিঙ্গী মেমসাহেবের বাড়ীর বাগানে ভেলভেটের মত ঘাসে শুতে হবে। মেমসাহেব তো ফল দুধ ঢেলে দেয়, কতবার বলেছি কিন্তু কিছুতেই দাম নিতে রাজী নয়। কেবলই বলে, 'তোমরা আমার রাজার মতো, আমার দেশ রক্ষা করতে এসেছো।'

'চারদিন চোখের পাতা এক করতে পারিনি। না চললে ঘোড়া যেমন বিগড়ে যায়, তেমনি না লড়লে সিপাইরা। আমি যদি এক্ষুনি সঙ্গীন উঁচিয়ে মার্চ করার হুকুম পাই তো দেখতে। একা যদি সাতটা জার্মানকে ঘায়েল করতে না পারি তো আর কোনদিন দরবার সাহেবের গুরুদুয়ারে মাথা ছোঁয়াতে যাবো না। শালারা পাজীর পা-ঝাড়া, সব কলের ঘোড়া, সঙ্গীন দেখলেই বেটাদের আক্কেল গুড়ুম, বাঁচবার জন্যে তো তখন হাতে পায়ে ধরে। এদিকে রাতের অন্ধকারে বেটারা তিরিশ মণি বোমা ছোঁড়ে। সেদিন তেড়ে গিয়েছিলাম···চারমাইলের মধ্যে একটিও জার্মানকে রেহাই দিই নি। পরে জেনারেল সাহেব পিছু হটার আদেশ দিলেন। নইলে পরে···'

'তা না হলে সোজা বার্লিন পৌঁছে যেতে—এই তো?' সুবেদার হজারা সিং হেসে বললো।···'যুদ্ধের সময় নায়েব বা জমাদারের বুদ্ধিতে এগুনো যায় না, বড় অফিসারদের অনেক ভেবেচিন্তে যুদ্ধ চালাতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র তিনশো মাইল জুড়ে। শুধু একদিকে এগোলে তো চলবে না।'

'ঠিক বলেছ সুবেদারজী।' লহনা সিং বলে চলে—'কিন্তু করবো কি বলো? এদিকে তো ঠাণ্ডায় হাড় জমে যাবার যোগাড়। সূর্যের মুখ দেখার জো নেই, এর ওপর চিনাব নদীর ধারার মত দুধার থেকে ট্রেঞ্চের মধ্যে জল ঢুকছে। একবার শত্রুকে ধাওয়া করতে পারলেই শরীর চনমনে হয়ে উঠবে।'

'উদমী, ওঠ, আঙ্গেঠিতে কয়লা দে। বজীরা, তোরা চারজনে

বালতি করে ট্রেঞ্চের জল বাইরে ফেলে দে। লহনা সিং, সন্ধ্যে হোলো। ট্রেঞ্চের ফটকের পাহারাদারকে বদলে দে।' এই হুকুম দিয়ে সুবেদার সমস্ত ট্রেঞ্চগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। বজীরা সিং এই পল্টনের মধ্যে সবচেয়ে রসিক। নোংরা জল বালতি ভরে বাইরে ফেলতে ফেলতে বলে ওঠে, 'আমি হলাম পুরুত, তোমরা সবাই জার্মানীর বাদশার জন্যে তর্পণ করো।' সবাই খিলখিল করে হেসে ওঠে, মনের বিষণ্ণতা সাময়িক কেটে যায়।

লহনা সিং আর এক বালতি জল ভরে বজীরা সিং-এর হাতে দিয়ে বললো, 'নিজের বাগানের খরমুজ গাছে জল দাও। এমন সারের জল তামাম পাঞ্জাব ঘুরলেও পাবে না।'

'হ্যাঁ, দেশ তো নয় যেন স্বর্গ। লড়ায়ের পর আমি সরকারের কাছ থেকে দশগুণ জমি চেয়ে নিয়ে ফলের চাষ করবো।'

'তোমার বৌ হোরাকেও কি এখানে আনিয়ে নেবে, না ঐ ফিরিঙ্গী মেমসাবকে ডেকে নেবে, যে রোজ দুধ খেতে দেয়...'

'চুপ কর, এখানকার লোকেদের লজ্জা সরমের বালাই নেই।'

'ভিন্ন দেশের ভিন্ন রীতি। শিখেরা যে তামাক খায় না, এই কথাটা আমি আজও ওকে বুঝিযে উঠতে পারিনি। সিগারেট খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করে, মুখে গুঁজে দিতে আসে—আমি বারবার পিছু হটে যাই আর তাই ও ভাবে যে আমি রাগ করেছি, ওর দেশের জন্যে আর লড়বো না।'

'আচ্ছা, বোধা সিং কেমন আছে রে?'

'ভালোই।'

'ভাবছিস আমি বুঝি কিছু জানিনা। সারারাত নিজের কম্বল দুটো ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে তুই নিজে আগুনের কাছে বসে রাত কাটাস। ওর বদলে নিজে পাহারা দিয়ে আসিস। ওকে শুকনো তক্তার ওপর শুতে দিয়ে নিজে তো কাদায় পড়ে থাকিস। তোর শরীর না খারাপ হয়ে পড়ে, সেটাই ভয়। শীত তো নয় যেন স্বয়ং যমদূত, নিউমোনিয়াতে মরলে কিছু মিঠাইমোণ্ডা পাবে না।'

'আরে, আমার জন্যে ভেবো না। আম্মাদের উঠোনে আমার নিজে হাতে পোঁতা আম গাছের ছায়ায়, ভাই কীরত সিং-এর কোলে মাথা রেখেই বুলেলের খাদের ধারে আমি মরবো।'

বজীরা সিং রেগেমেগে বলে ওঠে, 'কি খালি খালি মরার কথা শোনাচ্ছো ? মরতে হলে মরুক যত জার্মান আর তুর্কী।'

'হ্যাঁ ভাই, কি ভাবে,

দিল্লী শহর তেঁ পিশৌর নুঁ জান্দি এ
করলেনা লৌঙ্গা দা বপ্পার মড়ি এ।
করলেনা নাড়ে দা সৌদা অড়ি এ—
ওয় লেনা চটাকা কদ্দুএ নুঁ।
কদ্দু বনায়া বে মজেদার গোরি এ
হুণ লানা চটাকা কদ্দু এ নুঁ ॥

(অর্থাৎ দিল্লী থেকে পেশোয়ার যাচ্ছো, লবঙ্গের হিসাব নিকাশ করে নিও। কোমরের ফিতের সওদাও করে নিও। কুমড়ো গাছের ডগা ঝুলছে। কুমড়োর তরকারী খুব সুস্বাদু : এবার কুমড়োর তরকারী খুব সুস্বাদু করে রেঁধো।)

ধর্মভীরু শিখেরা যে এমন ওঁছা গান গাইবে তা' ভাবতেই পারা যায় না ! কিন্তু এই গানেতে সমস্ত এলাকাটা যেন সজীব হয়ে উঠলো। গত চারদিন সিপাইরা যেন মনমরা হয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলো।

চারিদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার। দু' প্রহর রাত কেটে গেছে। বিস্কুটের খালি তিনটে টিনের ওপর নিজের দুটো কম্বল বিছিয়ে আর লহনা সিং-এর দুটো কম্বল আর দুটো ওভার কোট গায়ে দিয়ে বোধা সিং শুয়ে ছিলো।

'কি ব্যাপার, বোধা ভাই, কি হয়েছে ?'

'একটু জল খাইয়ে দাও।'

জলের বাটিটা বোধা সিং-এর মুখে ধরে লহনা সিং জিগ্যেস করলো, 'এখন কেমন বোধ করছো ?' জল খেয়ে বোধা সিং জবাব দিলো, 'ভীষণ কাঁপুনি ধরেছে। হাড় কনকনিয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা আমার জারসীটা পরে নাও।'

'আর তুমি ?'

'আমি আগুন পোয়াচ্ছি, আমার বড় গরম লাগে, এখনও ঘাম ছুটছে।'

'না আমি পরবো না,···চারদিন ধরে তুমি আমার জন্যে··· ।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমার কাছে আর একটা গরম জারসী আছে, আজ সকালেই পেয়েছি, বিলেত থেকে মেমসাহেবেরা বুনে বুনে পাঠাচ্ছে, ভগবান ওদের মঙ্গল করুন'—এই বলেই লহনা নিজের কোট খুলে জারসীটা খুলতে থাকে।

'সত্যি বলছো ?'

'তবে কি মিথ্যে বলছি ?' এই বলেই বোধা সিং-এর আপত্তি সত্ত্বেও লহনা সিং তাকে জারসীটা জবরদস্তি পরিয়ে দিয়ে নিজে খাকী কোট আর জিনের সার্ট পরে পাহারা দিতে লেগে গেলো। মেমসাহেবের পাঠানো বিলিতি জারসীর কথা আদৌ সত্যি নয়।

আধ ঘণ্টা কেটে যায়। ট্রেঞ্চের ভেতর কারুর হাঁক শোনা যায়, 'সুবেদার হজারা সিং।' 'কে ? লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব, হুকুম হুজুর,' বলেই সুবেদার মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকে সামনে হাজির হোলো।

'দেখ, এক্ষুনি আক্রমণ করতে হবে। মাইলটাক দূরে পূবদিকে জার্মানদের একটা ট্রেঞ্চ আছে। ওতে জনাপঞ্চাশের বেশী লোক হবেনা। এই গাছগুলোর তলা দিয়ে দুটো ক্ষেত কেটে রাস্তা করা আছে। পথে তিন চারটে বাঁক পাবে। প্রথম বাঁকের মুখেই পনেরোজন সিপাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। এখানে গোটাদশেক সিপাই রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে তুমি এক্ষুনি ঐ বাঁকের

মুখে-হাজির হও। জার্মানদের ঐ ট্রেঞ্চটা দখল করে তুমি আমার আদেশের অপেক্ষায় ঐখানেই থাকবে। আমি এখানে আছি।'

'যে আজ্ঞে।'

সবাই চুপচাপ তৈরী হয়ে নিলো। বোধা সিংও কম্বল ফেলে উঠে পড়লো। কিন্তু লহনা সিং ওকে বাধা দেয়। লহনা সিং পা বাড়াতেই সুবেদার নিজের ছেলে বোধা সিংকে ইঙ্গিত করে। ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পেরে লহনা সিং চুপ করে যায়। দশজন কারা কারা থাকবে তাই নিয়ে বেশ গণ্ডগোল বেধে গেছে। কেউই থাকতে রাজী নয় অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে দশজনের থাকার বিলিব্যবস্থা করে সুবেদার এগোবার আদেশ দেয়। লহনা সিং যেখানে আগুন পোয়াচ্ছিলো সেখানে লেফ্‌টেন্যান্ট সাহেব পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। মিনিট দশেক পরে লহনার দিকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, তুমিও খাও।'

চোখের পলকেই লহনা সিং সব বুঝতে পারে। মুখের ভাব গোপন করে সে বললো, 'দাও সাহেব।'

সিগারেট নিতে গিয়ে আগুনের ক্ষীণ আলোয় সাহেবের মুখ ও চুল ভালো করে দেখে নিলো। দেখেই টনক নড়ে ওঠে। ভাবতে লাগলো, তার লেফ্‌টেন্যান্ট সাহেবের পাতা-কাটা চুল রাতারাতি কি করে কয়েদীদের মত কদম-ছাঁট হয়ে গেল।

ভাবলো, হয়তো সায়েব নেশার ঘোরে চুল কাটিয়েছে। সঠিক কি ব্যাপার জানবার জন্যে লহনা সিং ব্যস্ত হয়ে উঠলো। লেফ্‌টেন্যান্ট গত পাঁচ বছর ধরে তারই রেজিমেন্টে আছেন। তাই সে জিগ্যেস করলো : 'আমরা কবে হিন্দুস্থানে ফিরবো?'

'যুদ্ধ শেষ হলেই। কেন, এই দেশ তোমার ভালো লাগছে না?'

'না হুজুর, এখানে, শিকারের সেই আনন্দ কোথায়? আপনার মনে আছে স্যার, গত বছর যুদ্ধের মহড়া দেবার পর আমরা জগাধ্রী জেলায় শিকারে গিয়েছিলাম......হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐখানে যেখানে আপনি

গাধার পিঠে চড়ে ছিলেন, আর আপনার খানসামা আব্দুল্লা মাঝপথে একটা মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে থেকে গেছিলো। বেহদ্দ পাজী ছিলো বেটা।···সামনে দিয়ে নীলগাইটা চলে গেলো, এতো বড় নীলগাই এর আগে কখনও দেখিনি। আপনার সেই গুলিটা, যেটা কাঁধ দিয়ে ঢুকে উরু দিয়ে বেরিয়ে গেলো। এই রকম অফিসারের সঙ্গে শিকারে গিয়েই তো মজা। আপনার মনে পড়ে হুজুর, সিমলা থেকে ঐ নীলগাই-এর মাথাটা বাঁধিয়ে এসেছিলো। আপনি ওটা আমাদের রেজিমেন্টের মেসে রাখতে চেয়েছিলেন, আমি কিন্তু সেটা বিলেত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কি বড় বড় শিং, অন্ততঃ দু'ফুট হবে।'

'হ্যাঁ, দু'ফিট চার ইঞ্চি করে ছিলো। তুমি সিগারেট খেলে না?'

'এইবার খাবো, দেশলাই-টা নিয়ে আসি···' বলেই লহনা সিং ট্রেঞ্চের ভেতর ঢুকলো। এখন তার সন্দেহ বদ্ধমূল হোলো, কি করা উচিত তাও সে নিমেষের মধ্যে স্থির করে ফেলে।

অন্ধকারে ঘুমন্ত কারুর গায়ে পা লেগে হোঁচট খেলো।

'কে বজীরা সিং?'

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার লহনা? ডাবাত পড়েছে নাকি? আরে একটু ঘুমোতেও কি দেবে না?'

'একটু চোখ-কাণ খোলো, সর্বনাশ হয়েছে, লেফ্‌টেন্যান্ট সাহেবের পোষাক পরে শত্রু এসেছে।'

'বলো কি?'

'লেফ্‌টেন্যাট সাহেব হয় মারা গেছে নয়তো ধরা পড়েছে। ওঁর পোষাক পরে একটা জার্মান এসেছে। সুবেদার ওর মুখ দেখেনি। আমি কথাও বলেছি, মুখও দেখেছি। শালা পরিষ্কার উর্দু বলে, কিন্তু কেতাবি ভাষা। আমাকে আবার সিগারেট খেতে দিয়েছে।'

'এখন কি উপায়?'

'এবার সাক্ষাত মৃত্যু। আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। সুবেদার কাদায় ঘুরপাক খাবে, এদিকে এরা আমাদের আক্রমণ করবে।

ওদিকে ওদের ওপর হামলা হবে। উঠে পড়ো, এক কাজ করো। পলটনের পায়ের ছাপ দেখে দেখে ছুটে চলে যাও, সুবেদার এখনও বেশী দূর যায়নি। ওকে এক্ষুনি ফিরতে বলো। জার্মান ট্রেঞ্চের কথা একেবারে ভুয়ো। শীগগির যাও, টেঞ্চের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাও, কিন্তু টু শব্দটি যেন না হয়। দেরী কোরো না।'

'আমাদের ওপর হুকুম ছিলো তো এখানেই···।'

'হুকুমের নিকুচি করেছে। আমার হুকুম, জমাদার লহনা সিং-এর, উপস্থিত এখানকার সবচেয়ে বড় অফিসার যে, এটা তার হুকুম। লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেবকে আমি সামলাবো।'

'কিন্তু এখানে তো তোমরা মাত্তর আটজন।'

'আরে আটজন নয়, দশ লাখ। এক একটা অকালী শিখ সোয়া লাখের সমান। যাও তো দেখি।'

ফিরে এসে লহনা সিং ট্রেঞ্চের মুখে দেওয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়ালো। আর দেখতে পেলো লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেবকে কুলের আকারের তিনটে গোলা বার করতে। গোলা তিনটে ট্রেঞ্চের দেওয়ালে ঠুসে দিয়ে সব কটাকে একটা তার দিয়ে বেঁধে দিলো। তারের এক মুখে এক গোছা সুতো, সেই দিকটা আঙ্গেঠির কাছে রাখতে দেখলো। যেই সেই সুতোর মুখে লেফ্‌টেন্যাণ্ট দেশলাই লাগাতে যাবে···

বিদ্যুতগতিতে লহনা সিং উল্টে রাখা বন্দুকটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাহেবের কনুই লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবের হাত থেকে দেশলাইটা পড়ে গেলো। সাহেবের ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে একঘা কসালো লহনা সিং। সাহেব 'আঃ! মাই গড্,' বলে চিত হয়ে পড়লো। দেওয়ালে ঠেসে দেওয়া গোলাগুলো ট্রেঞ্চের বাইরে ফেলে দিয়ে লহনা সিং সাহেবকে ঘসটে ঘসটে আগুনের কাছে নিয়ে এলো। পকেট হাঁতড়াতে লাগলো। তিন চারটে খাম আর একটা ডায়েরী বার করে নিজের পকেটে পুরলো।

খানিক পরেই সাহেবের জ্ঞান ফেরে। লহনা সিং হেসে বললো,

'কি খবর লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব, মনমেজাজ কেমন? আজ অনেক নতুন কথা শিখেছি। শিখেছি শিখরা সিগারেট খায়, জগাধ্রী জেলায় নীল গাই পাওয়া যায় আর ওদের শিং হয় দু ফুট চার ইঞ্চি। আরও শিখেছি মুসলমান বাবুর্চি মূর্তি পূজো করে, লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব গাধার পিঠে চড়েন। কিন্তু সাহেব, খুলে বলো দেখি, এমন চোস্ত উর্দু কোত্থেকে শিখলে? আমার লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেব তো 'ড্যাম' কথা ছাড়া কথাই বলতে পারেন না।'

লহনা সিং লেফ্‌টেন্যাণ্টের প্যাণ্টের পকেট তল্লাসী করে নি। সাহেব ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার ভাণ করে প্যাণ্টের দু' পকেটে দু' হাত পুরলো। লহনা সিং বলে চললো, 'চালাক তো তুমি খুবই, লেফ্‌-টেন্যাণ্ট সাহেবের সঙ্গে যে এতোদিন কাটিয়েছে শহুরে সেই লহনা সিংকে ধাপ্পা দিতে হোলে তোমার চারটে চোখের দরকার। তিন মাস আগে এক তুর্কী মৌলবী আমার গাঁয়ে এসেছিলো, বৌ-দের বাচ্চা হবার জন্যে মাদুলী আর বাচ্চাদের ওষুধ দিতো। চৌধুরীদের বটগাছের নীচে খাটিয়া বিছিয়ে বসে তামাক খেতো আর বলতো যে জার্মানদের মত পণ্ডিত আর হয় না। বেদ পড়ে পড়ে ওরা উড়ো-জাহাজ চালাতে শিখেছে, গরু ওরা মারে না। হিন্দুস্থানে এলেই গো-হত্যা বন্ধ করে দেবে। এই ইংরেজ সরকার আর বেশীদিন নেই, এই বলে বাজারের বেনেদের ভড়কাতো। পোস্ট-অফিস থেকে টাকা সব তুলে নাও। পোস্ট মাস্টার পোল্‌হু রামও ঘাবড়ে গেছিলো। আমি মোল্লাজীর দাড়িগোঁফ উপড়ে গাঁ থেকে বার করে দিয়ে শাসিয়েছিলাম যে ফের যদি এমুখো হয়েছো তো…'

সাহেব পকেটের ভেতর থেকেই পিস্তল ছুঁড়লো, গুলি এসে লাগল লহনা সিংহ-এর উরুতে। সঙ্গে সঙ্গে লহনা সিংও হেন্‌রী মার্টিনীর দুটো গুলিতে সাহেবের ভবলীলা সাঙ্গ করলো। এতো শব্দ শুনে সবাই ছুটে এলো।

বোধা সিং চিৎকার করে উঠলো, 'কি হয়েছে?'

'একটা শব্দ হোলো, কুকুর এসেছিলো। তাকে গুলি করে মেরে

ফেলেছি,' এই কথা বোধা সিংকে বুঝিয়ে তাকে শুতে পাঠিয়ে লহনা সিং বাকী সবাইকে আসল ঘটনা খুলে বললো। সবাই বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে গেলো। লহনা সিং পাগড়ী ছিঁড়ে নিজের ক্ষতের দু' পাশ এঁটে বাঁধলো। উরুর মাংসটাই শুধু জখম হয়েছে। কষে বাঁধায় রক্তটা বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে সত্তরজন জার্মান চিৎকার করতে করতে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়লো। প্রথম আক্রমণটা শিখরা অনবরত গুলি চালিয়ে সামাল' দিলো। দ্বিতীয় আক্রমণও সামলে নিলো, কিন্তু এরা তো মাত্তর আটজন। লহনা সিং লোক দেখে দেখে গুলি চালাতে লাগলো। লহনা সিং বাদে সবাই শুয়ে গুলি ছুঁড়ছিলো। শত্রুদের সংখ্যা ছিলো সত্তর। নিজেদের দলের লোকদের মৃতদেহ মাড়িয়েই জার্মানরা এগিয়ে আসছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা··· ।

হঠাৎ আচম্‌কা শোনা গেলো, 'বাহ গুরুজী দী ফতেহ্! বাহ গুরুজী দী খালসা!' (অর্থাৎ গুরুজীর জয়হোক, গুরুজীর সেবকদের জয় হোক।) সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের পেছন দিক থেকেও গুলি-বর্ষণ হতে থাকে। জার্মানদের দু'দিক থেকে জাঁতাকলের মতো পিষতে লাগলো। পেছন দিক থেকে সুবেদার হজারা সিং-এর দলবল গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলো আর সামনে থেকে লহনা সিং-এর। নাগালের মধ্যে এসে পড়ায় পেছনের দল শত্রুদের সঙ্গীন দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে লাগলো।

একটা হৈ চৈ শোনা গেলো, 'অকাল শিফ্‌খাঁদি ফৌজ আঈ; বাহ গুরুজী দী ফতেহ! বাহ গুরুজী দী খালসা! সত্‌শ্রী অকাল পুরুষ !!!' অর্থাৎ 'অকালী শিখদের ফৌজ এলো। গুরুজীর জয় হোক, গুরুজীর সেবকদের জয় হোক······।' যুদ্ধ থামলো। তেষট্টিজন জার্মানদের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে তখনও মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো। শিখদের মধ্যে পনেরোজন প্রাণ হারালো। সুবেদারের কাঁধ গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। লহনা সিং-এর পাঁজরেও গুলি লেগেছিলো। ট্রেঞ্চের ভিজে মাটি দিয়ে

ক্ষতটা চাপা দিয়ে পাগড়ীর বাকী টুকরোটা কোমরে কষে বাঁধলো। তার কোমরের এই দ্বিতীয় ক্ষতটা কতো গভীর কাউকে জানতেও দিলো না।

লড়ায়ের সময় আকাশে চাঁদ উঠেছিলো। চাঁদের আলো দেখে সংস্কৃত কবিদের দেওয়া চাঁদের 'ক্ষয়ী' নামের স্বার্থকতা বোঝা যায়। হাওয়ার গতি দেখে পণ্ডিত বাণভট্টের উক্তি মনে পড়ে যায় 'দন্তবীণোপদেশাচার্য্য।' বজীরা সিং বলে যাচ্ছিলো, সুবেদারকে ধরবার জন্যে ছুটে যাবার সময় কেমন করে মণখানিক ফ্রান্সের এঁটেল মাটি তার জুতোয় আটকে ছিলো। লহনা সিং-এর কাছ থেকে সব জানতে পেরে ও সমস্ত কাগজ পত্তর পেয়ে সুবেদার লহনা সিং-এর উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলো না। বললো, 'ভাগ্যি তুই ছিলি, না হলে আজ সবাই মরতো।'

এই লড়াইয়ের সোরগোল ডান দিকের তিন মাইল দূরের ট্রেঞ্চেও শোনা গেছিলো। ওখানকার সিপাইরা সৈন্যশিবিরে টেলিফোন করে দেয়। সেখান থেকে ডাক্তার ও দুটো এ্যাম্বুলেন্স সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়ে এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছোয়। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল ছিলো কাছাকাছি। আহতদের ক্ষতগুলো সাময়িকভাবে বেঁধে দিয়ে তাদের একটা গাড়ীতে আর অন্য গাড়ীতে মৃতদেহ তুলে নেওয়া হোলো। কাছাকাছি হাসপাতাল, সকালের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। সুবেদার লহনা সিং-র উরুর ক্ষততে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে চাইলো। কিন্তু লহনা সিং এড়িয়ে যায়, বললো, 'এমন কিছু লাগেনি, সকালে দেখা যাবেখন।' বোধা সিং জ্বরের ঘোরে ভুল ব'কে চলেছিলো। ওকে গাড়ীতে শুইয়ে দেওয়া হোলো। লহনা সিং-কে ছেড়ে সুবেদার শিবিরের হাসপাতালে যেতে নারাজ। লহনা সিং সুবেদারজীর মনোভাব বুঝতে পেরে বললো, 'তোমাকে বোধার দিব্যি, সুবেদারনীর মাথার দিব্যি, তুমিও এই গাড়ীতে যাও।'

'আর তুমি?'

'ওখানে পৌঁছিয়েই আমার জন্যে এ্যম্বুলেন্স ফেরত পাঠিয়ে দিও। জার্মানদের মৃতদেহ নেবার জন্যেও তো আবার গাড়ী আসবে। আমার অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়, এখনও খাড়া আছি দেখছো না। আর বজীরা সিং তো আমার কাছেই রইলো।'

'আচ্ছা, কিন্তু……'

'বোধাকে গাড়ীতে শোয়ানো হয়েছে তো? এবার আপনিও গাড়ীতে উঠে পড়ুন। একটা কথা, সুবেদারনী হোরাকে যখন চিঠি দেবেন, আমার প্রণাম জানাতে ভুলবেন না। আর যখন দেশে ফিরবেন, তখন শুধু এই কথাটাই তাঁকে বলবেন যে তিনি যা' বলেছিলেন, আমি তা' পালন করেছি।'

গাড়ী চলতে সুরু করলো। গাড়ীতে উঠতে উঠতে সুবেদারজী লহনা সিং-র হাত দু'টো চেপে ধরে বললেন, 'তুমি আমার আর বোধার প্রাণ বাঁচিয়েছো। চিঠি কেন লিখবো, আমরা তো একসঙ্গেই দেশে ফিরবো। তুমি নিজেই তখন সুবেদারনীকে বোলো। কিন্তু ও কি বলেছিলো?'

'এবার গাড়ীতে চেপে পড়ুন। যা বললাম তা চিঠিতে লিখে দেবেন আর দেখা হোলে বলে দেবেন।'

গাড়ী ছুটো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লহনা শুয়ে পড়লো। 'বজীরা, আমাকে একটু জল দে, কোমরের পট্টিটাও খুলে দে, মনে হচ্ছে রক্তে ভিজে গেছে।'

মৃত্যুর কিছু আগে স্মৃতি খুব সজাগ হয়। পুরোনো দিনের সমস্ত কথাই মনে পড়ে। প্রতিটি ঘটনাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সময়ের কোনো ব্যবধানই মানেনা।

বারো বছরের ছেলে লহনা সিং। অমৃতসরে মামারবাড়ী বেড়াতে গেছে। দই-এর দোকানে, শব্জীর দোকানে, যেখানে সেখানে ওঁর আট বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। যখনই তাকে জিগ্যেস করতো, বিয়ের ঠিক হয়েছে কিনা, মেয়েটি শুধু সলজ্জে 'ধ্যেত' বলে পালিয়ে যেতো। আর একদিন এই একই প্রশ্ন করে জবাব

পেয়েছিলো : 'হ্যাঁ, কাল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছো না রেশমী কাজ করা শাল ?' শুনেই লহনা সিং একটু মুষড়ে পড়েছিলো। পরে একটু রেগেও গেলো। কিন্তু কেন ?

'বজীরা সিং আব একটু জল।'

পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। এখন লহনা সিং ৭৭ নং রাইফেলের জমাদার। এই আট বছরের মেয়েটির কথা আর একদিনও তার মনে পড়েনি। মনেও ছিলো না যে কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছে, জমিজমার মামলাব তদবীর করতে। ওখানে থাকতেই রেজিমেণ্ট অফিসারের তাগাদা পায় শীগ্‌গির ফিরে যাবার, কেননা সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই সুবেদার হজারা সিং-র চিঠি পায়। হজাবা সিং জানিয়েছিলো যে সে আর তার ছেলে বোধা সিংও যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। লহনা সিং-কে অনুরোধ করে, সে যেন যাবাব সময় ওদের সঙ্গে একসঙ্গে যায়। সুবেদারের বাড়ী লহনা সিং-র ফেরার পথেই পড়ে। সুবেদার ওকে খুব ভালোও বাসতো। লহনা সিং সুবেদারের বাড়ী হাজির হয়।

সুবেদাবের ওখান থেকে রওনা হবার সময় সুবেদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে বললেন, 'লহনা, সুবেদারনী তো কে চেনে বললে। ডাকছে, যা দেখা করে আয়।' লহনা সিং ভেতরে গেলো। মনে মনে ভাবছে, 'সুবেদারনী আমায় চিনলো কি করে, কবে থেকেই বা। রেজিমেণ্টে সুবেদারের কোয়ার্টারে পরিবাবের কেউতো কখনও ছিলো না।' দরজার কাছে গিয়ে প্রণাম জানালো, আশীর্বাদ করাও শুনতে পেলো। লহনা চুপ করে দাঁড়িয়ে

'আমাকে চিনতে পাচ্ছো ?'

'না।'

'তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে ? ধ্যেত,...কালকে হয়ে গেছে... দেখতে পাচ্ছো না রেশমী কাজ করা শাল...অমৃতসরে...।'

অনেকদিনের পুরানো কথা মনে ভীড় করে এলো। স্মৃতির ঘোর

কাটলো, লহনা পাশ ফিরলো। পাঁজরের ক্ষত বেয়ে সমানে রক্ত ঝরছে। 'বজীরা, আরও একটু জল...ও যে বলেছিলো।' পুরোনো দিনের কথা আবার মনে পড়ে। সুবেদারনী বলে চলেছে, 'আসা মাত্রই আমি তোমায় চিনেছি। তোমায় একটা কাজ করতে হবে, আমার তো কপাল পুড়েছে। সরকার আমার স্বামীকে বাহাদুর খেতাব ও লায়ালপুরে কিছু জমিও দিয়েছে। আজ আমি নেমক-হারামী করছি। কেন সরকার মেয়েদের জন্যে ঘাঘরা পরা পল্টন তৈরী করলো না? আমিও তো সুবেদারের সঙ্গে যেতে পারতাম। একটা তো ছেলে, ফৌজে ভর্তি হয়েছে মাত্তর এক বছর। ওর পর চার চারটে সন্তান হোলো, কিন্তু কেউই তো বাঁচলো না।' সুবেদারনী চোখের জল ফেলে। 'এখন তো বাপ বেটায় দু'জনেই চললো। হায়, কি কপালই আমি করেছিলাম? একদিন দৈ-এর দোকানের সামনে টাঙ্গাওয়ালার ঘোড়া বিগড়ে গিয়েছিলো। সেদিন তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে। তুমি ঘোড়ার পায়ের তলায় চলে গিয়ে আমাকে দোকানের চৌকিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে। আজ আমার অনুরোধ তুমি এদের দু'জনকেও বাঁচিও, সেদিন আমায় যেমন ভাবে বাঁচিয়েছিলে।' কাঁদতে কাঁদতে সুবেদারনী ভেতরে চলে গেলো। লহনাও আম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো।

ভি'বজীরা সিং, জল....ও যে বলেছিলো।' লহনার মাথা কোলে নিয়ে বজীরা সিং বসেছিলো। জল চাইলে বজীরা জল খাইয়ে দেয়। আধঘন্টা লহনা চুপচাপ। আবার বলে চলে:

'কে? কিরত সিং?'

বজীরা কি যেন ভেবে বললো, 'হ্যাঁ'। 'ভাইটি, আমাকে একটু তুলে ধর না। আমার মাথাটা তোর কাঁধে রেখে দে।'

বজীরা তাই করলো।

'হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। একটু জল দে রে। এইবার ঐ আম গাছটায় গ্রীষ্মকালে খুব আম ফলবে। খুড়ো-ভাইপোতে

এখানেই বসে আম খাস। তোর ভাইপো আর ঐ আম গাছটা একই বয়সী। 'যে মাসে ও জন্মায় সেই মাসেই ঐ আমগাছটা আমি পুঁতে ছিলাম।'

বজীরা সিং-এর গাল বেয়ে জল গড়াতে থাকে।

কয়েকদিন বাদে লোকে 'খবরের কাগজে পড়ে…

ফ্রান্স আর বেলজিয়াম…৬৮ সূচী…যুদ্ধস্থলে আহত হয়ে মারা গেছে…৭৭ নং শিখ রাইফেলের জমাদার লহনা সিং।

শবাচ্ছাদন

কুঁড়ে ঘরের সামনে নিভে যাওয়া আগুনের কাছে বাপ-বেটায় চুপচাপ বসে। ঘরেতে বেটার সমর্থ বৌ বুধিয়া প্রসব বেদনায় ছট্ফট্ করছে। থেকে থেকে তার কাতরানির শব্দে বাপ-বেটার বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে। শীতের রাত, চারিধার নিস্তব্ধ। সমস্ত গ্রামটি অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘীসু বলে ওঠে—'মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাটা দিন তো ছুটোছুটি করেই কাটলো। যা, একবার দেখে আয়।'

মাধব চটে ওঠে। বলে, 'যদি মরতেই হয় তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন। দেখবার আবার কি আছে?'

'তুই বড় নিষ্ঠুর। বছর খানেক ধরে যার সঙ্গে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করলি, তার প্রতি একটু মায়া-দয়াও নেই।'

'ওই রকম হাত-পা ছোঁড়া আর ছটফটানি আমি অন্ততঃ চোখে দেখতে পারি না।'

জাতে এরা চামার। সারা গাঁয়েই এদের বদনাম। ঘীসু একদিন কাজে যায় তো তিন দিন বসে আরাম করে। মাধব এত ফাঁকিবাজ যে আধঘণ্টা যদি কাজ করে তো এক ঘণ্টা তামাক খেতে কাটিয়ে দেয়। তাই ওদের কাজও জুটতো না। ঘরে যদি ছু'মুঠো অন্নের সংস্থান থাকে তো ওদের কাজ করায় কার বাপের সাধ্যি। ছু'চার বেলা উপোষ গেলে ঘীসু কাঠ কেটে আনতো আর মাধব সেগুলো বাজারে বেচে আসতো। যতদিন এই কাঠবেচা পয়সা শেষ না হোতো, ততদিন এরা এধার-ওধার ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিতো। আবার যখন ছু'চার দিন উপোষ দিতে হোতো, তখন হয় কাঠ কাটতো নয়ত কোনো কাজের খোঁজে বেরোতো। গ্রামে কাজের

কোনো অভাব ছিলো না। গ্রামের সবাই চাষী। খাটিয়ে লোকেদের কাজের অভাব নেই। নিরুপায় হয়েই গ্রামের লোকেরা এদের দু'জনকে ডাকতো আর এও জানতো যে দু'জনকে দিয়ে একজনেরই কাজ পাবে আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেমন এদের প্রকৃতি তেমনি বিচিত্র এঁদের জীবনযাত্রা। এ দেখে মনে হয়, সন্ন্যাসী হলে এদের আলাদা করে আর কৃচ্ছ্রসাধন বা সংযম অভ্যাস করতে হবে না।

সংসারে মাটির দু'চারটে হাঁড়ি-কুড়ি ছাড়া সম্বল বলতে এদের আর কিছুই নেই। ছেঁড়া কাপড়-চোপড় দিয়ে কোন-মতে লজ্জা নিবারণ করে। সংসারের কোনো চিন্তা-ভাবনাও এদের নেই। দেনার দায়ে গালাগালি, মারও খায় কিন্তু তার জন্যে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। ধার শোধ দেবার সঙ্গতি নেই জেনেও লোকেরা কিছু-না-কিছু ধার দেয়। আলু মটরের ফসলের সময় এরা এর ওর ক্ষেত থেকে আলু-মটর নিয়ে এসে পুড়িয়ে খায়। আখের সময় দু'দশ গাছা আখ উপড়ে এনে রাত্তিরে চিবোয়। ঘীসু তো হা-ঘরেমী করেই ষাটটা বছর কাটিয়ে দিলো। মাধবও বাপকা বেটা। বাপের চেয়েও এক কাঠি সরেস।

এরা এখন বসে বসে আলু পোড়াচ্ছিলো। কারুর ক্ষেত থেকে তুলে এনেছে। ঘীসুর স্ত্রী অনেক দিন আগেই মারা গেছে। মাধবের বিয়ে সবে এক বছর হয়েছে। বৌ এসে তবু সংসারের কিছুটা শ্রী ফেরাবার চেষ্টা করেছে। এই দুই অকাল-কুষ্মাণ্ডের উদর পুরতে যাঁতা পিষে বা ঘাস কেটে সের খানেক আটার ব্যবস্থা করে সে। বৌ আসার পর এরা আরও কুঁড়ে আর আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে আবার মেজাজও দেখায়। কেউ কাজ করতে ডাকলে অম্লান বদনে দু'গুণ মজুরী হেঁকে বসে। অমন গুণের বৌ আজ প্রসব বেদনায় প্রায় মরমর। এরা বাপ-বেটায় বসে বোধ হয় অপেক্ষা করছিলো যে বৌটা মরলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।

ঘীসু আগুন থেকে আলু বার করে নিয়ে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে

বললো, 'একবার দেখে আয় না, ওর কি অবস্থা। পেত্নীতে পায়নি তো। এখানে ওঝাও তো এক টাকা চায়।'

মাধবের মনে ভয় ছিলো যে সে ঘরে গেলে ঘীসু বেশীর ভাগ আলুই সাবাড় করে দেবে। সেই ভেবেই বললো, 'ঘরে যেতে আমার ভয় করছে।'

'ভয় কিসের রে, আমি তো এখানে আছি।'

'তা তুমিই গিয়েই দেখো না।'

'আমার বৌ যখন মরেছিলো, তখন তেরাত্তির আমি তার পাশ থেকে নড়িনি। আমি গেলে তো তোর বউ লজ্জা পাবে। যার মুখ দেখলাম না কোনোদিন, আজ কিনা তার এই অবস্থা দেখবো। এখন তো ওর কাপড় চোপড়ের ঠিক নেই। আমায় দেখলে লজ্জায় আরো জড়োসড়ো হয়ে যাবে।'

'আমি ভাবছি এখুনি যদি ছেলেপুলে হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? ঘরে গুড়, তেল, শুকনো আদা কিছুই তো নেই।'

'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তো আজ যারা একটা পয়সা দিতে নারাজ, কালকে তারাই যেচে টাকা দেবে। আমারও ন'টি হয়েছে, কোনবারেই তো ঘরে কিছু ছিলো না। ভগবানের কৃপায় কোনো-না-কোনো উপায় হয়েই গেছিলো।'

দিনরাত মেহনত করে যারা, তাদের অবস্থাও এদের চেয়ে এমন কিছু ভালো নয়। চাষীদের দুর্বলতার সুযোগ যারা নিতে পেরেছে তাদেরই অবস্থা কিছুটা ফিরেছে। তাই এই ধরণের সমাজ-ব্যবস্থায় ঘীসুদের মত মনোবৃত্তি গড়ে ওঠা মোটেই আশ্চর্য নয়। মনে হয় ঘীসু চাষীদের চেয়ে বরঞ্চ বুদ্ধিবাদী। চাষীদের দলে না ভীড়ে সে বড়লোকদের মত দিন কাটায়। তফাতটা এই, বড়লোকের চাল-চলন বজায় রাখতে পারে না। গ্রামের আর পাঁচজন বড়লোক মোড়লের মত সে সম্মান পায় না। তার মস্ত বড় সান্ত্বনা সে গরীব কিন্তু তাকে চাষীদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেতে হয় না। ওর নিরীহ সরলতার সুযোগও কেউ নিতে পারে না।

ঝলসানো আলুগুলো বাপ-বেটায় নোলায়-খোলায় করে খেতে লাগলো। কাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি। ঠাণ্ডা হতে দেবার সবুরও সয় না। জিভে ছ্যাঁকাও লাগে। ছাড়ানো আলু হাতে যত না গরম লাগে, মুখে পুরে কামড় দিলে জিভ পুড়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়। পেটে গিয়েই ঠাণ্ডা হবে। দুজনে তাড়াতাড়ি তাই গিলতে থাকে। গিলতে গিয়ে চোখের জল বেরিয়ে আসে।

ঘীসুর খেতে খেতে কুড়ি বছর আগে জমিদারবাবুর বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়ার কথা মনে পড়ে। সেই বিয়েতে খেয়ে যা তৃপ্তি পেয়েছিলো তা চিরকাল মনে রাখার মত। বললো, 'আজও সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে রকম খাওয়া ভোলা যায় না। পেট ভরে খাওয়া আর কত রকমারি খাওয়া। আর কোনোদিন কপালে জুটলো না। নিমন্ত্রিত সবাইকে কনের বাড়ী পেট ভরে পুরি খাইয়েছিলো। ছোট বড় সবাইকেই। আসল ঘিয়ের পুরি। কত রকমই না করেছিলো—চাটনি, রায়তা, তিনরকমের শুকনো তরকারী, একটা ঝোলা তরকারী, দই-মিষ্টি। আহা, সেই খাওয়ার যে কি তৃপ্তি তা কি করে বোঝাবো। যা খুসী তাই চাও, যত ইচ্ছে তত খাও। কোনারকম ধরাকাট ছিলো না। সবাই এত পেট ভরে খেয়েছিলো যে জল খাবার জায়গা পর্যন্ত ছিলো না। নেবো না বললেও রেহাই পাওয়া যায় নি। হাত দিয়ে বাধা দিলেও পরিবেশন যারা করছিলো তারা গরম গরম ভুর ভুরে গন্ধওয়ালা কচুরি পাতে দিয়ে যাচ্ছিলো। শেষবেশ এমন অবস্থা হোলো, খেয়ে উঠে যে পান-সুপুরি খাবো তারও জায়গা ছিলো না। বলতে কি, দাঁড়িয়ে থাকারও ক্ষমতা ছিলো না। তাড়াতাড়ি ফিরে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এমনি দিল দরিয়া ছিলো জমিদারবাবু।'

মাধবের প্রায় জিভে জল এসে যায়। বললো, 'আজকাল আর আমাদের কেউ এরকম খাওয়ায় না।'

'এখন আর কে এ রকম খাওয়াবে বল? সে দিনকাল কি

আর আছে? আজকাল সবাই সস্তা গণ্ডায় সারে। বিয়ে-থায় খরচ করবে না, শ্রাদ্ধশান্তিও নমো-নমো করে সারে। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে যে গরীবের মেয়ে এই সব পুঁজি ওরা রাখবে কোথায়। জড়ো করার তো কামাই নেই, খরচ করার বেলাই যত কার্পণ্য।'

'তুমি নিশ্চয়ই গণ্ডা পাঁচেক পুরি খেয়ে থাকবে।'

'তার চেয়ে বেশীই খেয়েছিলাম।'

'আমি হলে পঞ্চাশখানা উড়িয়ে দিতাম।'

'তুই ভাবছিস বুঝি যে আমি তার চেয়ে কম খেয়েছিলাম। ভুলে গেছিস, তখন বেশ তাগড়া ছিলাম, তুই তো আমার অর্দ্ধেকও নস।'

আলু খেয়ে দুজনে জল খায়। তারপর আগুনের সামনে পরণের কাপড়টা মুড়ি দিয়ে গুড়িশুড়ি মেরে শুলো। ঠিক যেন দুটো অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

বুধিয়া তখনও সমানে কাতরাচ্ছিলো।

2

সকালে মাধব ঘরে ঢুকে দেখে বুধিয়া চোখ কপালে তুলে মরে পড়ে আছে। মুখে মাছি ভিন্ ভিন্ করছে। সারা গায়ে ধুলো। পেটে বাচ্চা মরে গেছে।

মাধব ছুটে বাপের কাছে এলো। দু'জনেই বুক চাপড়ে কাঁদতে সুরু করে দেয়। কান্নাকাটি শুনে আশে-পাশের সবাই ছুটে আসে। চিরাচরিত প্রথায় এদের সান্ত্বনা দেয়। বেশী কান্নাকাটির সময় নেই, শবাচ্ছাদন আর কাঠের জোগাড় করতে হবে। কিন্তু ঘরে তো কাণাকড়িও নেই।

বাপ-বেটায় কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ের জমিদারের কাছে যায়। জমিদারবাবু এদের মুখ দর্শন করতেন না। চুরি করার অপরাধে কিংবা কাজে ঠিক সময় না আসার অজুহাতে জমিদারবাবুর কাছে

এরা এক-আধবার পিটুনীও খেয়েছে। জমিদারবাবু জিগ্যেস করলেন, 'এই বেটা, কাঁদছিস কেন? আজকাল তো বড় একটা দেখতে পাই না। এই গাঁয়ে বাস করার ইচ্ছে নেই বুঝি?'

ঘীসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চোখ ছলছলিয়ে বললো, 'হুজুর বড় বিপদ। মাধবের বৌ কাল রাতে মারা গেছে। রাত-ভোর ছটফট করেছে। সারারাত মাথার শিয়রে তুজনে বসে কাটিয়েছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, ওষুধপত্তরও দিয়েছি। কিন্তু পোড়ারমুখী শেষ পর্যন্ত দাগা দিয়ে গেলো। হুজুর, রাঁধা-ভাত দেবারও কেউ রইলো না। সর্বস্বান্ত হলাম। সংসারও ভেঙ্গে গেলো। আপনার গোলাম হুজুর, এর শেষ কাজ আপনি ছাড়া আর কে করবে। যা সামান্য পুঁজি-পাটা সব ওষুধ করতেই গেছে। হুজুরের দয়া হলেই শেষকৃত্য হয। আপনি ছাড়া আব কে আছে, কার কাছেই বা যাই।'

জমিদারবাবু দয়ালু। কিন্তু ঘীসুকে দয়া করা মানে অপাত্রে দান তা' বুঝতেন। একবার মনে হোলো বলেন, ভাগ, দূর হয়ে যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে তো আসার নামটি নেই, গরজে পড়ে আজ এত খোসামোদ। বেটা বদমাইস নেমকহারাম কোথাকার। কিন্তু এখন রাগ দেখিয়ে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় নয়। খুব বিরক্ত হয়ে তুটো টাকা ফেলে দিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও মুখ ফুটে বেরুলো না। একবার ফিরেও তাকালেন না। টাকা দিয়ে ঘাড়ের বোঝা নামালেন।

যখন জমিদারবাবু তু'টাকা দিয়েছেন, তখন কোন সাহসে গাঁয়ের বণিক-মহাজনরা টাকা না দিয়ে যায়। জমিদারের নামে ঢাক পিটোতে ঘীসু খুবই ওস্তাদ। কেউ তু'আনা, কেউ বা চার আনা দিলো। ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই ঘীসু পাঁচ টাকা তুলে ফেললো। এক জায়গা থেকে কাঠের ব্যবস্থা হোলো, আর এক জায়গা থেকে চাল-ডালের। তুপুরবেলায় শবাচ্ছাদন কিনতে ঘীসু আর মাধব বাজার মুখো রওনা হোলো। পাড়ার লোকেরা বাঁশ কাটতে গেলো।

গাঁয়ের দরদী স্ত্রীলোকেরা লাস দেখতে আসে। মৃতের দুর্দশা দেখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

3

বাজারে পৌঁছে ঘীসু মাধবকে জিগ্যেস করলো, 'হ্যাঁরে, ওকে পোড়াবার জন্যে তো কাঠের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কি বলিস?'

মাধব বললে, 'হ্যাঁ, কাঠ প্রচুর হয়েছে, এখন শবাচ্ছাদন হলেই হয়।'

'তাহলে চল, সস্তা দেখে একটা কিনে নেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, তাহলেই হবে। পোড়াতে তো রাত হয়ে যাবে, রাতে আর কে কাপড় দেখছে?'

'কি অদ্ভুত রেওয়াজ! বেঁচে থাকতে পরণে যার শতছিন্ন কাপড়ও জোটেনি, মরার পর তাকে আবার নতুন কাপড় দিয়ে ঢাকো!'

'ওটা তো মড়ার সঙ্গে পুড়েই যাবে।'

'নয়তো কি থেকে যাবে? এই টাকা পাঁচটা আগে পাওয়া গেলে একটু ওষুধপত্তর দেওয়া যেতো।'

একে অন্যের মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করে। এ-দোকান সে-দোকান করে বাজারময় ঘুরে বেড়ায়। হরেক রকমের সুতী ও রেশমী কাপড় দেখে, কিন্তু কিছুই আর মনে ধরে না। সন্ধ্যে হয়ে এলো, চলতে চলতে হঠাৎ একটা মদের দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। দুজনেই দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ে, ভাবখানা এই যেন এটা আগে থেকেই তাদের ঠিক করা ছিলো। কি করবে না করবে এই ভেবে দুজনে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঘীসু বললো, 'সাহুজী, আমাদেরও এক বোতল।'

সঙ্গে মদের চাট আর মাছ ভাজা। দুজনে বারান্দায় বসে মনের আনন্দে খেতে লাগলো।

খানিকটা পেটে পড়তেই দু'জনের চোখে রঙ ধরে।

ঘীসু বলে, 'শবাচ্ছাদন কিনে আর কি হবে? পুড়েই তো যাবে, তোর বৌ-এর সঙ্গে তো আর যাবে না।'

মাধব একবার আকাশের দিকে তাকালো, কোনোরকম পাপ করছে না এটা যেন দেবতাদের সাক্ষী রেখে বললো, 'লোকে দান করে, বামুনদের হাজার টাকাও দান করে, কিন্তু কোনোদিন কি কেউ পরলোকে গিয়ে দেখেছে, বদলে কিছু পায় কিনা?'

'বড়লোকের অনেক টাকা আছে। ইচ্ছে করলেই ওড়াতে পারে। কিন্তু আমাদের কি আছে যে ওড়াবো?'

'কিন্তু লোকে যদি শবাচ্ছাদনের কথা জিগ্যেস করে, তবে কি জবাব দেবে?'

ঘীসু একটু হাসলো, 'আরে পকেট মারা গেছে বলে দিলেই হবে! অনেক খুঁজলাম পাওয়া গেলো না। অবশ্য কেউই বিশ্বাস করবে না জানি। তাতে কি যায় আসে। দেখিস ওরাই আবার টাকা দেবে।'

মাধবও হাসলো। আশাতীত সৌভাগ্যের কথা ভেবে বললো, 'বউটা বড় ভালো ছিলো। মরেও আমাদের অনেক খাইয়ে গেলো।'

আধ বোতলের ওপর মদ সাবাড় হোয়ে গেছে। ঘীসু দু'সের পুরি কিনতে পাঠালো। সঙ্গে চাটনি, আচার আর মেটুলি। মদের দোকানের ঠিক সামনেই খাবারের দোকান। মাধব একলাফে গিয়ে দুটো পাতায় করে সব কিছু কিনে নিয়ে আসে। পুরো দেড়টি টাকা আরও খসলো। হাতে রইলো মাত্তর কয়েক আনা।

যেমন করে বাঘে শিকার খায়, দু'জন তেমনি মজা করে খায়। তারা আজ বেপরোয়া, না আছে জবাবদিহির জন্যে কোনো চিন্তা, না আছে বদনামের ভয়। এসব ওরা অনেকদিন আগেই জয় করে ফেলেছে।

ঘীসু দার্শনিকের মত বলে উঠলো, 'আমাদের আত্মার তৃপ্তি হলে কি ওর পুণ্যি হবে না?'

মাধব শ্রদ্ধাভরে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালো, 'আলবাৎ হবে।

ঈশ্বর তুমি তো অন্তর্যামী। ওকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে যেও। আমরা অন্তর থেকে আশীর্বাদ করছি। আজ যা খেলাম, জীবনে কোনোদিন তা জোটেনি।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই মাধবের মনে একটা সংশয় জাগলো, 'আচ্ছা বাবা, আমাদেরও তো একদিন না একদিন ওখানে যেতে হবে?'

ঘীসু এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না। পরলোকের জন্যে, মাথা ঘামিয়ে বর্তমানের আনন্দটা সে মাটি করতে নারাজ।

'শবাচ্ছাদন কেন আমরা দিইনি, ওখানে সে যদি প্রশ্ন করে, তখন কি বলবে?'

'বলবো তোমার মুণ্ডু।'

'জিগ্যেস ও করবেই।'

'তা তুই জানলি কি করে যে ও শবাচ্ছাদন পাবে না? আমায় কি এতোই গাধা ভেবেছিস। ষাটটা বছর ধরে দুনিয়ায় কি খালি ঘাস কাটলাম। শবাচ্ছাদন ও ঠিকই পাবে আর ভালোই পাবে।'

মাধবের কিন্তু বিশ্বাস হয় না। প্রশ্ন করে, 'কে দেবে? টাকা তো সব ফুঁকে দিলে। ও তো আমাকেই জিগ্যেস করবে। বিয়ে তো আমিই করেছিলাম, সিঁথেয় সিঁদূর তো আমি দিয়েছি।'

ঘীসু রেগে গিয়ে জবাব দেয়।

'একশোবার বলছি তো, শবাচ্ছাদন ওর জুটবে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'দেবেটা কে, শুনি?'

'যারা এখন দিয়েছে তারাই দেবে। তফাত শুধু, এবারে টাকাটা আমরা হাতে পাবো না।'

রাত যত বাড়তে থাকে, মদের দোকানও তত জমজমাট হ'য়ে ওঠে। কেউ গান ধরে, কেউ লম্বা চওড়া বুলি আওড়ায়, কেউ বা আবার সঙ্গীর গলা জড়িয়ে ধরে। কেউ কেউ বন্ধুর মুখে মদের ভাঁড় তুলে দেয়।

ওখানে খুসীর হাওয়া, নেশার আমেজ। এক চুমুকেই অনেকের

চোখে রঙ ধরে। মদের চেয়ে বেশী মাদকতা ওখানকার পরিবেশে। জীবনের হতাশাই এদের এখানে টেনে আনে, কিছুক্ষণের জন্যে এরা ভুলে থাকে সব, ভুলে যায় নিজেদের অস্তিত্ব।

বাপ-বেটায় এখনও তারিয়ে তারিয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। সবার চোখ ওদের দিকে। ভাবে এরা কী ভাগ্যবান, একটা পুরো বোতল দুজনে খাচ্ছে।

পেট ঠেসে খেয়ে উদ্বৃত্ত পুরিগুলো মাধব একটা ভিখিরিকে দিয়ে দেয়। ভিখিরিটা অনেকক্ষণ ধরেই লোলুপদৃষ্টিতে এদের খাওয়া দেখছিলো। 'দানে'র গৌরব, আনন্দ ও উল্লাস জীবনে সে এই প্রথম অনুভব করলো।

ঘীসু ভিখিরিটিকে বললো, 'নিয়ে যা, খুব খা আর দিল খুলে আশীর্বাদ কর। যার দৌলতে রোজগার সে তো পরপারে। তবে তোর আশীর্বাদ নিশ্চয়ই তার কাছে পৌঁছবে। মন প্রাণ ভরে আশীর্বাদ কর। এটা তার খুব কষ্টের রোজগার।'

মাধব আবাব আকাশের দিকে চেয়ে বললো, 'বাবা, ও নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠধামে যাবে, ওখানকার রাণী হ'য়ে থাকবে।'

ঘীসু উঠে দাঁড়ালো। আনন্দে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ বাবা, বৈকুণ্ঠেই যাবে। কাউকে কোনোদিন কষ্ট দিলো না, কারুর ওপর জোর ফলালো না। মরেও আমাদের জীবনের লালসা পূর্ণ করে দিয়ে গেলো। ও বৈকুণ্ঠধামে যাবে না তো কি এই পেট মোটার দলরা যাবে, যারা গরীবকে মেরে রোজ গঙ্গাস্নান সেরে মন্দিরে পুজো চড়ায়।'

তার এই শ্রদ্ধার ভাব শীগ্‌গিরই কেটে যায়। মনের অস্থিরতাটাই বোধ হয় নেশার লক্ষণ। আনন্দের ঘোর কেটে গিয়ে হতাশা ও দুঃখের ছায়া তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

'কিন্তু বাবা, জীবনে ও অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে, কত কষ্ট পেয়েই না মরেছে,' মাধব এই বলে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

ঘীসু সান্ত্বনা দেয়, 'কান্নাকাটি করিসনি, মায়াজাল থেকে ও মুক্তি পেয়েছে, আনন্দ কর। সে অতি বড় ভাগ্যবতী। এতো তাড়াতাড়ি সব বন্ধন কাটিয়ে চলে গেলো।'

দাঁড়িয়ে উঠে দুজনে গান ধরলো :

"ঠগিনী কেঁও নয়না ঝমকাবে। ঠগিনী"

অর্থাৎ ঠগিনী ঠসক দেখিয়ে কেন চোখ মারিস, ঠগিনীরে।

মনের আনন্দে গান ধরেছে। বাকী সবাই একদৃষ্টে ওদের দেখতে থাকে। গাইতে গাইতে হঠাৎ তারা নাচতে সুরু করে। তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানা অঙ্গ-ভঙ্গিমা করে চলে। শেষে নেশার ঘোরে তাল হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লো।

গুণ্ডা

পঞ্চাশের ওপর বয়েস, কিন্তু যুবার চেয়ে বলিষ্ঠ ও সবল। এখনও গায়ের চামড়া কোঁচকায়নি। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারায়, পোষের হাড় কাঁপানো শীতে, জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদে—সব সময়েই খালি গায়ে বেড়াতে সে ভালোবাসে, ছুঁচলো গোঁফজোড়া দর্শকদের চোখে বিছের হুলের মতো ফোটে। চিক্কণ শ্যামবর্ণ, ঠিক যেন সাপের গা। পরণে লাল রেশমী পাড়ওয়ালা নাগপুরী ধুতি, দূর থেকেই নজরে পড়ে। কোমরে বেনারসী সিল্কের কোমর-বন্ধ, তাতে বিছের মতো ঝিনুকের একটা গাঁইট। একরাশ কোঁকড়ানো চুল, মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর সোনালী প্রান্তটা বিছিয়ে থাকে পিঠজুড়ে। প্রশস্ত কাঁধে ধারালো কুড়ুল—ওর হাতিয়ার। সদর্পে চলার সময় দেহের শিরা-উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সেই গুণ্ডা।

আঠারশো শতাব্দীর শেষভাগে কাশীর রূপ পাল্টে যায়। এখানে উপনিষদের অজাতশত্রুর সভায় ব্রহ্মবিদ্যা শেখার জন্যে বিদ্বান ব্রহ্মচারীরা আর আসে না। শতাব্দী ধরে মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসলীলা চলেছে। হত্যা করা হচ্ছে সাধুসন্ন্যাসী ও তপস্বীদের। তাই কাশীতে আর গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের ধর্ম-দর্শন নিয়ে বাদানুবাদ হতে দেখা যায় না। অনাহূত নতুন ধর্মের দাপটে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অস্ত্রবলের কাছে ন্যায় ও যুক্তির মৃত্যু হতে দেখে কাশীর হতাশ ও বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে একটা নতুন দল গড়ে উঠতে দেখা যায়—যারা বাহুবলে বিশ্বাসী। যারা কথার মর্যাদা রাখতে প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এরা বাহুবলে জীবিকা নির্বাহ করতো। প্রাণভিক্ষার্থী কাপুরুষকে কিংবা আহত প্রতিদ্বন্দ্বীকে এরা কখনও স্পর্শ করতো না। পীড়িত ও

দুর্বলদের সাহায্য করতো। সব সময় হাতে প্রাণ নিয়েই এদের বিচরণ। কাশীর লোকেরা এদেরই গুণ্ডা বলে জানতো।

জীবনের ঈপ্সিত বস্তু না পেলে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদারের ছেলে নন্হকু সিং কোনো মানসিক আঘাতে গুণ্ডা হয়ে যায়। দু'হাতে নিজের সব ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দেয়। টাকা নিয়ে নয়-ছয় করে নন্হকু সিং ভাঁড়ের নাচ দেখিয়েছিলো, কাশীর লোকে আজও তা' ভুলতে পারেনি। তখনকার দিনে বসন্তকালে এইসব প্রহসন দেখাতে প্রচুর অর্থ, লোকবল, সাহস ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রয়োজন হতো। একবার নন্হকু সিং নিজেও অভিনয় করেছিলো। একপায়ে নূপুর ও একহাতে তোড়া। এক চোখে কাজল ও এক কানে দামী মুক্ত। অন্য কাণে ছেঁড়া জুতো ও অন্য হাতে জড়োয়া কাজ করা তলোয়ারের মুঠ। আপাদমস্তক গয়নায় মোড়া অভিনয়কারী প্রেমিকার কাঁধে হাত রেখে গেয়েছিলো:

'কঁহী বৈগনওয়ালী মিলেতো বুলা দেনা।' অর্থাৎ যদি কোথাও বেগুনওয়ালীর দেখা পাও তো ডেকে দিও।

প্রায়ই বেনারসের সহরতলীর ক্ষেত-খামারে, খাবার জলের পাতকোর পাড়ে, গঙ্গার বুকে নৌকায় তাকে দেখতে পাওয়া যেতো; জুয়াড়ীর আড্ডা ছেড়ে সে চকে এলে কাশীর চটকদার বেশ্যারা তাকে হেসে অভ্যর্থনা জানাতো। তার বলিষ্ঠ দেহের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। সে শুধু পানওয়ালার দোকানে বসে ওদের গান শুনতো, কখনও দোতলায় ওদের ঘরে যেতো না। জুয়ার টাকা এইসব বেশ্যাদের ঘরের দিকে মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলতো। বেশ্যাদের ঘরে বসে-থাকা লোকগুলোর মাথায় কখনও কখনও সে টাকা লাগতো আর নন্হকু সিং হাসিতে ফেটে পড়তো।

তাকে দোতলায় ওদের ঘরে যাবার কথা বললে সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে যেতো।

বংশীর জুয়ার আড্ডা থেকে নন্হকু বেরিয়ে আসে। আজ হেরে সর্বস্বান্ত, বেশ্যাদের নাচগান আজ আর ভালো লাগে না। সে মন্ন

পানওয়ালার দোকানে এসে বসে। বলে—"দিনটা আজ মোটেই স্থবিধের নয়।'

'কেন হুজুর! চিন্তা কিসের? আমরা তো আছি। আপানারই তো সব।'

'তুই দেখছি নেহাত বোকাই রয়ে গেলি। নন্‌হকু সিং টাকা ধার করে যেদিন জুয়া খেলবে সেদিন জানবি এই নন্‌হকু সিং মরে গেছে। আমি কখন জুয়া খেলতে যাই তুইতো জানিস না। পকেটে যখন একটা পয়সাও থাকে না তখন জুয়ার আড্ডায় হাজির হই। গিয়েই যেদিকে টাকা বেশী সেদিকেই ভিড়ে পড়ি। বাজী ধরি আর দাঁও মারি। এটা বাবা কিনারামের আশীর্বাদ।'

'তবে আজ কেন এরকম হোলো, হুজুর?'

'প্রথম বাজী ঠিকই জিতেছিলাম, কিন্তু পরের দু'চার দান খেলতে গিয়ে সব বেরিয়ে গেলো। মোটে এই টাকা পাঁচটা বেঁচেছে। পানের জন্যে একটা টাকা রেখে দে, আর চারটে টাকা মলুকী কথককে দিয়ে দে, আর ওকে বল, দুলারী যেন গান গায়। হ্যাঁ সেই গানটা—'

'…বলম্ বিদেশ রহে', অর্থাৎ প্রিয়তমা বিদেশেই রয়ে গেলো।

মলুকী গাঁজার কলকের কয়লা ঠিক করছিলো। নন্‌হকু সিং-এর কথা শুনে হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে যায়। নজর গাঁজার কলকের দিকে। তাই যেতে যেতে হোঁচট খায়। এতে কিছু এসে যায় না, নন্‌হকু সিং-এর ভ্রূকুটি সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। ভ্রূকুটির চোখে পড়ে গিয়ে চোট খাওয়াও শ্রেয়। আজও তার নন্‌হকু সিং-এর সেই চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। জুয়ায় জিতে এসে নন্‌হকু সিং টাকায় ভর্তি থলেটা নিয়ে এই পানওয়ালার দোকানেই বসেছিলো। বরযাত্রী যেতে দেখে প্রশ্ন করেছিলো 'কাদের বর?'

'ঠাকুর বোধী সিং-এর ছেলের বিয়ে।'…মন্নুর কথা শেষ হবার আগেই, নন্‌হকুর ঠোঁট রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'মন্নু, এ কিছুতেই হবে না। এ পথ দিয়ে আজ বরযাত্রী যাবে না। বোধী সিং আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবেই এ পথ দিয়ে বর নিয়ে যেতে পারবে।'

মন্নু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, 'হুজুর, তা আমি কি করতে পারি?'

ননহকু সিং কাঁধের কুড়ুলটা উঁচিয়ে মলুকীকে একটু কড়কে দিয়ে বললো, 'মলুকিয়া, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, এক্ষুনি যা, ঠাকুর বোধি সিংকে বল, ননহকু সিং এখানে দাড়িয়ে আছে দাঁও মারার জন্যে। একটু বুঝে-সুঝে যেন এগোয়, ছেলের বিয়ে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মলুকিয়া ঠাকুর বোধী সিং-এর কাছে হাজির হোলো। গত পাঁচ বছর যাবৎ বোধী সিং আর ননহকুর মুখ দেখা দেখি নেই। একবার জুয়ার আড্ডায় এদের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। আর পাঁচজনে এসে এদের ঝগড়া মেটায়। সেই থেকে কেউ কারুর মুখ দেখেনি। আজ ননহকু প্রাণের মায়া ত্যাগ করে একা পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। বোধি সিং ননহকুর রোখটা বুঝতে পারে মলুকীকে বলে, 'এই বেটা, গিয়ে বাবুসাহেবকে বল, আমি কি করে বুঝবো যে বাবুসাহেব ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন উনি স্বয়ং হাজির, তখন দু'জন বরকর্তার কি দরকার।'

বোধী সিং ফিরে গেলো। মলুকীর কাঁধে টাকার থলিটা চাপিয়ে দিয়ে বাজনার সামনে গিয়ে ননহকু বর নিয়ে এগুলো। বিয়ের সমস্ত খরচাই ননহকু করলো। পরের দিন বর-কনেকে সঙ্গে নিয়ে এই দোকানের সামনে এসে বর-কনে ও বরযাত্রীকে বোধী সিং-এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে, নিজে আর এগুলো না।

মলুকিয়াও সেদিন দশটা টাকা পেয়েছিলো। ননহকু সিং-এর কথা না শুনলে মৃত্যু যে অবধারিত, মলুকিয়া তা ভালো করেই জানে। তাই ভয়ে ভয়ে দুলারীকে বলে, 'তুমি গান ধরো, আমি তবলায় ঠেকা দিচ্ছি, ততক্ষণে বল্লভ সারেঙ্গীওয়ালা জল খেয়ে এসে পড়বে।'

'ব্যাপার কি, বিপদ-আপদ কিছু ঘটলো নাকি?' তুলারী জানলা খুলে দেয়। মুচকি হেসে নন্‌হকু সিংকে সেলাম জানায়। নন্‌হকুও অভিবাদনে সাড়া দিয়ে এক অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অপরিচিত মানুষটির হাতে পাতলা লিকলিকে ছড়ি, চোখে সুরমা, একগাল পান, মেহেদি লাগানো লাল দাড়ি। লাল দাড়ির গোড়ায় সাদা ছোপ। মাথায় ছুঁচোলো টুপি, গায়ে ছ'কাটের জামা। সঙ্গে কাঁধে-বেল্ট-আঁটা দুজন সিপাই। মৌলবী বলেই মনে হয়। নন্‌হকু একটু হাসে। নন্‌হকুর দিকে না তাকিয়ে মৌলবী সাহেব সিপাইদের একজনকে হুকুম দেন, 'যাও তুলারীকে গিয়ে বলো, আজ রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ীতে গান-বাজনা হবে, যেন এক্ষুনি চলে আসে। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ জান আলীর দোকান থেকে খানিকটা আতর কিনে নিয়ে আসি।' সিপাই ওপরে উঠে যায়। মৌলবীজি অন্যদিকে পা বাড়ালো। নন্‌হকু বিরক্ত হোয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুলারী, আর কতক্ষণ বসে থাকবো? সারেঙ্গীওয়ালা কি এখনও আসেনি?'

তুলারী জবাব দেয়, 'বারে বাবুসাহেব, আপনার জন্যেই এখানে এসে বসলাম, গান শুনুন না। আপনি তো কখনও ওপরে…' কথা শুনে মৌলবী তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। সিপাহীকে হাঁক দেয়, 'এখনও হারামজাদী নামলো না? যা কোতোয়ালকে আমার নাম করে বল, মৌলবী আলাউদ্দিন কুবরা তাকে তলব করেছে। এই ছুঁড়ির একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। নবাবরা চলে যাবার পর থেকে এই কাফেরদের বড্ড বাড় বেড়েছে।'

কুবরা মৌলবী। বাপরে…পানওয়ালা নিজের দোকান সামলাতে লাগলো। পাশের দোকানে এক বেনিয়া ঢুলছিলো। শব্দে চমকে গিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে চোট খেলো।

এই মৌলবীই তো মহারাজ চেতসিং-এর কাছ থেকে সাড়ে তিন সের পিঁপড়ের মাথার তেল চেয়েছিলো।

মৌলবী কুবরাকে নিয়ে বাজারে বেশ সোরগোল পড়ে যায়।

নন্‌হকু সিং মন্নুকে বললো, 'চুপচাপ কেন, বসবে না ?' তারপর দুলারীকে বলে, 'ওখান থেকেই গান শুরু করো বাঈজী, এদিক ওদিক যাবার দরকার নেই। এইরকম ঘেসেড়ে অনেক দেখেছি। দুদিন আগে রুমাল বিছিয়ে পয়সা ভিক্ষে করেছে, আজ এসেছে রোয়াব দেখাতে!'

কুবরা নন্‌হকুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'এ পাজীটা কে ?'

'তোমার খুড়ো, বাবু নন্‌হকু সিং,' আর সঙ্গে সঙ্গেই টেনে একটা বেনারসী চড়।

কুবরার মাথা ঘুরে যায়। বেল্ট-আঁটা সেপাই দু'টো উল্টোমুখো ছুট দেয়। মৌলবী সাহেব চড় খেয়ে চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলেন। টলতে টলতে কোনরকমে জ্ঞান আলীর দোকানে গিয়ে পৌঁছলেন।

'মৌলবী সাহেব, আপনিও ওই গুণ্ডার সঙ্গে বচসা করতে গেলেন ? এই রক্ষে যে কুড়ুল তুলে মারেনি,' জ্ঞান আলী বলে। কুবরার মুখ দিয়ে কথা সরে না।...'বলম বিদেশ রহে', গানটা শেষ হোলো। কেউ এলোওনা, কেউ গেলোও না। নন্‌হকু সিং আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে রেশমী কাপড়ে ঢাকা একটা পালকী এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে চৌবেদার এসেছে। দুলারীকে রাজমাতার আদেশ জানালো।

দুলারী চুপচাপ পালকীতে উঠে বসে। সন্ধ্যেবেলার ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরা কাশীর সরু গলির ভেতর দিয়ে পালকী শিবালয় ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে।

2

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। রাজমাতা পান্না শিবালয়ে পূজো করছিলেন। দুলারী বাইরে বসে আরো কয়েকজন গায়িকার সঙ্গে ভজন গাইছিলো। আরতি শেষ হতে গলায় আঁচল দিয়ে, করজোড়ে পান্না ঠাকুর প্রণাম করেন। প্রসাদ নিয়ে বাইরে

বেরিয়ে এসে ছুলারীকে দেখতে পেলেন। ছুলারী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো, 'আমি অনেক আগেই এসে পৌঁছতাম। কিন্তু কি করবো, মুখপোড়া সেই কুবরা মৌলবী রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলো। এই হুজ্জতে অনেকটা সময় নষ্ট হোলো, রাণীমা।'

'কুবরা মৌলবী! যেখানে যাই তারই কথা শুনি। কানে এলো, সে এখানে এসেও কিছু নাকি...,' হঠাৎ কি মনে করে কথা পালটে পান্না বললেন, 'হ্যাঁ, তারপর কি হোলো? তুমি এখানে এলে কি করে?'

'বাবু নন্‌হকু সিং এসে পড়ায় তাকে আমি সব বললাম। পূজোয় আমাকে ভজন গাইতে রাজমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন, আর এ আমায় যেতে দিচ্ছে না। মৌলবীকে তিনি এমন টেনে একটি চড় কসালেন যে কুবরা বাপের নাম ভুলে গেলো। তাই এখানে আসতে পেলাম।'

'বাবু নন্‌হকু সিং? সে আবার কে?'

মাথা হেঁট করে ছুলারী বললো, 'রাণীমা কি তাকে চেনেন না? বাবু নিরঞ্জন সিং এর ছেলে। মনে পড়ে, সেই ছোটবেলায় আমি একদিন আপনার বাগানে ছুলছিলাম আর নবাবের হাতী ক্ষেপে গিয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিলো। সেদিন বাবু নিরঞ্জন সিং-এর ছেলেই তো আমাদের বাঁচিয়েছিলো।'

পুরোনো ঘটনা শুনে রাজমাতার মুখ কেন মলিন হয়ে গেলো, তা বোঝা গেলো না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'তা বাবু নন্‌হকু সিং ওধারে কেন গিয়েছিলেন?'

একটু হেসে ছুলারী মাথা নীচু করে নিলো। রাজমাতা পান্নার বাপের জমিদারীতে যে বেশ্যা থাকতো ছুলারী তারই মেয়ে। ছোট-বেলায় পান্না তার সঙ্গে অনেক খেলাধুলো করেছেন। ছুলারীর গলা ছোটবেলা থেকেই বেশ সুরেলা। দেখতে সুন্দরী আর চঞ্চল। পান্না এখন কাশীর রাজমাতা আর ছুলারী কাশীর নায়কা

গায়িকা। রাজদরবারে প্রায়ই সে গান করে। মহারাজ বলবন্ত সিং-এর সময় থেকেই গানবাজনা পান্নার জীবনের একটা অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তখন প্রেম, দুঃখ, আঁন্থ দরদভরা বিরহের গানের প্রতিই পান্নার ঝোঁক ছিলো। এখন সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ ভজন গান হয়। রাজমাতা পান্নার শান্ত দীপ্ত মুখমণ্ডলে বৈধব্যের ছায়া পড়েছে।

বড়রাণী সতীনের জ্বালা বলবন্ত সিং এর মৃত্যুর পরেও মেটেনি। অন্দর মহলে তাঁরই দাপট। তাই মনের জ্বালা মেটাতে পান্না প্রায়ই কাশীর রাজমন্দিরে এসে পুজোপাঠের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখেন। রামনগরে তিনি শান্তি পেতেন না। নতুন রাণী ও বলবন্ত সিং-এর প্রেয়সী হবার গৌরব তাঁর ছিলোই, মাতৃত্বের গৌরবও তাঁরই প্রাপ্য। অসবর্ণ বিয়ের সামাজিক কলঙ্ক তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করতো। বিয়ের পর তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। সব মনে পড়ে যায়।

গঙ্গার ধারে চাতালের ওপর বসে পান্না অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার ঢেউ-এর দিকে তাকিয়েছিলেন। অতীতের কথা ভেবে আর কোনো লাভ নেই। স্মৃতির গর্ভে আজ সে সব তলিয়ে গেছে। তার ভালো মন্দে আর কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ সব কিছুরই হিসেব মেলাবার চেষ্টা করে। আর কখনও কখনও আপন মনে প্রশ্ন করে, 'যদি তা ঘটতো, তাহলে কি হোতো ?'

পান্নাও তাই ভাবছিলেন, এক সম্ভাবনার কথা। রাজা বলবন্ত সিং জোর করে বিয়ে না করলে তাঁর জীবনের মোড় হয়তো ঘুরে যেতো। ননহকু সিং-এর নাম শোনার পরই এত কথা মনে পড়লো। গ্যাঁদা ছিলো তাঁর দাসী। সব ব্যাপারেই সে ফোড়ন কাটতো। পান্না যেদিন বলবন্ত সিং-এর প্রেয়সী হলেন, সেদিন থেকেই গ্যাঁদা তাঁর ছায়া। রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর উনি তার কাছেই পেতেন। কতো খবরই না ও রাখতো। দুলারীকে একটু অপদস্ত করবে মনে করে সে বলে, 'মহারাণী! ননহকু সিং ভাঁড়ের নাচ দেখিয়ে, মোষের লড়াই, ঘোড়দৌড় আর গানবাজনা করেই তার সমস্ত

জমিদারী উড়িয়ে এখন ডাকাত হয়েছে। যেখানে যতো খুন হয় সবেতেই তার হাত থাকে। যত...', তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই দুলারী প্রতিবাদ করে ওঠে, 'এসব বাজে কথা। বাবুসাহেবের মতন এরকম ধর্মপ্রাণ লোক আর হয় না। কত শত বিধবা তাঁর দেওয়া কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে। কত মেয়ের বিয়ে তিনি দিয়েছেন। কত লাঞ্ছিতকে তিনি লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।'

রাণী পান্নার হৃদয় করুণায় ভরে যায়। তিনি একটু হেসে দুলারীকে বললেন, 'উনি বুঝি তোর ওখানে আসেন! তাই বুঝি তুই ওঁর প্রশংসায়......'

'না রাণীমা। দিব্বি গেলে বলছি, বাবু ননহকু সিং আজ পর্যন্ত কখনও আমার ঘরে পা দেন নি।' বোঝা গেলো না এই অদ্ভুত লোকটিকে জানবার জন্যে রাজমাতা এতো চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন। দুলারী যাতে আর কিছু না বলে সে জন্যে তিনি তার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন। দুলারীও আর কিছু বললো না। ভোরের সানাই বাজতেই দুলারী বিদায় নিয়ে পালকীতে এসে বসলো। গ্যাঁদা রাণীমাকে শুনিয়ে বলতে লাগলো—'দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। কত জায়গায় যে জুয়া খেলে লোকেরা তাদের সর্বস্ব হারাচ্ছে তার ঠিকঠিকানা নেই। বাচ্চাদের ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। গলিঘুঁজিতে কথায় কথায় ছুরি লাঠি চলে। ওদিকে রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গেও মহারাজের তেমন বনিবনা হচ্ছে না।' শুনে রাজমাতা চুপ করে থাকেন।

পরের দিন রাজা চেতসিং-এর কাছে রেসিডেণ্ট ম্যাকহেম সাহেবের চিঠি আসে। চিঠিতে সহরের দুরবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ডাকাত আর গুণ্ডাদের ধরপাকড় করার ও তাদের প্রতি কড়া নজর রাখার আদেশ এসেছে। মৌলবী কুবরার ঘটনারও উল্লেখ আছে। হেষ্টিংস সাহেবের আসার খবরও রয়েছে। শিবালয় ঘাটে ও রামনগরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। যার হাতে লাঠি, লোহার মাথাওয়ালা ডাণ্ডা, কুড়ুল, কাটারী বা ছোরা

দেখতে পেলো, কোতোয়াল হিম্মত সিং পাগলের মত তাদের ধরপাকড় করতে লাগলো।

নন্হকু সিং তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে সুম্মা ও খালের সঙ্গমে একটা সবুজ ঘাসের ঢিপির ওপর বসে ভাঙ ছাঁকছিলো। গঙ্গায় ওর সরু ডোঙ্গাটা বটগাছের ঝুরির সঙ্গে বাঁধা ছিলো। সঙ্গে চারণ গানও চলছিলো। চারটে এক্কাগাড়ী জোতা ছিলো।

নন্হকু সিং হঠাৎ বলে উঠলো, 'আরে মলুকী। গানতে মোটেও জমছে না। ডাকঘরের এই একটা এক্কাগাড়ী নিয়ে দুলারীকে ডেকে আন।' মলুকী খঞ্জনী বাজাচ্ছিলো। দৌড়ে এক্কাগাড়ীতে গিয়ে বসলো। নন্হকু সিং-এর মনটা আজ ভালো নেই। এতবার করে চেঁকে খেয়েও ভাঙের নেশা হচ্ছে না। একঘণ্টার মধ্যে দুলারী সামনে এসে হাজির। দুলারী একটু হেসে প্রশ্ন করলো, 'কি হুকুম, বাবুসাহেব ?'

'দুলারী, আজ গান শুনতে ইচ্ছে করছে।'

কি ব্যাপার জানবার জন্যে দুলারী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'তা এই বনবাদাড়ে কেন ?'

'ভয়ের কিছু নেই,' নন্হকু সিং একটু হেসে জবাব দেয়।

'এই কথাই তো আমি সেদিন মহারাণীকেও বলে এসেছি।'

'কি বললি,.........কাকে ?'

'রাজমাতা পান্নাদেবীকে.........'

সেদিন গান আর জমলো না। দুলারী লক্ষ্য করলো গান শুনতে শুনতে নন্হকু সিং-এর চোখ জলে ভরে আসছে। গান বাজনা থেমে যায়। বর্ষার রাতে ঝোপ ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁর একটানা সুর। মন্দিরের কাছে ছোট্ট একটা ঘরে নন্হকু সিং গভীর চিন্তায় বিভোর। তার চোখে ঘুম নেই, বাকী সবাই শুয়ে পড়েছে। দুলারীও জেগে আছে। ভাবনা যেন তাকেও পেয়ে বসেছে। অনেক করে আজ নিজেকে দুলারী সামলে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে নন্হকু সিং-এর কাছে এগিয়ে যায়। হঠাৎ শব্দে চমকে উঠে

নন্‌হকু সিং পাশ থেকে তরোয়ালটা উঠিয়ে নিলো। তুলারী একটু হেসে বললো, 'বাবুসাহেব, এ কি ব্যাপার ? মেয়েদের ওপরেও কি তরোয়াল চালাবে ?'

ছোট প্রদীপের আলোয় কামনাদীপ্ত রমনীর মুখ দেখে নন্‌হকু হেসে উঠলো। 'কি বাঈজী, তোমাকে কি এই সময়েই যেতে হবে ? মৌলবী কি ডেকে পাঠিয়েছে ?' তুলারী নন্‌হকুর পাশে গিয়ে বসে পড়লো। নন্‌হকু প্রশ্ন করে, 'ভয় করছে নাকি ?'

'না, আমি একটা কথা জানতে চাই।'

'কি ?'

'কি…জিগ্যেস করছো………এই কথা………তোমার হৃদয়ে কি কোনদিন……… ।'

'সে কথা থাক তুলারী। হৃদয়-ত্রিদয় সব বেকার। ওটাকে আমি হাতে নিয়েই বেড়াই। ভাবি কেউ যদি এই হৃদয়টাকে ভেঙ্গেচূরে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। মরতে তো কত চেষ্টাই না করছি, কিন্তু পারছি কই।'

'মৃত্যুকে আবার খুঁজে বেড়াতে হয় নাকি ? কাশীর যে কি অবস্থা তার খবর কি আপনি রাখেন ? নিমেষের মধ্যে যে কি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে তা ভাবাই যায় না। বেনারসের গলি-ঘুঁজি সব যেন গিলতে আসছে।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি রে ?'

'কোন এক হেষ্টিংস সাহেব এসেছেন। শুনছি শিবালয় ঘাটে ইংরেজ কোম্পানী দিশী সিপাইদের পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। রাজা চেতসিং আর রাজমাতা পান্না এখানে নেই। কেউ কেউ বলছে ওদের তুজনকে নাকি গ্রেপ্তার করে কলকাতায়…'

'পান্না ও……রাণীদের বাসও ওখানে।' নন্‌হকু অধীর হয়ে প্রশ্ন করে।

'রাণী পান্নার কথা শুনে আজ আপনার চোখে জল কেন, বাবু-সাহেব ?'

হঠাৎ ননৃহকুর মুখের চেহারা অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলো। তিরিক্ষি মেজাজে বলে বঠলো—'চুপ কর, সে কথা শুনে তোর লাভ কি?'

ননৃহকু উঠে দাঁড়ালো। ব্যস্ত হয়ে কিছু খুঁজতে লাগলো। পরে একটু শান্ত হয়ে বললো—'ডুলারী, জীবনে আজ এই প্রথম আমার খাটে বসে আছে একটি মেয়ে গভীর রাতে। আমি চিরকুমার, শুধু একটি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে কত শত সহস্র অন্যায় আর অপরাধ করে চলেছি। কিন্তু কেন? তা তুমি জানো? আমি নারী জাতির বিরুদ্ধে। আর পান্না!...তবে তারই বা কি অপরাধ? আমি অত্যাচারী বলবন্ত সিং-এর বুকে তো ছুরি বসাতে পারলাম না। কিন্তু পান্না! ওকে ধরে গোবারা কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে......সেখানে...... ।'

ননৃহকু সিং পাগলের মতো ছটফট করতে থাকে। ডুলারী তাকিয়ে দেখলো ননৃহকু বটগাছের কাছে গিয়ে অন্ধকারে গঙ্গার ঢেউ-এর বুকে ডোঙ্গা ভাসিয়ে দিলো। ভয়ে ডুলারী কাঁপতে থাকে।

3

১৭৮১ সালের ১৬ই অগাষ্ট, কাশীতে মহা ডামাডোল পড়ে গেছে। শিবালয় ঘাটে রাজা চেতসিং লেফ্টেন্যাণ্ট হষ্টাকরের নজর বন্দী হয়েছেন। সারা সহরে একটা সন্ত্রাসের ভাব। সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। ঘরে ঘরে ছেলেরা মাকে জিগ্যেস করে, 'আজ হালুয়াওয়ালা আসেনি?' উত্তরে মা ধমক দিয়ে ওঠেন। বলেন, 'চুপ কর বাবা!'—সারা সহর নিস্তব্ধ। মাঝে মধ্যে কুবরা মৌলবীকে ইংরেজদের দিশী সৈন্যদের আগে আগে যেতে আসতে দেখা যাচ্ছে। তাদের দেখে খোলা জানলা সব বন্ধ হয়ে যায়। ভয় ও ত্রাসের রাজ্য যেন। কাশীর সমস্ত বীরত্ব যেন চকের চিথরু সিং-এর বাড়ীর উঠোনে বন্দী হয়েছে। সেখানে যেন কোতয়ালীর অভিনয় চলেছে। কে যেন চেঁচিয়ে ডাক দিলো, 'হিম্মৎ সিং।'

জানলার ভেতর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে হিম্মৎ সিং প্রশ্ন করে, 'কে ?'

'বাবু নন্‌হকু সিং।'

'তুমি কি এতক্ষণ বাইরেই ছিলে ?'

'পাগল, রাজা বন্দী। সিপাইদের সব ছেড়ে দাও। আমি এদের সকলকে নিয়ে একবার শিবালয় ঘাটে যাই।'

'দাঁড়াও,' বলে হিম্মৎ সিং আদেশ দেয়। সিপাইরা সব বাইরে আসে। নন্‌হকুর তরবারী ঝনঝনিয়ে উঠলো। সিপাইরা ভেতরে পালিয়ে গেলো। ননহকু বলে ওঠে, 'নিমকহারামের দল, কাপুরুষ কোথাকার, হাতে সব চুড়ি পরে নে।' লোকগুলোকে দেখতে দেখতে নন্‌হকু সিং চলে গেলো। আবার সব নিশ্চুপ।

নন্‌হকু সিং আজ উন্মত্ত। ওর সাঙ্গ-পাঙ্গদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আজ ওর কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাজা চেতসিং-এর রাজনৈতিক অপরাধ কি আর তাকে কেনই বা দূরে পাঠানো হচ্ছে, সে সব কথা এরা কিছুই জানে না। এদিকে নিজেদের ডোঙ্গা নিয়ে জলের ঢেউ কাটতে কাটতে তারা শিবালয়ের খিড়কীর নীচে এসে পৌঁছলো। পাড়ে পড়ে-থাকা পাথরে কোনো রকমে দড়ি লাগিয়ে ডোঙ্গা বাঁধলো। তারপর বাঁদরের মতো লাফ দিয়ে দিয়ে জানলার ভেতর ঢুকে পড়লো। ঠিক এই সময় রাজমাতা পান্না আর যুবরাজ চেত-সিংকে উদ্দেশ্য করে বাবু মণিয়ার সিং বলছিলো, 'আপনারা যদি এখানে থাকেন তাহলে আমরা যে কি করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। পূজো-আচ্ছা শেষ করে যদি আপনারা রামনগর চলে যেতেন তাহলে……'

তেজস্বিনী পান্না জবাব দেন, 'এখন রামনগরে যাবই বা কেমন করে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণিয়ার সিং বলে, 'কি বলবো, আমার সিপাইরাতো সব বন্দী।'

এমন সময় দরজায় কোলাহল শোনা গেলো। রাজপরিবারের সবাই তখন শলাপরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে নন্‌হকুর উপস্থিতি

কেউই লক্ষ্য করেনি। সামনের দরজা বন্ধ ছিলো। নন্হকু সিং গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা নৌকো ঘাটে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের সঙ্গে যুঝছে। নন্হকু বেশ খুশী হয়ে ওঠে। এরই জন্যে ও এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো।

'মহারাণী কোথায় ?' ওর এই প্রশ্নে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে।

সবাই ফিরে দেখে।···অপরিচিত এক বীর মূর্তি, যেন অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত এক দেবতা।

চেতসিং প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি ?' 'রাজপরিবারের বিনা মাইনের গোলাম।' পান্না ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। উনি চিনে ফেলেছেন। এতো বছর পরে। সেই নন্হকু সিং।

মণিয়ার সিং জিগ্যেস করলো, 'তুমি কি করতে পারো ?'

'আমি প্রাণ দিতে পারি। সব আগে মহারাণীকে ডোঙ্গায় বসান। নীচে অন্য একটা ডোঙ্গাতে ওস্তাদ মাঝিরা আছে। কথা পরে বলবেন।'

মণিয়ার সিং দেখতে পায়, অন্দর মহলের প্রতিহারী রাজার একটা ডিঙ্গির কাছে চারজন মাঝি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডিঙ্গিটা জানলায় লাগানো। পান্নাকে বললো, 'চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আরে···' পুত্রবাৎসল্য পান্না চেতসিং-এর দিকে তাকিয়ে এক প্রশ্ন করলেন। কেউ উত্তর দিতে পারলো না। মণিয়ার সিং বলে ওঠে, 'তাহলে আমি এখানেই···?'

নন্হকু হেসে বললো, 'হুজুর, আমার মালিক, নৌকোতে গিয়ে বসুন। যতক্ষণ না রাজাও নৌকোতে গিয়ে বসবেন ততক্ষণ সতেরোটা গুলি খেয়েও নন্হকু সিং খাড়া থাকবে।'

পান্না নন্হকুর দিকে তাকালেন। এক নিমেষের জন্যে চারচোখ এক হোলো। দৃষ্টিতে জন্ম-জন্মান্তরের বিশ্বাস যেন দীপ্ত হয়ে উঠলো। সদর দরজা জোর করে খোলার চেষ্টা চলছে বোঝা যায়।

নন্হকু প্রায় পাগলের মতো বলে উঠলো, 'হুজুর, তাড়াতাড়ি করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে পান্না নৌকোয় গিয়ে বসলেন আর ননৃহকু সিং দরজার সামনে হষ্টাকর-এর মুখোমুখি হলো। চেতরাম এসে মণিয়ার সিং এর হাতে একটা চিঠি দিলো। লেফ্টেন্যান্ট সাহেব বললেন, 'তোমার লোকেরা গোলমাল আরম্ভ করেছে। আমার সিপাইরা এইবার গুলি চালালে আমি বাধা দিতে পারবো না।' 'সাহেব আমার সিপাই এখানে কোথায়?' মণিয়ার সিং হেসে বললো। বাইরের কোলাহল তখন আরো বেড়ে গেছে।

চেতরাম নির্দেশ দেয়, 'সবার আগে চেতসিংকে বন্দী করুন।'

'কার এত সাহস আছে?' সদর্পে তরবারি খুলে মণিয়ার সিং রুখে দাঁড়ালো। কথা তখনও শেষ হয়নি, কুবরা মৌলবী এসে হাজির। এখানে মৌলবী সাহেবের কারিকুরি চলবে না। পালাবার পথও বন্ধ। মৌলবী চেতরামকে হুকুম দিলেন, 'দেখছো কি?'

চেতরাম রাজার গায় হাত দিতেই ননৃহকুর তরবারিতে তার হাত উড়ে গেলো। হষ্টাকর এগিয়ে এলেন। মৌলবীও চীৎকার সুরু করে দিলো। চোখের নিমেষে হষ্টাকর ও তার দলের কয়েকজনকে ননৃহকু সিং ধরাশায়ী করলো। মৌলবীরও আজ আর নিস্তার নেই।

ননহকু সিং বললো, 'কেন, সেদিনকার রদ্দা খেয়েও শিক্ষা হয়নি, তবে দেখ পাজি,' বলেই এমন সুন্দর হাতের খেল দেখালো যে এক কোপেই মৌলবী কাৎ। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো যে কেউই তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না।

ননৃহকু সিং চেঁচিয়ে চেতসিংকে বললো, 'দেখছেন কি? নৌকোতে গিয়ে উঠুন। ননৃহকুর ক্ষত থেকে তখন রক্তের ধারা বইছে। ওদিকে সদর দরজা দিয়ে ইংরেজদের দিশী সিপাইয়া ঢুকতে থাকে। চেতসিং জানালা দিয়ে নীচে নামার সময় দেখতে পেলেন অগুন্তি সিপাইদের সঙ্গীনের সামনে দাঁড়িয়ে ননৃহকু অবিচলিত ভাবে তরবারি ঘুরিয়ে চলেছে। অটল ননৃহকুর পাথরের মত সবল দেহ থেকে গেরুয়া মাটির রক্ত গঙ্গা বয়ে চলেছে! গুণ্ডার শরীরের এক একটা অঙ্গ কেটে পড়ছে! এই সেই কাশীর গুণ্ডা!

নূপুর

বাজারে এক নতুন ধরণের নূপুর চালু হয়েছে। পায়ে পরে নিলে বড় চমৎকার দেখায়। নূপুরের ঘুঙুরগুলো কি সুন্দর ভাবেই না একটার পর একটা গাঁথা। যেন নিজের কোনো রূপ নেই, যে পায়ে পরানো যায় সেই পায়ের আকারই ধারণ করে।

আশপাশের ঘরের ছোট-বড় মেয়ের পায়ে ঐ একই নূপুর দেখতে পাবেন। একজন পরলো, তো অন্যজনের পায়ে উঠলো। দেখতে দেখতে সবায়ের পায়েই নূপুর—নূপুরহীন পা ভাবাই যায় না।

আমার মুন্নীও আব্দার ধরলো—বাবা, আমি নূপুর পরবো। বলুন তো, চার বছর বয়স, এখনই সে নূপুর পরবে!

আমি বললাম—কি রকম নূপুর?

বললো—রুক্মিনী যেমন পরে, শীলা যেমন পরে আছে।

আমি বললাম—আচ্ছ, দেখা যাবে।

জেদ ধরলো—আজই কিনবো।

বললাম—আচ্ছা, আজই কিনে দেবো, হলোতো?

তখনকার মতো মুন্নী অন্য কাজে মশগুল হয়ে গেলো। দুপুর-বেলা ওর পিসি এলেন, দেখলাম, সহজে ভোলবার পাত্রী ও নয়।

পিসি মুন্নীকে মিষ্টি খাওয়ালেন; কোলে নিয়ে আদর করে বললেন—তোর নূপুর আসছে রবিবার নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো।

রবিবারে পিসী নূপুর নিয়ে আসেন। মুন্নী নূপুর পরে খুশীতে ডগোমগো। এদিক থেকে ওদিক নেচে বেড়াতে থাকে। রুক্মিনীর কাছে গিয়ে বলে—দেখ রুক্মিনী, আমার নূপুর। শীলাকেও নিজের নূপুর দেখায়। নূপুর পরেছে দেখে সবাই ওকে আদর করে, নূপুরের তারিফ করে।

রূপোর দু'তিন নরী হার গোড়ালির সঙ্গে জড়িয়ে পায়ের চারিপাশে বেছানো। কি সুন্দরই না লাগে। মুন্নী আহ্লাদে আটখানা।

আমাদের আশুতোষ মহাশয়, মুন্নীর দাদা। মুন্নীর সাজগোজ দেখে গোড়ায় মহাখুশী। নূপুর পরেছে মুন্নী, আশুতোষ তার আদরের মুন্নীকে হাত ধরে নিয়ে যায় আশেপাশের লোককে দেখাবার জন্যে।

নূপুর পেয়ে মুন্নীর গর্বের সীমা নেই, গর্ব আশুতোষেরও। খুব হাসলো, হাত তালি দিলো কিন্তু একটু পরেই ঝেঁকে বসলো, বললো—মুন্নীকে নূপুর দিয়েছো, আমার সাইকেল চাই।

পিসি বললেন—আচ্ছা সোনা, এবারে জন্মদিনে তোমায় সাইকেল দেবো।

আশুতোষ বললো—না, তা হবে না, আমি এখনই সাইকেল কিনবো।

পিসি বললেন—ছি ছি, তুই কি মেয়ে নাকি? মেয়েরা জেদ করে কাঁদে। বাবুসাহেবরা কি কখনও কাঁদে?

আশুবাবু বললো—জন্মদিনে সে সাইকেল নেবেই নেবে।

পিসি বললেন—নিশ্চয়ই। তাহলে, এই পাকা কথা রইলো, জন্মদিনে তুমি সাইকেল পাবে।

এভাবে রবিবারটা বেশ হাসিখুশীতে কেটে যায়। বিকেল হতেই পিসি চলে গেলেন। মুন্নীর নূপুর পরার সখও মিটে গেলো। তাই সেগুলো পা থেকে খুলে তুলে রাখা হোলো। হারিয়ে যেন না যায়। নূপুরের কাজ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে মনে হয় বেশ দামী জিনিস।

শ্রীমতী আমাকে বললেন—হ্যাঁ গা, বেশ লাগছে দেখতে, আমিও কি একটা তৈরী ক'রে নেবো?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই বানাবে। তোমার বয়স চারের চেয়ে কি আর বেশী?

রাত্রিবেলায় আমি আমার টেবিলের সামনে বসে আছি, শ্রীমতী এসে জিগ্যেস করলো, আমি নূপুরটা দেখেছি কিনা ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—তার মানে ?

শ্রীমতী বললো, এখানে টেবিলের এদিকে-ওদিকে পড়ে নেই তো ? একটা ওখানে পড়ে আছে, অন্যটা পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেছে জানো ?

আমি বললাম, যাবে কোথায় ? এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই পড়ে আছে, খুঁজে দেখোনা, পেয়ে যাবে।

শ্রীমতী আমার টেবিলের কাগজপত্তর সরাতে সুরু করলো। আলমারির বইপত্তর ওলট পালট করার ইচ্ছাও প্রকাশ করলো।

আমি বললাম, কি করছো কি ? এখানে নূপুর কি করে আসবে ?

শ্রীমতী আমাকেই জিগ্যেস করতে লাগলো, তবে গেলো কোথায় ?

আমি বললাম, তুমিই তো রেখেছো। বলো কোথায় রেখেছো ?

শ্রীমতী বললো, দুপুরবেলায় প্রায় দুটোর সময় নূপুর দুটো খুলে আমি বাক্সের তলায় ভালভাবে রেখে দিয়েছিলাম। এখন দেখি একটা আছে, অন্যটা গায়েব।

আমি বললাম, নূপুর নিজের থেকে আমার ঘরে কি করে চলে আসবে বলো ? তোমার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে। একটা রেখেছো অন্যটা নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও পড়ে আছে। ভালো করে দেখো। পেয়ে যাবে। কোথায় আর হারাবে ?

শ্রীমতী ঝগড়া সুরু করে দিলো। তুমিতো ওই রকম। নিজের কোনোদিকে খেয়াল নেই, আবার উল্টে আমাকে দোষ দিচ্ছো। আমি তো বলছি দুটো নূপুরই আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম—যদি যত্ন করেই রেখে থাকো তো এদিক-ওদিক খুঁজছো কেন ? যেখানে রেখেছো সেখান থেকে নিয়ে নাও না। ওখানে নেই, তার মানে কেউ না কেউ ওটা উঠিয়ে নিয়েছে।

শ্রীমতী বললো, আমারও সেটাই মনে হয়। বংশী চাকরটা নিশ্চয়ই নিয়েছে। আমি যখন রেখেছিলাম তখন তো ছিলো।

বললাম—ওকে জিগ্যেস করেছো ?

বললো—ওতো পরিষ্কার 'না' বলে দিলো।

আমি বললাম—তবে ?

শ্রীমতী জোরে বলে উঠলো, আমিই বা কি বলবো ? তোমার তো কোনো ব্যাপারেই গা ঘামে না। ঐ বংশীটাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলছো না কেন ? নূপুর ও ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না।

আমি বললাম, আচ্ছা সে না হয় হলো। ওকে কি বলতে হবে ? 'দে ভাই, নূপুরটা দিয়ে দে'—এই কথা ?

শ্রীমতী রেগেমেগে বলে উঠলো—ঢের হয়েছে, তোমায় আর কিছু বলতে হবে না। চাকরটাকে লাই দিয়ে তো মাথায় তুলেছো। বকা-ঝকা না করলে এ ছাড়া আর কি হবে ?

আরও বললো—বলছি তো, কেউ-না-কেউ ওটা বাক্স থেকে বার করে নিয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ, এটা বংশীরই কাজ। শুনছো, বংশী ছাড়া আর কেউ নয়।

আমি বললাম—বংশীকে তো জিগ্যেস করেছিলাম। মনে হয় না ও নিয়েছে।

শুনে শ্রীমতী বললো—চাকর বাকরদের তুমি জানো না। ওরা ভীষণ ঝানু। বংশী নিশ্চয়ই নিয়েছে। না হলে কি ভূতে এসে নিয়ে গেলো ?

বললাম—আশুতোষকে জিগ্যেস করেছো ?

বললো—খোঁজার সময় ট্রাঙ্ক আর বাক্সের তলায় সে নিজে ঢুকে ঢুকে দেখছিলো। এই খোঁজাখুঁজিতে ও আমায় সাহায্য করেছিলো। ও নিতেই পারে না।

আমি বললাম, ও ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসে।

শ্রীমতী বললো, তুমি ওকেও তো কিছু বলো না, বারণও করো না। বয়স বাড়ছে, এই রকমই চিরকাল চলবে। ঘুড়ির নেশা তো তুমিই ওকে ধরিয়েছো।

আমি বললাম—ও যদি নূপুরটা কুড়িয়ে পেয়ে থাকে ?

শ্রীমতী বলে ওঠে—না, না, না, তা সম্ভব নয়। পেলে কি বলতো না ?

কথায় কথায় জানতে পারলাম আশুতোষ সেদিন বিকেলবেলাই নতুন ঘুড়ি আর সুতো-শুদ্ধ লাটাই কিনে এনেছে।

শ্রীমতী বললো—ঘুড়ি কেনায় আস্কারা ওকে তুমিই দাও। সারাদিন খালি ঘুড়ি আর ঘুড়ি। একটু বসে কখনও ওর পড়া ধরেছো ? এক একদিন ভাবি ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ফেলেদি সব। দিনরাত ঘুড়ির চিন্তাই মাথায় ঘুরছে ওর।

আমি বললাম—আজ থাক, কাল সকালে ওকে জিগ্যেস করবো।

সকালে ওকে ডেকে খুব গম্ভীর হয়ে জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, একটা নূপুর পাওয়া যাচ্ছেনা। তুই দেখেছিস কি ?

ও রেগে গুম হয়ে গেলো। মুখে কিছু বললো না। মাথা নাড়িয়ে জানালো, নেয়নি।

বললাম—দেখো বাছা, নিয়ে থাকোতো কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সত্যি বলো।

ওর মুখ আরও ফুলে উঠলো গুম মেরে বসে রইলো।

মনে মনে ভাবতে থাকি কি করা উচিত। ঠিক করি, দোষীর প্রতি করুণা দেখানোই উচিত হবে। রেগে কোনো লাভ নেই। ভালোবাসা দিয়েই অপরাধীর হৃদয় জয় করা যায়। ভয় দেখিয়ে দাবানো ঠিক হবে না। শিশুদের মন স্বভাবতই নরম, ওদের মন স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই জয় করতে হয়।

আমি বললাম—বাবা আশুতোষ, ভয় পেয়ো না। সত্যি বলতে ভয় কিসের ? যদি নিয়ে থাকো তো বলে ফেলো। সত্যি বললে কি কেউ কখনও শাস্তি দেয়। বরঞ্চ, সত্যি বললে পুরস্কার পাওয়া যায়।

আশুতোষ সব কিছু শুনেও মুখ গোমড়া করে বসে রইলো। আমার দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছিলো না। থেকে থেকে তার কপালটা কুঁচকে উঠছিলো।

—হ্যাঁ বাবা, তুই নিসনি তো ?

রেগে গিয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে উঠলো, আমি নিইনি, নিইনি, নিইনি।

প্রায় কাঁদো কাঁদো কিন্তু কাঁদলো না। চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো।

এই সময় আমার মনে হোলো, ও নিশ্চয়ই দোষী, নাহলে এতো মেজাজ গরম করবে কেন ?

আমি বললাম—বাবা, ভয় পেয়ো না। যাও, খুঁজে দেখো। হয়তো কোথাও পড়ে আছে, পেয়ে যাবে। খুঁজে পেলে প্রাইজ পাবে।

ও চলে গেলো। অন্য ঘরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলো।

শ্রীমতী এসে বললেন—আশুকে জিগ্যেস করেছো ? কি মনে হোলো ?

আমি বললাম—আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। এটা চাকরের কাজ নয়।

শ্রীমতী বললে—কি যে বলো, আশু কেন নিতে যাবে ?

আমি আর কিছু বললাম না। আমার মনই জানে পুত্র বাৎসল্যে আমার ভেতরটা তখন কেমন করছিলো। ঠিক এই সময় আমার মনে হচ্ছিলো আশুকে আমাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করলে চলবে না। বরঞ্চ এই সময় ওর আরও বেশী কিছু পাওনা। মনে হচ্ছিলো এটা যেন একটা দুর্ঘটনা। আশুতোষ যদি চুরি করে থাকে তো সেটা ওর বিশেষ দোষ নয়, এটা আমাদেরই খুব বড় একটা গলদ। শিশুরা চুরি করতে শিখলে বড় ভয়ের ব্যাপার। যে পরিস্থিতিতে পড়ে শিশুরা চুরি করে, সেই পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। এটাই আমার মত। সে চুরির দায়িত্ব থেকে নিজেদের আমরা মুক্ত করতে পারি না।

আবার ওকে ডেকে বললাম—আচ্ছা শোনো, আমার দিকে ভালো করে তাকাও, নূপুরটা ছুন্নুকে দিয়েছো, এই তো।

খানিকক্ষণ ও চুপ করে থাকে। মুখটা লাল হয়ে আবার ফ্যাকাশে মেরে যায়। ওর মুখের প্রত্যেকটা ভাব আমি লক্ষ্য করতে থাকি।

ভরসা দিয়ে বললাম—এতে আর কি হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো, ভয় পাবার কি আছে? ঠিক বলো বাবা, দেখি আমার আশু কেমন সত্যবাদী ছেলে।

অনেক কষ্টে ও মাথা নাড়ে।

খুব খুশী হয়ে বলে উঠলাম—ছুন্নুকে দিয়েছো তো?

ও মাথা নাড়লো।

সান্ত্বনা দিয়ে আদর করে বললাম—কথা বলো। ছুন্নুকে দিয়েছো?

ও বললো—হ্যাঁ—আঁ।

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দু'হাতে ওকে তুলে ধরি। বললাম, ভালো ছেলেরা এই রকমই বলে। আশু আমার রাজা ছেলে। বেশ গর্ব বোধ করতে থাকি। কোলে করে ওকে ওর মার কাছে নিয়ে যাই। সোল্লাসে বলে উঠি, দেখ, আমার ছেলে সত্যি কথা স্বীকার করেছে। নূপুর ও ছুন্নুকে দিয়েছে।

শুনে ওর মাও খুব খুসী। আশুকে চুমো খেলেন। আশীর্বাদ করে বাহবা দিলেন।

আশুতোষ একটু হাসলো। কিন্তু ওর মুখের উদাস ভাবটা এখনও যায়নি।

তারপর ওকে আলাদা নিয়ে আদর করে জিগ্যেস করলাম—নূপুরটাতো ছুন্নুর কাছে আছে, তাই না, তুমি নিয়ে আসতে পারবে?

আশুতোষ আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। আমি বললাম—যাও বাবা, নিয়ে এসো।

কিন্তু ও কিছু বললো না।

আমি যখন বারবার বলতে লাগলাম তখন ও উত্তর দেয়—ছুন্নুর কাছে না থাকলে ও কি করে দেবে?

আমি বললাম—ও যাকে দিয়েছে তার নামটা তোমায় বলে দেবে।

শুনে ও চুপ করে যায়।

আমি বারবার বলতে ও শুধু প্রশ্ন করে—ছুন্নুর কাছে না থাকলে, ও কি করে দেবে ?

কিছুতেই ওকে রাজী করাতে না পেরে বললাম—ওটা কোথাও না কোথাও তো থাকবে। আচ্ছা, ওটা তুমি কোথা থেকে নিয়েছিলে।

—কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—আর নীচে গিয়ে সেটা তুমি ছুন্নুকে দেখালে ?

—হ্যাঁ।

—ছুন্নুই কি এটা বিক্রী করার কথা বলেছিলো ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় বিক্রী করবে বলেছিলো ?

—বলেছিলো মিষ্টি, না, না, ঘুড়ি কিনবে।

—আচ্ছা, ঘুড়ি কিনবে বলেছিলো ?

—হ্যাঁ।

তাহলে নূপুরটা ছুন্নুর কাছে আছে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো ওটা ছুন্নুব কাছেই আছে, আর তা না হলে ঘুড়িওয়ালাব কাছে। যাও, ওর কাছ থেকে গিয়ে নিয়ে এসো। বলবে আমি ওকে প্রাইজ দেবো।

আশুতোষ যেতে চাইলো না। তার সেই একই প্রশ্ন, যদি ছুন্নুর কাছে না থাকে তাহলে ও কি করে দেবে ?

ওব জেদটা আমার ভালো লাগলো না। আমি বললাম—তুমি কি ওটা কোথাও পুঁতে রেখে এসেছে : সত্যি কি করেছো বলছো না কেন ?

ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো জবাব দেয় না।

আমি বললাম—কথা বলছো না কেন ?

ও গুম্ মেরে বসে রইলো। কোনো জবাব দিলো না।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—যাও যেখান থেকে পারো নূপুর নিয়ে এসো।

নিজের জায়গা থেকে যখন একপাও নড়লো না তখন আমি ওর কান ধরে উঠিয়ে দিলাম। বললাম—শুনতে পাচ্ছো, যাও, নূপুর নিয়ে এসো। না হলে বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।

কান ধরে উঠিয়ে দেওয়াতে ও ঘর থেকে বাইরে চলে গেলো। বারান্দার এক কোণে অভিমান করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমার খুব কষ্ট হল। ছেলেটা সত্যি কথা বলে এখন কিসের জন্যে এত ঘাবড়াচ্ছে বুঝে উঠতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে ওকে আস্তে আস্তে মিষ্টি কথায় বললাম, গিয়ে ছুন্নুকে বলছো না কেন?

প্রথমে কোনো কথা বললো না। তারপর যখন জবাব দিলো তখন সেই একই কথা, ছুন্নুর কাছে না থাকলে কোত্থেকে দেবে?

আমি বললাম—যদি ও বেচে দিয়ে থাকে তো, যত টাকায় বেচেছে সেটা আমি দিয়ে দেবো, বুঝেছো। যাও, তুমি গিয়ে ওকে বলোগে।

ছুন্নুর মা বলছিলেন যে তার ছেলে এ কাজ করতেই পারে না। সে নূপুর চোখেই দেখেনি।

এই কথা শুনে আশুতোষের মা বলে ওঠে—না, তোমার ছুন্নু মিথ্যে বলেছে। হ্যাঁরে আশুতোষ, তুই ওকে দিয়েছিলি না?

আশুতোষ আস্তে আস্তে বললো—হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

অন্যদিক দিয়ে ছুন্নু এসে হাত মুখ নেড়ে বলে—না আমায় দেয়নি। তারপর আশুতোষের দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁরে, আমায় কখন দিয়েছিস?

আশুতোষও জেদের ওপর বলে চলে, হ্যাঁ, দিয়েছি তো। বল, তোকে দিইনি?

ফল হোলো এই, ছুন্নুর মা ছুন্নুকে বেদম পিটলেন আর নিজে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন—হায়রে এবার তোর জন্যে চোর হলাম। জানি না, এ লক্ষ্মীছাড়া মরবে কবে।

ব্যাপারটা অনেক দূর গড়ালো। পাড়া-পড়শী মেয়েদের কানেও কথাটা উঠলো। শ্রীমতী বাড়ী ফিরে এসে বললো—ছুন্নু আর ছুন্নুর মা, দুইই সমান।

আমি বললাম—তুমি এত চেঁচামেচি করলে কেন? এ রকম করে কি কোনো সমস্যার সমাধান হয়?

শ্রীমতী বললো—হ্যাঁ, আমি তো চেঁচাই। এখন যাও না, গিয়ে ওদের কাছ থেকে নূপুরটা নিয়ে এসো না। নূপুরটা ওদের কাছ থেকে আনতে পারলে, তবেই বুঝবো হ্যাঁ।

আমি বললাম—শান্তিটা নূপুরের চেয়ে বড়। অশান্তি করলে তো আর নূপুর পাওয়া যাবে না।

শ্রীমতী রেগে মেগে গজগজ করতে করতে চলে গেলো। খানিক পরে ছুন্নুর মা আমাদের বাড়ী এলেন। শ্রীমতী ওঁকে সঙ্গে করে এনেছিলো। দুজনেই এখন শান্ত। ছুন্নুর মা বললেন—ছুন্নু তো নূপুর নেয়নি বলছে। নূপুরের যা দাম তা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম—এ আপনি কি বলছেন? বাচ্চা বাচ্চাই। আপনি আড়ালে ছুন্নুকে ভাল করে জিগ্যেস করেছেন?

উনি তক্ষুনি ছুন্নুকে আমার সামনে ডাকালেন। বললেন—হ্যাঁরে, নূপুরটা যদি দেখে থাকিস তো বলছিস না কেন?

ছুন্নু জোরে মাথা নাড়িয়ে জানালো সে নেয়নি। বললো—নূপুরটা আশুতোষের হাতে আমি দেখেছি। ও ঘুড়িওয়ালার কাছে দিয়ে এসেছে। আমি দেখেছি ওটা রূপোর ছিলো।

—তুমি ঠিক জানো?

—হ্যাঁ, ও আমায় ঘুড়ি কেনার জন্যে সঙ্গে যেতে বলেছিলো।

—নূপুরটা কত বড় ছিলো, বলো দেখি?

ছুন্নু যে মাপটা দেখালো সেটা ঠিকই। আমি ওর মার দিকে তাকিয়ে বললাম—এই দেখুন, খানিকক্ষণ আগেই ও বলছিলো যে ও নূপুর দেখেইনি, এখন বলছে দেখেছে।

আমার সামনেই ছুন্নুর মা ছুন্নুকে ধরে দমাদম্ পিটতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—মিথ্যে বলছিস, তোর গায়ের ছাল চামড়া না তুলি তো আমার নাম নেই।

আমি মাঝে পড়ে ছুন্নুকে মারের হাত থেকে বাঁচালাম। চুপচাপ শহীদের মত ও মার খেয়ে যাচ্ছিলো। এতটুকুও কাঁদেনি। কোণে আশুতোষ দাঁড়িয়েছিলো, ছুন্নু তাকে এক অদ্ভুত চাউনি মেলে শুধু দেখছিলো।

আমি সবাইকে চলে যেতে বললাম। ছুন্নুকে বললাম, যাও, খেলা করোগে। ওর মাকে বললাম—আপনি ওকে মারধোর করবেন না। নূপুর এমন একটা খুব বড় জিনিস নয়।

ছুন্নু চলে গেলে ওর মা আমাকে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি ওকে দোষী মনে করেন?

আমি বললাম—মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে ও কিছু জানে। ও নূপুরের ব্যাপারে জড়িত।

এই শুনে ছুন্নুর মা আমার স্ত্রীকে বললেন—চলো বোন, আমার সারা বাড়ী তোমায় তন্ন তন্ন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি নূপুর থাকে তো যাবে কোথায়।

আমার স্ত্রী আমার পাশেই বসেছিলেন। আমি বললাম—যেতে দিন, মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই সব বলে ওঁকে আমি শান্ত করি, তা না হলে ছুন্নুকে পিটিয়ে উনি ওর অবস্থা কাহিল করে তুলবেন স্থির করেছিলেন। বলছিলেন, ঐ লক্ষ্মী-ছাড়াকে আজ জ্যান্ত না পুঁতলে ওঁর গায়ের জ্বালা মিটবে না।

যাক্ কোন রকমে ঝঞ্ঝাট কাটলো, ঝামেলায় পড়ে অফিস যেতেও দেরী হয়ে গেলো। যাবার সময় শ্রীমতীকে বললাম, দেখো, আশুতোষকে বকাবকি কোরো না। ভালোভাবে সব কথা জিগ্যেস কোরো। ধমকালে বাচ্চারা বিগড়ে যায়, তাতে লাভ নেই, বুঝলে?

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরলাম। শ্রীমতী জানালো যে আশুতোষ সব ঘটনা খুলে বলেছে। নূপুরটা সে এগারো আনায়

ঘুড়িওয়ালাকে দিয়ে দিয়েছে। পয়সা ঘুড়িওয়ালা ক্ষেপে ক্ষেপে দেবে। পাঁচ আনা দিয়েছে, ছুন্নুর কাছে আছে। ও নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শ্রীমতীকে বলেছে।

শ্রীমতী বললো—আমি খুব আদব দেখিয়ে ওর পেট থেকে সব কথা বার করেছি। দু'তিন ঘণ্টা সমানে মাথা ঘামিয়েছি। হে ঈশ্বর, বাচ্চাদের মনও কি অদ্ভুত!

আমি শুনে খুব খুশী হলাম। বললাম—ভালো কথা। পাঁচ আনা ফেবত দিয়ে নূপুরটা আনিয়ে নেওয়া যাক্। ঘুড়িওয়ালাটাও কি পাজি, বাচ্চাদেব কাছ থেকে এই সব জিনিস নেয়। ওকে পুলিশেব হাতে দেওযা উচিত। বদমাইস কোথাকার।

আশুতোষ কোথায় খবব নিলাম শ্রীমতী জানালো—বাইরে কোথাও খেলাধুলো করছে।

বংশীকে ডেকে বললাম—যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

বংশী ফিবে এসে বললো—ও এক্ষুণি আসছে।

—কি করছে?

—ছুন্নুর সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলছে।

একটু পবেই আশুতোষ এলো। ওকে কোলে নিয়ে আদর করলাম। আমার কাছে আসার আগেই ওর মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। কোলে নেওয়াতেও ও বিশেয খুশী হয়ে'ছ বলে মনে হোলো না।

ওর মা মহাখুশী হযে বললো যে আশুতোষ নিজেই সব কথা তাকে বলে দিয়েছে। আশুতোষ খুবই সত্যবাদী।

আশুতোষ আমার কোলেই বসেছিলো। নিজের প্রশংসা শুনে ও যে বিশেষ খুশী হয়েছে তাও মনে হো'লো না।

আমি বললাম—যাক্, আর চিন্তার কিছু নেই। কি বাবুসাহেব, তোমাকে মাত্তর পাঁচ আনাই তো দিয়েছে? আমার কাছে চাইলে আমি কি দিতাম না? আর এ রকম কোরো না।

ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করি—হ্যাঁ বাবা, ঘুড়িওয়ালা তোমায় পাঁচ আনাই দিয়েছিলো তো?

—হ্যাঁ।
—ওটা কি ছুন্নূর কাছে আছে ?
—হ্যাঁ।
—এখনও ওর কাছেই আছে তো ?
—না।
—খরচ করে ফেলেছে ?
—না।
—খরচ করেনি ?
—হ্যাঁ।
—খরচ করে ফেলেছে, না করেনি ?

এইভাবে প্রশ্ন করাতে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো জবাব দেয় না।

—বলো, খরচ করে ফেলেছে, না, এখনও ওর কাছে আছে ?

উত্তরে সে একবার 'হ্যাঁ' বলে তো দ্বিতীয়বার 'না'।

আমি বললাম—তুমি ঠিক জানো না, এ কথা বলছো না কেন ?

—হ্যাঁ।
—বাবা, তুমি জানো তো ?
—হ্যাঁ।
—ঘুড়িওয়ালার কাছ থেকে পয়সা ছুন্নূই তো নিয়েছিলো ?
—হ্যাঁ।
—তুমি কেন নিলে না ?

ও চুপ করে যায়।

—পাঁচটা এক আনি ছিলো না তুআনি আর পয়সা ছিলো ?

ও চুপ।

—উত্তর দিচ্ছো না কেন ?

তবুও চুপ।

—এক আনি কটা, বলো না ?
—দুটো।

—বাকী কি পয়সা ?

—হ্যাঁ।

—দু আনি ছিলো না ?

—হ্যাঁ।

—দু আনি ছিলো ?

—হ্যাঁ।

আমার রাগ ধরে যায়। দাবড়ানী দিয়ে বললাম—সত্যি কথা বলছো না কেন ? ঠিক ঠিক বলো, কটা এক আনি আর কি কি ছিলো ?

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, জবাব দেয় না।

—কথা বলছো না কেন ?

তবুও জবাব দেয় না।

শুনতে পাচ্ছো ? বলো, না হলে……।

আশুতোষ ভয় পায়, কিন্তু কোনো কথা বলে না।

—আমি কি বলছি, শুনতে পাচ্ছো না ?

এবারেও যখন কোনো কথা বললো না তখন আমি ওর কান মুলে দিলাম। কাঁদলো না, ঐ একভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

—এখনও বলবে না ?

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো, কিন্তু উত্তর দিতে পারলো না।

আমি চেঁচিয়ে হাঁক দিলাম—বংশী, এখানে এসো, একে নিয়ে গিয়ে চোর-কুঠরীতে বন্ধ করে রাখো।

বংশী ওকে কোলে কোরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে দিলো।

দশ মিনিট পরে আবার ওকে কাছে ডেকে নিলাম। ওর মুখ গোমড়া। কিছু বলছিলো না, কিন্তু ঠোঁট দুটো কাঁপছিলো। ঘরে বন্ধ করে রাখতেও ও কাঁদেনি।

আমি বললাম, কিরে, এখন তো শিক্ষা হয়েছে ?

শুনে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

—আচ্ছা কোন ঘুড়িওয়ালাকে দিয়েছো ? ডানদিকের চৌমাথার

ঐ লোকটাকে ?

বিড বিড় করে কি যেন বললো। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

—ওই চৌমাথার লোকটাতো ? বলো……

—হ্যাঁ।

—দেখ, কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, দেখিয়ে দিও কোন লোকটা। তারপর কাকা যা করার করবে। বুঝতে পেরেছো ?

এই বলে ছোট ভাইকে ডাকলাম। ওকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম—ছাখো, পাঁচ আনা পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাও। প্রথমে তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আশুতোষ পয়সা নিয়ে ওকে দিয়ে নূপুরটা চাইবে। আশা করছি নূপুরটা ও ফিরিয়েই দেবে। যদি না দেয় তো ওকে ধমকাবে আর বলবে যে, 'তোকে পুলিশের হাতে দেবো। বাচ্চাদের ঠকিয়ে জিনিস কেনা।' বুঝলে ? নরম হবার কোনো দরকার নেই।

—আশুতোষ, এইবার তুমি কাকার সঙ্গে যাও।

ও নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমার কথা শুনে একপাও নড়লো না।

—যাবে না ?

যাবে না বলে ঘাড় নাড়ালো।

ওকে অনেক বোঝালাম। বললাম—ঘরের জিনিস, দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে। এক টাকার মাল কি পাঁচ আনায় লুটিয়ে দেয় ? যাও, কাকার সঙ্গে যাও। তোমায় কিছু বলতে হবে না। শুধু পয়সাটা দিয়ে নিজের জিনিসটা চেয়ে নেবে। দিলো তো ভালো, না দিলো তো নেই, নেই। এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ঠিকতো, এবার যাও।

তার যাবার কোনো মতলব দেখলাম না। ছেলের এই বেয়াদপি অসহ্য মনে হোলো। বলুন তো এ আর এমন কি খারাপ কথা। এ আর এমন কি শক্ত কাজ। বুঝিয়ে বললেও বোঝে না।

কোনো কথাই কানে তোলে না। আমি বললাম—কিরে,

যাবি না? আবার মাথা নাড়ে, যাবে না বলে। আমি ছোট ভাই প্রকাশকে ডাকি। বলি প্রকাশ, একে ধরে নিয়ে যাও। প্রকাশ ওকে ধরতে গেলো। আশুতোষ হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানালো। ও সঙ্গে যাবে না। নিজেকে খুব সামলে নি। আবার আশুতোষকে আদর করে বলি—যা না, ভয়ের কি আছে। ঘরের জিনিস ঘরে ফিরে আসবে। এইটুকু বুঝতে পারছিস না। প্রকাশ ওকে কোলে করে নিয়ে যাও। ও যা চাইবে তাই বাজার থেকে কিনে দিও। আশুতোষ, যাও বাবা।

ওর মুখ তখনও ব্যাজার। অনেক বোঝানোর পর সে প্রকাশের সঙ্গে গেলো। এমনভাবে গেলো যেন ওর পা আর চলছে না। আট বছর বয়স হতে চললো, কিন্তু ছেলে দ্যাখো, কিছুই বোঝে না। আমার যে কি প্রচণ্ড রাগ হয়েছিলো তা আর কি বলবো। রাগ করলে বাচ্চাদের শোধরানো যায় না, বরঞ্চ আরো বিগড়ে যায়, তাই ভেবে কোনোমতে নিজেকে সামলে নি। ওর যাওয়ায় আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশকে ফিরে আসতে দেখে জিগ্যেস করলাল—কি ব্যাপার?

বললো—আশুতোষ পালিয়ে এসেছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, ও কোথায়?

—অভিমান করে বাইবে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর ভেতর আসছে না।

—যাও, ওকে ধরে নিয়ে এসো।

ওকে ধরে নিয়ে আসার পর জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, এখনও বাঁদরামি ছাড়লি না? বল, যাবি কিনা? কোনো জবাব না পেয়ে আমি কষে দুই চড় মারলাম। চড় খেয়ে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই চুপ করে গেলো। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

এইভাবে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চটে গিয়ে বললাম—

ওকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। চোরকুঠ্‌রীতে বন্ধ করে দাও। পাজি কোথাকার।

তাকে আধঘণ্টা ঘরে বন্ধ করে রাখা হোলো। মনে হোলো, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পেলাম না। মারধোর করার পর নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়াটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে প্রকাশকে ডেকে বললাম—তুই দুজন ঘুড়িওয়ালার কাছে যা। খোঁজ কর, কার কাছে নূপুরটা আছে। একটু সাবধানে কথাবার্তা বলিস। হদিশ পেলে মেজাজ দেখাস। ভালো ব্যবহার করার দরকার নেই। বুঝলি ?

প্রকাশ ঘুরে এলো। জানালো নূপুর দুজনের কারুর কাছেই নেই।

শুনে রেগে উঠলাম। বললাম—তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। সামান্য কাজটুকুও তুই করতে পারলি না। তোর দ্বারা কিছু হবে না।

বোঝাবার চেষ্টা করলে বললাম—ঠিক আছে, এখন যাও।

প্রকাশ আমাকে খুব সম্মান করে। মাথা হেঁট করে চলে গেলো। চোরকুঠ্‌রী খুলে দেখা গেলো আশুতোষ মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখ দেখে মনে হোলো না কান্নাকাটি করেছে। ওকে দেখে সত্যি খুব মায়া হোলো। মানুষের মনে একই সঙ্গে পরস্পর-বিরোধী কত রকম চিন্তাই না আসে।

ডেকে তুললাম। হড়বড়িয়ে উঠে বসলো। জিগ্যেস করলাম—কি খবর ? কেমন আছো ?

কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা মেরে থাকে। তারপর বোধহয় সবকথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে সেই একবর্গ্‌গার ভাবটা ফুটে ওঠে।

আমি বললাম—ভালোয় ভালোয় যাও, নয়তো আবার ঘরে পুরে রাখবো।

ওকে আবার ধরে আনলাম। অনেক করে বোঝালাম। একটা

টাকা দিয়ে বললাম ঘুড়িওয়ালকে দিয়ে নূপুরটা ফেরৎ নিয়ে আয়। ঘাবঁড়াবার কিছু নেই। তুমি তো বুদ্ধিমান।

ও বললো, নূপুর যদি তার কাছে না থাকে তো কেমন করে দেবে ?

—এ কথার মানে ? তুমি বলোনি, পাঁচ আনা নিয়ে নূপুরটা ওকে দিয়ে এসেছো। এক কাজ করো, ছুন্নুকেও সঙ্গে নিয়ে যাও, বুঝলে ?

ও চুপ করে যায়। অনেক বোঝাবার পর যেতে রাজী হোলো। আমি ওকে আদর করে বললাম, প্রকাশের সঙ্গে যাও। ওর গোমড়া মুখ দেখে ওকে বকতে যাবো এমন সময় হঠাৎ দেখি ওর পিসি আসছেন।

পিসি আশুতোষের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে জিগ্যেস করলেন—কোথায় যাচ্ছিসরে, আমি যে তোর জন্যে মিষ্টি আর কলা এনেছি।

আশুতোষ কোনো কথা বললো না। চোখে মুখে দারুণ একটা অভিমানের ছাপ। আমি পিসিকে বললাম—ওকে রুখবেন না, যেতে দিন।

আশুতোষ না-যাবার মতলবেই ছিলো। নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। পিসি জিগেস করলেন—ব্যাপারটা কী ? আমি বললাম, কিছু না, ওকে যেতে দিন। আশুতোষ বায়না ধরে। আমি ধমক দিয়ে বললাম, প্রকাশ ওকে নিয়ে যাচ্ছো না কেন ? পিসি প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কী ? আমায় বলছো না কেন ?

আমি হাঁক পাড়ি, বংশী তুইও সঙ্গে যা। মাঝপথে যাতে ফিরে আসতে-না পারে। আমার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে আশুতোষকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো।

পিসি বললেন, কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছো ? আমি বললাম, কিছু না, এই একটু…। আমি ওঁর সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। রাজনীতি শুধু রাষ্ট্রেরই নীতি নয়, মহল্লারও

নীতি। এর দায়িত্ব মেয়েদের। কোথায় কি ঘটলো, কি ঘটা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে রঙ ফলিয়ে মেয়েরা আলোচনা করে।

এই ধরনের কিছু কথাবার্তা হোলো। পিসি একটা ছোট্ট বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললেন, যে কাগজগুলো তুমি চেয়েছিলে, সেগুলো এর মধ্যে আছে। আর এই যে…

এই কথা বলেই উনি নিজের ওয়েষ্টকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নূপুরটা বার করে সামনে ধরলেন। আমি যেন সাপ দেখলাম! ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম—এটা কী?

পিসি বললেন—ভুল করে সেদিন একটা নূপুর আমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলো।

অপরের সুখ

সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি—বোঝা যায় না। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়া বেশ জোরে বইছে। পাঠানকোট স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পাহাড়মুখো যাত্রীরা গায়ে অনেক জামা কাপড় চাপিয়ে লরী ছাড়বার প্রতীক্ষায়। যাত্রীর খোঁজে লরীর ড্রাইভাররাও এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার যত না চিন্তা, তার চেয়ে বেশী চিন্তা এই লরী ড্রাইভারদের যাত্রীদের ঠিকমত পৌঁছে দেবার।

স্টেশনের জনমানবহীন লম্বা প্ল্যাটফর্মে মাঝে মধ্যে এক আধটা কুলি নজরে পড়ে। ভারী গরম সুট আর ওভার কোট চাপিয়ে মিষ্টার সেঠী প্ল্যাটফর্মের একধারে পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় পায়চারি করছেন। ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়ায় যাত্রীদের হাড়ে কাঁপুনি ধরছে। মিষ্টার সেঠীর কিন্তু এই হাওয়া বেশ ভালো লাগে। সারা দেহ গরম জামা কাপড় দিয়ে মোড়া। হাওয়া ঢোকবার জো নেই। এমনি একটা শান্তিময় পরিবেশে তিনি আপন ভাবেই বিভোর।

লরীর ড্রাইভাররা শিকারের সন্ধানে ওয়েটিং রুমের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। জানলার জালের ভেতর দিয়ে মোটর গাড়ীর ড্রাইভাররা কে কে তাদের আসামী হতে পারে, তাই আন্দাজ করতে মশগুল। ড্রাইভারদের মধ্যে একজন এগিয়ে মিষ্টার সেঠীকে কায়দা-মাফিক সেলাম ঠুকে বললো, 'হুজুর, গাড়ী খুব কাম্‌ফর্টেব্‌ল্।'

সেঠী কোন জবাব দিলেন না। আপন মনে তিনি ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করছিলেন। উত্তর দিয়ে নিজের এমন স্বাচ্ছন্দ্যটা খোয়াতে নারাজ। তাছাড়া, গাড়ীতে জায়গা না পাবার কোন সমস্যা তাঁর নেই। গাড়ীতে জায়গা খোঁজার তাই কোন প্রয়োজনও নেই। গাড়ীই

তাঁর পেছনে ঘোরে। ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়ে থাকে কি ঘটা হুকুমের অপেক্ষায়, সেঠীর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

মেয়েদের ওয়েটিং রুমের দরজাটা খুলে গেলো। লম্বা কালো কোট আর সাদা শাড়ী প'রে এক তরুণীকে সেঠী বেরিয়ে আসতে দেখলেন। বছর দুয়েকের একটি ছেলের আঙ্গুল ধরে মেয়েটিকে খালি প্ল্যাটফর্মের অন্যদিকে পায়চারী করতে দেখলেন।

শান্ত এই পরিবেশে সেঠীর মনে হঠাৎ এক প্রশ্ন জাগলো। ছোট ছেলেটির আঙ্গুল ধরে যুবতীকে পূবদিকে যেতে দেখে সেঠীর মনে হলো যুবতী যেন সফল জীবনের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মনে হলো, নিজের জীবন যেন নিষ্প্রয়োজন। ঠিক যেন এক টুকরো বর্ষণরিক্ত মেঘের ভেসে যাওয়া। যুবতীর জীবন যেন একটি সজল মেঘ, বৃষ্টির-ধারায় নেমে এসে শস্য-শ্যামলা ক্ষেতে ছেয়ে আছে। মায়ের আঙ্গুল ধরে ঝুলে ছোট গোদা গোদা পায়ে ছেলেটি নড়বড় করতে করতে চলেছে, পাশে মা শান্ত, স্থির ও গাম্ভীর্য নিয়ে হেঁটে চলেছেন; যেন পণ্যে-ভরা বাণিজ্যের তরী—শান্ত, স্থির জলের ওপর দিয়ে আপন ঐশ্বর্যভারে বয়ে চলেছে।

ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে হেলান দিয়ে সেঠী যুবতী ও ছেলেটিকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন। স্টেশনের শেষপ্রান্তে গিয়ে যুবতী ফিরলেন। ফেরার সময়ে শিশুটিকে হাত পালটিয়ে বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে সেঠীর দিকে এগিয়ে যান। লতার গায়ে ফল যেমন আপন শোভা নিয়ে ঝুলে থাকে তেমনি শিশুটি তার মায়ের প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে ফিরছিলো। মা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, সেঠীর দৃষ্টিতে তাঁরা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলেন। যুবতীর ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর স্বাস্থ্য, বড় বড় চোখ। শিশুটির সারা গায়ে রক্তিম আভা, ফোলা গাল, ছোট নাক, গোল গোল চোখ। সেঠী চশমার ভেতর দিয়ে চোখ মেলে চাইলেন। নির্মল শীতল হাওয়ায় পরম শান্তি লাভের কথা আর মনে থাকে না।

গাড়ীর ড্রাইভার মেমসাহেবকে সেলাম ঠুকে কাছে এসে দাঁড়ায়।

.়ারে এক লরী-ড্রাইভার সেলাম ঠুকে ফিসফিস করে কি যেন ।।

সেঠী ব্যবসাদার। ওঁর মনে হলো মেমসাহেব সস্তায় ভালো গাড়ীর খোঁজে আছেন। লরী সাতটার আগে ছাড়বে না। কারের যাতায়াতের ব্যাপারে সে রকম কোন কড়াকড়ি নেই। লরীর যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় কেন না, লরীর রাস্তা তখনও বন্ধ। কারের যাত্রীরা অপেক্ষা করেন, তাঁদের যাবার তাড়া নেই বলে। সেঠীর হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। ল্যাম্প-পোস্ট ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেঠী ড্রাইভারের দিকে তাকালো। ড্রাইভার দৌড়ে সামনে হাজির হয়ে দ্বিতীয়বার সেলাম ঠোকে। সেঠী জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ীর কণ্ডিশান ভালো তো ?'

'হুজুর একেবারে নিউ,······অষ্টিন সেলুন।'

'আচ্ছা।'

'হুজুর, আর কোন যাত্রী তো নেওয়া যাবে না ?'

'না, সোজা যাবে······। তোমার যদি ফালতু দু'চার টাকা লাভ হয় তো আর এক আধ জন যাত্রী নিতে পারো।'

ড্রাইভার আবার লম্বা সেলাম ঠুকলো। ওয়েটিং রুম থেকে সেঠীর মালপত্তর বার করে আনে। তিনটে বড় সুটকেশ, একটা বড় হোল্ডল আর ছোটখাটো কয়েকটা এটাচিকেস। আরও একজন বাড়তি যাত্রী নিতে পারবে জেনে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে এক সেলাম ঠুকে অল্প পয়সায় রফা করে নিলো।

সেঠী সবই লক্ষ্য করলেন। মেমসাহেবের সামান্য জিনিষপত্তর ওয়েটিং রুম থেকে বার করা হলো। একটা মাত্তর সুটকেস ও একটা হোল্ডল। ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যুবতী সেঠীর পিছু পিছু কারের দিকে এগোলেন। পেছনের সীটে না বসে সেঠী ড্রাইভারের পাশে বসে পড়লেন। মেমসাহেব ও তাঁর ছেলে পেছনে।

ঠাণ্ডা হাওয়ার বুক চিরে গাড়ী এগিয়ে চললো। পেছনের সীটে কেউ বসে আছে ভেবে সেঠীর বেশ একটা আত্মতৃপ্তি। গাড়ীর

পুরো ভাড়া দেওয়া সত্বেও সামনের ছোট সীটে বসতে সেঠীর কোন বিরক্তিই ধরলো না। চলতি গাড়ী থেকে রাস্তার দু'পাশের গাছ আর বাড়ী দেখে ছেলেটি সামনের সীটটা ধরে লাফালাফি সুরু করে দেয়। ছেলেটির লাফালাফিতে কখনও সেঠীর টুপি মাথা থেকে সরে যায় কখনও বা ছেলেটির মাথা তাঁর হাতে ঠোক্কর খায়।

ছেলেটির দুষ্টুমিতে মা একটু সঙ্কোচ বোধ করেন। ছেলেটিকে চুপচাপ থাকতে বলে ধমক দেন। সেঠী আর সেই সঙ্গে ছেলেটি—দুজনেই হেসে ফেলে। ছেলেটি সামনের সীটে যাবার জন্যে লাফ দিতে যায়। পেছন ফিরে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে সেঠী নিজের কোলে বসিয়ে নেন। ছেলেটির নরম গোলগাল দেহের স্পর্শে সেঠীর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। তাঁর মন নতুন এক চেতনায় ভরে যায়। কষ্ট করে ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর এত দিনের এই জীবন সেঠীর হঠাৎ যেন অনাবশ্যক ও নিষ্ফল মনে হয়। ছেলেটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সেঠী কি যেন একটা অভাব বোধ করেন।

মোটরের সামনে চলমান দৃশ্যের পটভূমিকায় সেঠী নিজের জীবন চলচ্চিত্রের মত দেখতে পান। পিতার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়ে তাঁকে এফ.এ. পড়া ছেড়ে দিতে হয়। জীবিকা অর্জনের কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো। শেষে এক ঠিকাদারের কাছে মাসে কুড়ি টাকা মাইনেতে চব্বিশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির এক কাজ জোটে। সব কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি নিজে একদিন ঠিকায় ঠিকাদারের কাজ করেছেন। একটার পর একটা কাজ ঠিকায় নিয়েছেন, দিনরাত খেটেছেন। একদিন তাঁকে টাকার জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয়েছে, আর আজ সেই টাকা লাখে লাখে তিনি নাড়াচাড়া করেন। রেলের ঠিকাতে একবার একসঙ্গে আড়াই লাখ টাকা লাভ…।

সেঠী জীবনে একটা জিনিষই চিনেছেন—তা শুধু টাকা। রোজগারের ধান্ধায় তিনি রাতদিন কিছুই গ্রাহ্য করেননি। আজ

তিনি লাখপতি। নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে তিনি বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন। পকেটে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চার আঙ্গুল চওড়া বড় চেক বই। ইচ্ছে করলে চেক কেটেই তিনি আজ সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু অর্থ ছাড়া জীবনে আর কিইবা পেয়েছেন? টাকা দিয়ে কি না পাওয়া যায়? ওঁর আত্মীয়-স্বজন—যাদের উনি চেনেন না, যাদের চেনা প্রয়োজনও মনে করেন না—তারা আজ ওঁর নাম করে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওঁর জন্যে সবার দরদ উথলে ওঠে। সম্মানও তিনি কম পাননি। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁকে পৃষ্ঠপোষক বা সভাপতি করার জন্যে উন্মুখ। কিন্তু এতে ওঁর কতটুকুই বা লাভ হয়েছে?

তাঁকে কেন্দ্র করে প্রেম ও প্রণয়ের কত অভিনয়ই না হয়েছে। এদের সলজ্জ ও মুগ্ধ নয়নে ওঁর অর্থের প্রতি লোভ কেবলই ফুটে উঠতে দেখেছেন। এগুলো কেবল ওঁকে ফাঁসাবার চেষ্টা—দেখেশুনে উনি সাবধান হয়ে গেছেন। তাই কেউই ওঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। গুড়ের নাগরীর চারিদিকে মাছি আর বোলতা ভন্ ভন্ করলে যেমন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেঠী তেমনি এদেরও তাড়িয়েছেন। কারণ, তখনও ওঁর ছিল কেবল টাকা রোজগারের নেশা।

আজ তাঁর টাকার অভাব নেই, তবুও তিনি সমানে রোজগার করে চলেছেন। টাকা বাড়িয়ে যাওয়াটাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃষ্টির সময় যেমন ছোট ছোট খাল বিলের জল নদীতে এসে জড়ো হয়, তেমনি তাঁর হাতে টাকাও আসে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শত শত ব্যবসায় হাজার হাজার লোক খেটে টাকা আমদানী করছে আর সেই টাকা ব্যবসার খাত বেয়ে সেঠীর হিসেবের খাতায় জমা হচ্ছে। তাঁর কাজই হচ্ছে টাকা বইয়ে আনার নিত্যনতুন পথ আবিষ্কার করা।

নিজের খরচার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। নিজের সখ-আহ্লাদ বলেও কিছু নেই। তিনি নিঃসঙ্গ, খরচ করবেনই বা কিসে? নিজের খরচ কোন মাসেই হাজার বারোশোর বেশী হয় না।

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কোন দিনই তাঁর খেয়াল নেই। হঠাৎ আজ ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর মনে এক নতুন অনুভূতি জাগলো—কিসের যেন একটা অভাব তিনি অনুভব করেন।

ছেলেটি জুতো শুদ্ধ পা তাঁর দামী কোটের ওপর চাপিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা মোটরের কাঁচের ওপর হাত রেখে কাঁচের সঙ্গে মুখটা ঠেকিয়ে আনন্দে খিল খিল করে হাসছিলো। ছেলেটি সেঠীর কোলে দাপাদাপি করছিলো। সেঠীর কাছে এ এক বিচিত্র সুখানুভূতি। আবেগে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে, মুখের একটা দিক কুঞ্চিত হয়ে যায়। ছেলেটির শিশু-সুলভ চঞ্চলতা তিনি অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন। পেছনে অতি কাছে কারুর উপস্থিতি যেন তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন। এক ব্যগ্র বাৎসল্যময় অনুভূতি বৃক্ষের ছায়ার মত যেন তাঁকে পরিবৃত করে ফেলছে, গাছকে জন্ম দেয় যে ফুল এ যেন তারই আকর্ষণ। এ সেই নারী যে সন্তানের মাথায় কল্যাণ ও স্থৈর্যের হাত রেখে পুরুষকে কামনার রাজ্যে নিয়ে যায়। হাসিতে যার সাতরঙা রামধনুর উচ্ছলতা, ভেতরে যার প্রণয়ের কটাক্ষ, রক্ষার আশ্বাস, আশীর্ব্বাদের শ্যামলিমা, আর বাসনার উগ্রতা—সব একেতেই মিলেমিশে আছে। একজন চুম্বকের মত নিয়ে যাচ্ছে নৈসর্গিক চেতনায়, অন্যজন ঠেলে দিচ্ছে বাস্তবের চাহিদায়। এইরকম একটা অনুভূতির ঘূর্ণিপাকে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বিদ্যুত তরঙ্গের মত একটা শিহরণ শরীরে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

গাড়ী ক্রমশ পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে। ঠাণ্ডাও সমানে তীব্র হয়ে উঠছে। চারিদিকে মেঘ ঘনিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির একটা আমেজ। গাড়ীর কাঁচে বিন্দু বিন্দু জমা জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। ওয়াইপার নিঃশব্দে কাঁচ থেকে জল সরিয়ে দিচ্ছে। ভেতর থেকে ছেলেটি ওয়াইপারটাকে বারবার ধরার চেষ্টা করে। সেঠী শিশুর নিটোল হাত দুটো ধরে আছেন। হাতটা ছেড়ে দিতে তাঁর মন চাইছে না। ছেলেটি ঘুরে একবার

সেঠীর দিকে তাকায়। সেঠীর নেকটাই-এর ষ্টোন সেটিং পিন তার নজরে পড়ে। এবার ছেলেটি এগুলি ধরবার চেষ্টা করে। সেঠী পিনটা খুলে শিশুর কোটে লাগিয়ে দিলেন ও তাঁর ফিকে সরবতি রঙের সান গ্লাসটা তাকে পরিয়ে দেন। শিশুর মুখের প্রায় অর্দ্ধেকটা ঢেকে গেলো। সেঠী চশমার কাঁচের প্রতিফলনে দেখতে পেলেন পেছনের সীটে শিশুটির মা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে শিশুকে চুপচাপ থাকার ইসারা করছেন। পেছন ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে সেঠী মার দিকে তাকালেন। শিশুর হয়ে বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।' ওঁর মুখে ম্লান হাসি দেখে মার হৃদয় বিগলিত হয়।

ড্রাইভার গাড়ীর গতি কমিয়ে দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'হুজুর, ওপরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সামনে কুয়াসাও ভীষণ।' জবাবে সেঠী বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' পাহাড়ের ওপর থেকে বৃষ্টির ধারা ঝরণার মতন নেমে এসে রাস্তার দুধার দিয়ে বয়ে চলেছে। গাড়ীর চাকা জল কাটতে কাটতে চারিদিকে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে ঘুরে ঘুরে পাকদণ্ডী রাস্তা দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার এই মোটরগাড়ী, পাহাড়ের খাড়া চড়াই, ঘন কুয়াসা আর বৃষ্টির জলের ঝাপটা অনায়াসে অতিক্রম করে পাহাড়ের বুকে ছুটে চলেছে।

এক নাগাড়ে দু-ঘণ্টা চলে গাড়ী মাঝপথে এক ডাকবাংলোয় এসে থামলো। ডাকবাংলোর গাড়ী বারান্দার তলায় গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ডাকবাংলোর বাইরে অনেক যাত্রী টিন আর খড়ের চালার তলায় আধো-ভেজা অবস্থায় বসে পাহাড়ী মালবাহী ষাঁড় ও খচ্চর এখানে ওখানে জলে ভিজে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সেই সঙ্গে নিরুৎসাহ লক্ষ্য করছে। যাত্রীরা সরকারের হুকুম আর শেষবেশ বৃষ্টির অবস্থা কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ভারবাহী পশুরা যাত্রীদের আজ্ঞার অপেক্ষায়। সারারাত অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ের বেশ

কয়েক জায়গায় ধস নামায় এগোবার রাস্তা বন্ধ। যাত্রীদের যাতায়াত মানা।

ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দিলো, সেঠী নামলেন। তাঁর আঙুল ধরে শিশুটিও। তারপর মেমসাহেব। ডাকবাংলোর চাপরাশী ও খানসামা গাড়ী দেখে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। কায়দা-মাফিক উর্দ্দিপরা খানসামা জলখাবারের কথা জিজ্ঞেস করলো। সেঠী 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানান।

ছেলের জন্যে মেমসাহেব ঝুড়িতে দুধের বোতল নিয়ে এসেছিলেন। নিজের জন্যে তাঁর বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিলো না। ষাট টাকা মাইনের মাষ্টারণীর ডাকবাংলোয় জলখাবার খাওয়া পোষায় না। বারান্দার আরাম কেদারায় বসে মেমসাহেব সেঠীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শিশুটিকে দুধ খাবার জন্যে 'বল্লু' বলে ডাক দেন।

সেঠীও মেমসাহেবের দিকে না তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বল্লু গরম দুধ খাবে।'

টেবিলের ওপর জলখাবার সাজিয়ে খানসামা মেমসাহেবকে খবর দিলো। খানসামার ধারণা ওঁরা তিনজনই এক পরিবারের।

খানসামার এই রকম ধারণা মেমসাহেবের অদ্ভুত লাগে। অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ভদ্রতার খাতিরে সেঠীর দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে ইংরিজিতে বললেন, 'আমার কিছু লাগবে না।'

'এত ঠাণ্ডায় এক পেয়ালা গরম চা ভালই লাগবে', সেঠী সাগ্রহে জবাব দিলেন।

জলখাবারের জন্যে সকলে ভেতরে গেলেন। ঐ ঘরে খানসামাই শুধু আনাগোনা করছিলো। অপরের দৃষ্টিতে এঁরা স্বামী, স্ত্রী ও শিশু সন্তান মিলেই একটি ছোট্ট পরিবার। খানসামারও তাই ধারণা, তার সামনে অযথা সঙ্কোচ দেখানোটা মেমসাহেবেরও সমীচীন মনে হোল না। নিঃসঙ্কোচে তাই পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন। সেঠী এক টুকরো অমলেট বল্লুর মুখে পুরে দিলেন। শিশুটি মহানন্দে অমলেটটা খেতে লাগলো।

খানসামা চেয়ারের পেছনে অপেক্ষা করছিলো। মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বিস্কুট, জ্যাম, বা ফল আনবো ?'

সেঠী উত্তর দিলেন—'আনো।'

যে সব টিনের খাবার সহজে বিক্রী হয় না, খানসামা সেগুলির মুখ খুলে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে টেবিলে হাজির করলো। সেঠী সারাক্ষণই হাসছিলেন। শিশুটিকে একটু একটু করে সব জিনিষই খেতে দিচ্ছিলেন। শিশুটির মহাস্ফুর্তি দেখে মা ভাবে গদগদ হয়ে বলে ওঠেন, 'অনেক হয়েছে। আর দেবেন না, ও আর খেতে পারবে না।' এই ভাবে তিনি সেঠীকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

শিশুটিকে কেন্দ্র করে সেঠী সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ড্যালহৌসীতেই থাকেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মিসেস্ মদন। মিষ্টার মদন মিলিটারী একাউণ্টস্ অফিসে কাজ করেন। আমি স্কুলে পড়াই। অমৃতসরে বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

সেঠী নিজের কী বা পরিচয় দেবেন ? তাই শুধু বললেন, 'খুব ভালো কথা।' নিজের সম্বন্ধে বলার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। নিজের জীবনটা নিতান্তই ভোলো, রসকসহীন ঠেকছিলো তাঁর কাছে।

'আপনি কি ড্যালহৌসীতে গরমে বেড়াতে যাচ্ছেন ?' মিসেস মদনের প্রশ্ন।

'না, ব্যবসার কাজে কিছুদিন থাকবো। ড্যালহৌসী জায়গাটা বেশ। বেশ কেন, খুবই ভালো। চমৎকার দৃশ্য।'

'আপনি ছেলেপুলেদের সঙ্গে আনেন নি ?' যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে মিসেস্ মদন শুধালেন।

'না…আমার…মানে নেই…। আমি বিয়েই করিনি। আমার নাম আর. এল. সেঠী। পেশা ঠিকাদারী। অমৃতসরের নতুন গির্জাটা আমারই করা।' চায়ে চামচ নাড়াতে নাড়াতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে তিনি বললেন, 'আমি একলাই থাকি।'

সেঠীর কথা শুনে মিসেস্ মদনের মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবতে থাকেন, কত বড়লোক, অথচ কত সরল।

বল্লু সেঠীর চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দেওয়া সোনার ঘড়িটাকে টেবিলের ওপর ঘসছিলো। মিসেস্ মদন বল্লুকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন 'উঁহু, ও রকম করে না।' তারপর সেঠীর দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বলেন, 'ভীষণ দুষ্টু, দেখছেন······।'

সেঠী তাঁর চুলে বিলি কাটছিলেন—চিন্তার জট ছাড়ানো আর কি। অনেক কিছু পেয়েও খোঁড়া মানুষের মত জীবনটা যেন অর্থহীন মনে হয় সেঠীর। সামনে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে মিসেস্ মদন শিশুটিকে দেখছিলেন। তাঁর স্বচ্ছ মসৃণ মুখ যেন জ্বলজ্বল করছে। ডাগর চোখ, শাড়ী মাথা থেকে সরে যাওয়ায় দেখা যায় মাথাভর্ত্তি সুন্দর চুল, গোলাপী ঠোঁট, কোটের কলারের ফাঁকে তাঁর গলার খানিকটাও দেখা যাচ্ছে। সেঠীর কাছে এসব একটা পরিপূর্ণ জীবনের ছবি, যেটা তাঁর গণ্ডীর বাইরে।

মিসেস্ মদনের দৃষ্টি সেঠীর চোখের ওপর। অনুভব করেন যেন সেঠীর দৃষ্টি তাঁর শরীরকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। একটা শিহরণ অনুভব করলেন। এ অনুভূতি পীড়াদায়ক নয়। মিসেস্ মদনের আচরণে একটা অধিকারের আভাষ ফুটে ওঠে। টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে তিনি সেঠীর দিকে নিঃসঙ্কোচে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কি করে পৌঁছবো ?'

পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেসটা বার করে সেঠী সিগারেট ধরালেন। দ্বিধাহীন ভাবে ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'বৃষ্টি নাও থামতে পারে। যদি আমরা আজ নাই পৌঁছোতে পারি, তাতেই বা কি এসে যায় ?'

একটু যেন চিন্তান্বিত হলেন মিসেস্ মদন। আঙ্গুলগুলি এমন ভাবে নাড়াচাড়া সুরু করলেন যেন ঐগুলি সঙ্কোচের কারণ। মুচকি হেসে বললেন, 'আমায় কাল তো স্কুলে যেতেই হবে। আপনিও কাজে এসেছেন, আপনারও তো কম ক্ষতি হবে না।'

'হ্যাঁ, যে কাজের জন্যে এসেছি সেটা হয়তো হবে না।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা খানসামার দিকে তাকিয়ে তিনি ডাক দিলেন, 'এধারে শোনো।' খানসামা প্লেটের ওপর বিল নিয়ে হাজির হোলো। বিলটা যেন দেখতে পান নি এমনি একটা ভাব নিয়ে মিসেস্ মদন বললেন—'ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করো ক'টা নাগাদ যেতে হবে।'

বিলটা তুলে নিয়ে সেঠী বললেন, 'জানেন; আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন সব সময়েই ভাবতাম কবে স্কুল ছুটী হবে, কারণ যাই হোক না কেন। কোনো একটা ওজরে স্কুল যেতে না হলেই খুসী। কিন্তু আপনার দেখছি উল্টো, স্কুল খুবই ভাল লাগে।'

মিসেস মদন বলেন, 'আপনি বোধ হয় দুষ্টু ছিলেন……ভাবছেন, বৃষ্টি পড়লে আর কাজ করতে হবে না। তাই মনে মনে চাইছেন, বৃষ্টি না থামুক আর মনের আনন্দে বেশ সিগারেট টানছেন,' কথাগুলো বলে মিসেস্ মদন একটু হাসলেন।

'হ্যাঁ, তাতো বটেই।'

'ব্যবসায় আপনার মন লাগে না?'

'একথা কখনও ভাবিই নি! হ্যাঁ, তবে মনে হয় জীবনের গাড়ীটাকে একরাস কাদার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছি।'

ড্রাইভার এসে খবর দিলো রাস্তা এখনও খোলেনি। সেঠী পুলিস ষ্টেশনে ফোন করে খবর নিলেন। ছ' ঘণ্টার আগে রাস্তা খোলার কোন সম্ভাবনাই নেই।

খবর শুনে মিসেস্ মদনকে বিচলিত হতে দেখে সেঠী বললেন, 'আপনার স্কুলের লোকে বুঝবে রাস্তা মেরামত করা আপনার হাতে নেই।'

মিসেস্ মদনের হোল্ডলটা একটা ঘরে খোলা হলো। তিনি সে ঘরে চলে গেলেন। শিশুটির কখনও বা ও ঘরে আবার কখনও সেঠীর কাছে যাওয়া আসা লেগে থাকে। মিসেস্ মদন উঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর মনে হলো পাছে তিনি বেশী খেয়ে ফেলেন এই ভয়ে কে যেন তাঁর সামনে থেকে খাবারের থালাটা ছিনিয়ে নিয়ে

চলে গেলো। কিন্তু খিদে যে এখনও মেটেনি। সেঠী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখছিলেন, কখনও বা বারান্দায় পায়চারি করছেন, আবার এসে বসছেন। তাঁর হিসেবী মনে সেদিন যেন কল্পনার রঙিন স্বপ্ন, তাঁর নিজের জীবনেরই ছবি বার বার নিজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর টাকা নয়। এবার যেন অন্য কিছুর আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেক বেশী। সামনে দুর্গম পাহাড়ে যেন উঠছেন আর চলমান নারী মূর্তিটিকে ধরবার জন্যে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। বার বার গা স্পর্শ করতে চাইছেন, কিন্তু নারী মূর্তিটি প্রতিবারেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। হাল্কা মেঘে ঢাকা এই নারী মূর্তিটি মিসেস মদন ছাড়া আর কেউ নয়।

পায়চারি করতে করতে তিনি আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। তখন ভিজে ঘাসে আর গাছের মগডালে নতুন সূর্যের বৃষ্টি ধোওয়া আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সূর্যের আলোয় সেঠীর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। নিজের অক্ষমতা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। উঠে মিসেস্ মদনের ঘরেও যেতে পারছেন না। কে জানে তিনি এখন ঘুমচ্ছেন না জেগে আছেন। ভাবেন মিসেস্ মদনের যদি একটু সান্নিধ্য পাওয়া যেত।

মেয়েলি পায়ের জুতোর আওয়াজে সেঠী ফিরে তাকালেন। কোটের পকেটে হাত দুটো পুরে মিসেস্ মদন এসে বললেন—'রদ্দুর তো উঠে গেছে, ছ' ঘণ্টাও প্রায় কেটে গেলো। এবার তো আমরা যেতে পারি ?···ক'টা বাজলো ?'

ঘড়িটা বল্লুর কাছেই ছিলো। ঘড়ির কাঁটা ও কাঁচ দুই-ই ভেঙ্গে গেছে। সময় জানতে হলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া উপায় নেই।

ছ' ঘণ্টা কেটে গেলে কি হবে রাস্তা এখনও ঠিক হয়নি। ঐ পথে মটর চালাবার অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়।

খানসামা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো, লাঞ্চের কোন ব্যবস্থা করবে কিনা জিজ্ঞেস করলো।

'মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করো।' সেঠী অন্যদিকে তাকিয়ে শিশুটির আঙ্গুল ধরে রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

খানসামা কি মনে করছে এই কথা ভেবে মিসেস মদনের বেশ সঙ্কোচ হচ্ছিলো। কিন্তু সঙ্কোচ প্রকাশ করলে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে ভেবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, 'যা হয় কিছু করো···আর দেখো যেন দেরী না হয়।'

সেঠী মিসেস্ মদনের কাছে বসতে চাইছিলেন, মিসেস্ মদনের কোনো আপত্তি না থাকলে, অবশ্য। লাঞ্চ .খাবার সময় আবার তাঁরা একসঙ্গে বসলেন। নতুন কথা আর কিইবা হবে? কিছু বলতেই হয় ভেবে সেঠী বললেন, পাহাড়ের রাস্তায় প্রায়ই ধ্বস নামে, গতবার সকালে এসে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কাজ সেরে তিনি ফিরেও গেছিলেন······।

'আপনি ড্যালহৌসীতে কোথায় থাকেন?' মিসেস্ মদন নিজের ঠিকানার চিরকুটটি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কতোদিন থাকবেন?' সেঠী শুধু কাজ নিয়েই এসেছিলেন। একদিন, দু'দিন, বা তিনদিনও থাকতে পারবেন। ড্যালহৌসীতে পল্টনদের জন্যে চুড়েলডাণ্ডা পাহাড়ের ওপর নতুন বাড়ী তৈরী হবে, তারি ঠিকের জন্যে তিনি ড্যালহৌসী যাচ্ছিলেন। এর আগে যখন ড্যালহৌসী গিয়েছিলেন তখন 'হিলক্রেষ্ট' হোটেলে নেমেছিলেন।' এবারেও সেখানেই আস্তানা।

কথার পিঠে মিসেস্ মদন নিজের জীবনের করুণ কাহিনী শোনালেন। তাঁর স্বামী মাসে একশো টাকা মাইনে পান। উনি নিজে শিক্ষয়িত্রী, মাইনে পান ষাট টাকা মাত্তর। সখের চাকরী নয়, নেহাৎ দায়ে পড়ে। নিজেদের বাড়ী আছে। স্বামীর শক্ত অসুখ হওয়ায় চার হাজার পাঁচশো টাকায় সেটি বাঁধা রাখতে হয়েছে। মরসুমে সেই বাড়ী থেকে দুশো-আড়াইশো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। কিস্তিতে আরও পঞ্চাশ ষাট টাকা মহাজনকে দিতে হয়।

সেঠী ভাবতে থাকেন সাড়ে চার হাজার টাকা। এ আর এমন কি কথা। কিন্তু তাঁর করারই বা কি আছে। খেতে খেতে ছ' জনেই বল্লুর খেলা-ধুলো সাগ্রহে দেখছিলেন। সেঠী বল্লুকে খাইয়ে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু মিসেস মদন বলছিলেন, 'বেশী খেতে নেই।' সেঠীর ঘড়িটা বল্লু ভেঙ্গে দেওয়াতে মিসেস্ মদন দুঃখ প্রকাশ করলেন। সেঠী কিন্তু সে কথা কানে তুললেন না। খাওয়া শেষ হলো। মিসেস্ মদন উঠে ভেতরে যাবার উপক্রম করছিলেন। এমন সময় সেঠী সাহস করে বললেন, 'কি আবার শুতে চললেন নাকি?'

'নাতো? কিন্তু করবোই বা কি? বিকেলের মধ্যে কি আমাদের পৌঁছবার কোন উপায় নেই?'

'কোন আশা নেই। আপনি এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেন? আপনি কাল যদি স্কুলে না যান তাহলে একদিনের ছ' টাকা মাইনেই তো কাটবে, তার বেশী তো কিছু না। আর আমার কাজ না হলে কত ক্ষতি হবে জানেন? ষাট পঁয়ষট্টি হাজার', বলেই সেঠী হেসে ফেললেন। 'আপনি বাড়ীটা ছাড়িয়ে নেন না কেন? তাহলে তো আপনার চাকরী করবার দরকার হয় না।'

'কিন্তু ছাড়াবো কি করে? আমি মাত্তর এক হাজার টাকা অতি কষ্টে দিতে পেরেছি।'

'তাতে কি? আপনি ছাড়িয়ে নিন, টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার সুদের দরকার নেই। আর, টাকার জন্যেও এমন কোন চিন্তা নেই।'

মিসেস্ মদনের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, মুখ আরও রক্তাভ হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিতে বল্লুকে কোলের ভেতর টেনে নেন। বল্লুর হাত থেকে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'এটা আপনি রাখুন, তা না হলে ও হারিয়ে ফেলবে।'

বল্লুর কাঁদ কাঁদ মুখ দেখে মিসেস্ মদন আঙ্গুল নেড়ে বললেন, 'চুপ, চুপ, মামাবাবু মারবেন।' ছোট্ট এই 'মামা' শব্দ দিয়ে মিসেস্ মদন সেঠীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্ণয় করলেন। নিজের বাপের

বাড়ীর কথা সব বলতে লাগলেন। কথায় কথায় তাঁর নামটাও জানিয়ে দিলেন—'উর্মিলা।'

বসে বসে সন্ধ্যে গড়িয়ে এলো, তারপর রাত্রি গভীর হয়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কাছে চীড় গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ওঁদের গায়ে এসে পড়েছে। বল্লু ঘরে ঘুমিয়ে। উর্মিলা ভাবে এই নির্জন জ্যোৎস্না রাতে দুটি প্রাণী। ভয় ও ব্যাকুলতার দোটানায় মিসেস্ মদন, তাঁর দেহে ও মনে একটা অজানা আশঙ্কা।

বাইরে কনেকনে শীতের হাওয়া। ভেতরে আরও ঘর ছিলো। খানসামা বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনকার আসবাবপত্র একু মনে করে বিছানাও এক ঘরে করেছিলো। এক ঘরে বিছানা পাততে বারণ করাও হয়নি। এক ঘরে শোবার কথা ভেবেই মিসেস্ মদনের প্রাণ শুকিয়ে যায়। ভাবেন, দূর, এটাও কি সম্ভব?

বেশ খানিকটা রাত কেটে গেলো। সেঠী বললেন, 'আপনার শীতে কষ্ট হবে, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না।'

মিসেস্ মদন ভালোভাবেই জানতেন তাঁর জন্যে সেঠী সারারাত বাইরে কাটিয়ে দেবেন। '……উঃ' কি ভদ্রলোক।'

নিজের এক আত্মীয়ের খুব লেখাপড়া জানা একটি মেয়ের সম্বন্ধে সেঠীকে অনেক কথা বললেন। বিয়ের কথা ভেবে মিসেস্ মদন বলেন, 'মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করে ফেলুন না কেন।'

সেঠী উত্তর দিলেন, 'জীবনের আটচল্লিশটা বছর যখন এই ভাবে কেটে গেলো তখন বাকী কটা বছরও নিশ্চয়ই কেটে যাবে। আর বিয়ে তো একটা বাজীখেলা—জিততেও পারি, আবার হেরেও যেতে পারি।'

সেঠী আর একবার উর্মিলাকে ভেতরে গিয়ে শুতে বললেন। উত্তরে উর্মিলা বলে, 'বাইরে চাঁদের আলো, বেশ ভালো লাগছে, তাছাড়া ঠাণ্ডাও তো বিশেষ নেই।' কেউই ভেতরে গেলেন না,

ওখানেই বসে রইলেন। কখনও সেঠী কিছু বলছেন আর উর্মিলা শুনছেন, আবার কখনও উর্মিলা বলে যান আর সেঠী শোনেন।

নবমীর চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়লো। সময় জানবার কোনো উপায় নেই। অর্ধেক রাত কেটে গেছে। শীতে দু'জনেই কাঁপছিলেন। উর্মিলা মেনে নিতে পারছিলেন না যে তাঁর জন্যে সেঠী শীতে এরকম ভাবে কষ্ট ভোগ করবেন। তাঁর অসুখও তো করতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক। বাড়ীতে কি সকলে একঘরে শুই না?' দু'জনে ঘরে যেতে যেতে সেঠী উর্মিলার পিঠের ওপর হাত রাখলেন। বিছানায় ঢুকে যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বন্ধ রাস্তা সকালেই খুলে গিয়েছিলো। স্থির হোলো, চা-টা খেয়েই যাত্রা করা হবে। 'রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছে নিশ্চয়ই,' সেঠী হেসে জিজ্ঞেস করেন।

উর্মিলাও ঈষৎ হেসে বললেন, 'আপনিও নিশ্চয় ভাল ভাবে ঘুমিয়েছেন?'

দু'জনেই বুঝলেন যে কারুরই ঘুম হয়নি। কিন্তু অনিদ্রায় রাত কাটালেও কাউকেই ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো না।

সেঠী মন্তব্য করেন, 'এই বাংলোটা ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

উর্মিলা করুণ দৃষ্টিতে সেঠীর দিকে চেয়ে চোখ নীচু করে নেন, মুখে কথা জোগায় না। নিজের স্বামীকে দেখেছেন, কিন্তু এরকম উদারতা, সংযম ও অনুরাগ কখনও দেখেন নি। সমস্ত অন্তর দিয়ে উর্মিলা যেন একটা কথাই বলতে চাইছেন, 'তুমি মহৎ, তুমি মহান।' কিন্তু নীরব, মুখ ফুটে বলতে তাঁর লজ্জা। পুরুষের কাছে স্ত্রী জাতিব সর্বদাই পরাজয়। আশ্রয় দিলেও যা, লাঞ্ছনা সইতে হলেও তাই।

যাবার আগে সেঠী একটা অনুরোধ জানালেন, 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে এই বাংলোতে আপনার একটা ছবি তুলতে চাই।'

আপত্তি? উর্মিলার আবার আপত্তি কি থাকতে পারে? সকৃতজ্ঞ নয়নে সেঠীর দিকে শুধু একবার তাকালেন। উর্মিলা ঘাড় বেঁকিয়ে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। সেঠী কয়েকটা ছবি তুলে নেন।

দু-মাসে কত পরিবর্ত্তনই না হয়েছে। মদন মিলিটারী একাউণ্টস অফিসের একশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে সেঠী এণ্ড কোম্পাণীর একাউণ্টেণ্ট, মাসে তিনশো টাকা মাইনে। উর্মিলা আর ষাট টাকা মাইনের মাস্টারণী নন। এখন তিনি নিজের ছোট্ট বাড়ীর সামনে বড় রোদের ছাতা লাগিয়ে মিঠে রোদে বসে বল্লুর জন্যে সোয়েটার বোনেন। গাণ্ডে জেলার কৃষ্ণবর্ণা আয়া বল্লুকে রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে যায়।

সেঠীকে বারেবারেই ড্যালহৌসী যেতে হয়। মিলিটারী ব্যারাক তৈরী করার ঠিকা তিনি নিয়েছেন। সেঠী তার সম্পর্কের বোনকে কেন যে বিয়ে করতে রাজী নন, তা উর্মিলা বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর সম্বন্ধে সেঠীর মনোভাব বুঝতে পেরেও তা উর্মিলা আমল দিতে রাজী নন। গতবারে সেঠী স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, 'পেট ভরে কুমড়ো খাওয়ার চেয়ে কমলালেবুর সুগন্ধ উপভোগ করাও অনেক শ্রেয়।' সোয়েটার বুনতে বুনতে উর্মিলা বুঝতে পারেন কমলালেবু কথাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেঠীর সব আচরণগুলিও তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উর্মিলার নিজের মাথায় বিলি কাটা দেখতে সেঠীর খুব ভালো লাগে। কোনো কথা বলার না থাকলেও ওকে সামনে বসিয়ে রাখতে সেঠী ভালোবাসে। সেঠীর এনে দেওয়া কাপড়জামাগুলি সেঠীর সামনেই পরতে হতো। সেঠীর কথা অমান্য করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেঠীর চাহিদায় তাকে হাতকাটা পিঠকাটা ব্লাউজও পরতে হতো। সেঠীর পছন্দসই জামাকাপড় পরতে উর্মিলার নিজেরও ভালো লাগতো। কিন্তু ভাবতো তার নিজস্ব অস্তিত্ব বলে আর কি রইলো?

গত বুধবারে সেঠী অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের বাড়ীতেই ছিলেন, কি বলেছিলেন সেঠী ? …তিনি উর্মিলাকে স্পর্শ করেন নি, দূরেই বসেছিলেন। তবু কিই-বা বাকী ছিলো ? বলেছিলেন, 'আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার পেছনে কোন স্বার্থ নেই। তুমি আমার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। তোমায় দেখতে চাই… নিজের করে ভাবতে চাই।'

উর্মিলা সেটা মেনে নিতে পারেননি। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। 'আমায় ক্ষমা করো' এই কথা বলে সেঠী চুপচাপ উঠে পড়েছিলেন।

আজ বুনতে বুনতে সেই রাতের দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবতে থাকেন সেদিন রাত্তিরের ব্যবহারটা কি ঠিক হয়েছিলো ?

যে লোক কোন কিছু প্রত্যাশা না করে নিজের সারা জীবনের রোজগার তাঁকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই চায় না—মুখে যাই বলুক না কেন…তাকে কি নিরাশ করা …।

সেঠী শুধু বলেছিলেন যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী তিনি বল্লুকেই করবেন—কিন্তু এক সর্তে। বল্লুর আর কোনো ভাগীদার থাকবে না।…অর্থাৎ উর্মিলার গর্ভে আর কোনা সন্তান হবে না —তা' উর্মিলাকে তিনি স্পর্শ করুন বা না করুন। বল্লু তাঁর, মদনও তাঁর আর উর্মিলাতো তাঁরই।

সেঠী কত সংযমী, কত উদার, কত মহৎ। সব কিছুই তিনি কি করে দিয়ে দিলেন …? উর্মিলাতো সেঠীকে কিছুই দিতে পারলেন না। অবশ্য দেবার সুযোগও তিনি পাননি। সেঠী কল্পনাতেই যেন সব কিছু অধিকার করে নিয়েছেন, কিন্তু কত সহজে ? যেন সব কিছুই এক যাদুর স্পর্শে, সে যাদু তিনি জানেন। এই পরশ থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ উর্মিলার নেই। বল্লুর নেই, মদনেরও নেই—যেন ওরা সবাই নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। সেঠী যদি কাল আবার আসেন আর উদাসভাবে আবার সেই কথাটিই বলেন ? এককোণে বসে যদি বলেন, 'তোমাকে চাই…'

তবে কি এখনও উর্মিলা না বলতে পারবেন? একবারতো 'না' বলে তিনি মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছেন। উর্মিলার এতে এতো ভাববার কি আছে? তবুও আর একবার 'না' বলতে চাইলো তাঁর মন। পরক্ষণেই আবার মনে হয় 'না' করবার তাঁর কি কোনো অধিকার আছে? এ অধিকার সকলের থাকলেও তাঁর আর নেই। নিজের বিবেকের কাছে সে অধিকার তিনি হারিয়েছেন।···বারবণিতার জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের আর এমন কি তফাৎ···উর্মিলার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

মনে পড়ে দু'মাস আগের কথা। ছোট ছোট দুটো ঘরের মধ্যেই তাঁর সংসার। উর্মিলা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে ছেলেকে কোলে নিতেন। তারপর হাঁদা চাকরের পেছনে বকে মরতেন। অনেক চাহিদাই তো তিনি মেটাতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার একটা অধিকার তো ছিলো। তিনি নিজের খুসীমত যা খুসী তাই করতে পারতেন···সিগারেট কোম্পাণীর সেই হাসি-খুসী বাবুটি কত ভালো ও সজ্জন ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও উর্মিলা সব সময় না-ই করেছেন।

আবার ভাবেন···সেঠী আজ হয়তো আসতে পারেন। ছলছল চোখে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সে দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা নেই, আছে শুধু বেদনার ছাপ।

বাইরে হট্টগোল। ডোড়ী হেঁকে ওঠে 'কে ওখানে?' কোনো সাড়া পায় না। শুধু শুনতে পায়; 'ঘাতিনী, তোকে কোতল করবো।'

স্ত্রী কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়, 'করে একবার দেখ। মরে ডাইনি হয়ে তোর গুষ্টিকে শেষ করবো, নিপুতে।'

ডোড়ী আর বসে থাকতে পারে না। বাইরে আসে। এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'কি করছিস নিহাল, হাজার হোক্ তোর মা তো।'

'নিকুচি করেছে মায়ের', বলে নিহাল সরে গেলো।

'একবার গায়ে হাত তুলে দেখ না,' মা ফোঁস করে ওঠে। 'তুই ভেবেছিস কী? তুই আমার করবিটা কী? আমি তোকে ভাতে মারবো, তুই আমার ছাই করবি। আমি তোর আশ্রিত নই।'

'বৌদি! কি সব আজেবাজে কথাবার্তা বলছো, সামলে কথা বলো', ডোড়ী বলে ওঠে।

ডোড়ী এগিয়ে এসে সবাইকে চলে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো, 'যাও, তোমরা সবাই এখান থেকে যাও।'

নিহাল ওখান থেকে সরে গেলো। বাকী সবাইও এধার ওধার সরে পড়লো।

খড়ের চালের বারান্দার বাঁশ ধরে ডোড়ী একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মহিলাটিও আলুথালু বেশে বসেছিলো। চোখে যেন ওর আগুন। বলে উঠলো, 'ঠাকুরপো, আমি বেশ ভালো ভাবেই জানি, নিহালের এতো সাহস নেই, এসব তোমারই কাজ।'

'হ্যাঁ, গদল। আমিই করেছি', ডোড়ী শান্ত গলায় বললো।

শুনে গদলও একটু শান্ত হয়ে বললো, 'কেন তার কি দরকার ছিলো?'

ডোড়ী কোনো জবাব দিলো না। আপাদমস্তক তার রি রি করে উঠলো। কাঁচা পাকা গোঁফ ডোড়ীর, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, জাতে খারী গুজর। বেশ লম্বা, মাথাটা যেন খড়ের চালায় ঠেকে যায়। কাঁধের চওড়া হাড়ের ওপর প্রদীপের থিমে আলো পড়েছে। গায়ে ফতুয়া, পরণে মালকোঁচা করে বাঁধা ধুতী। হাত বেশ শক্ত। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

স্ত্রীলোকটি উঠে পড়লো। বয়স তার পঁয়তাল্লিশ, ফর্সা রঙ, তবে বয়সের দরুন রঙের সে জলুস আর নেই। দেখে মনে হয় এককালে বেশ কাজের ছিলো। জীবন ভোর কঠোর পরিশ্রম করায় দেহ এখন বেশ শিথিল হয়ে গেছে, কিন্তু কাজের উৎসাহ এখনও কমেনি।

'গদল, তোর লজ্জা করে না,' ডোড়ী বলে।

'কেন, লজ্জা করবে কেন ?' গদল জিজ্ঞেস করে।

ডোড়ী একটু থতমত খেয়ে যায়। উঠোন থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, 'লজ্জা ওর কেন করবে, চক্ষুলজ্জা থাকলে তো !'

'নিহাল, তুই চুপ কর', ডোড়ী চেঁচিয়ে ওঠে।

আওয়াজ থেমে যায়।

গদল জিজ্ঞেস করলো, 'তা আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিস ?'

ডোড়ী প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'রুটী খেয়েছিস ?'

'না, খাবো কখন ? মুখপোড়াগুলোর সঙ্গে তো রাস্তাতেই দেখা হোলো। ক্ষেত থেকে ফিরছিলাম', গদল বলে চলে।

ডোড়ী হাঁক পাড়ে, 'নিহাল, বৌমাকে বল শ্বাশুড়ীকে খেতে দিতে।'

ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কড়া গলার আওয়াজ শোনা গেলো, 'লোহারোঁ বাড়ীর বৌ এসেছেন, তাঁর কি গরীব খারীদের রুটী রুচবে ?' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রীলোক জোরে হেসে উঠলো।

নিহাল চেঁচিয়ে ওঠে 'শোন্ ভালো করে পোড়ারমুখী, জগতশুদ্ধ লোক হাসছে। তুই খারী বংশের মুখে চুণকালী দিয়েছিস।'

গুন্না যখন মারা গেলো তখন তার বয়স পঞ্চান্ন। গদল বিধবা হোলো। গদলের বড় ছেলে নিহালের বয়স তখন তিরিশের কাছাকাছি। নিহালের বৌ দুল্লো। দুল্লোর তিনটি ছেলেমেয়ে, বড় ছেলেটি সাত বছরের, মেজটি চার আর তৃতীয়টি কোলের মেয়ে। নিহালের ছোট বোন তারা—বড় দুই বোন, চম্পা আর চামেলী। তাদের দুজনের শ্বশুর বাড়ী ঝাঁজ আর বিস্বারা গাঁয়ে। এদের ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট—সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে। গদলের ছোট ছেলে নারায়ণের বয়স এখন বাইশ। নারায়ণের বৌ দ্বিতীয়বার সন্তান-সম্ভবা। এত বড় একটা পরিবার ছেড়ে গদল কিনা গিয়েছিলো বত্রিশ বছরের একটা লোহারু গুজরের ঘর করতে!

ডোড়ী গুন্নার সহোদর ভাই। বৌ ছিলো, ছেলেপুলে ছিলো। কিন্তু সবাই মারা গেছে। সে একলা। গুন্না তাকে আবার বিয়ে করার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলো। কিন্তু সে আর বিয়ে করেনি। একলাই থেকে গেলো। গদলের কাছেই খেতো, যা কিছু রোজগার করতো সবই ওকে এনে দিতো। ওর ছেলেপুলেদেরই নিজের ছেলেপুলে মনে করতো—কখনও আপন-পর ভাবতো না। নিহালও খুড়োকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো। খারী গুজররা লোহারুদের চেয়ে নিজেদের জাতে উঁচু মনে করতো।

গদল এখন যার ঘর করছে, তার পরিবারও খুব বড়। সে গদলের বয়স দেখেনি। জাতে খারী দেখে আর রাঁধবার একটা লোকের প্রয়োজন বুঝে গদলকে ঘরে নিয়ে গেছে।

আজ সকালেই গদল ওখানে গিয়েছিলো। বিকেলেই ছেলেরা ওকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। গদলের নতুন স্বামী মৌনী হয়তো সেকথা এখনও জানেই না। মৌনী বিপত্নীক ছিলো। মৌনীর বৌদি ঠমক দেখিয়ে পা ছড়িয়ে বসে মাখনের জন্যে মাঠা তুলতো। দুল্লো শুনলে কি বলবে?

গদলের মন বিক্ষোভে ভরে ওঠে।

2

মাঝরাত হয়ে এলো। গদল তখনও সেইখানেই শুয়ে। ডোড়ী ওখানে বসে তামাক খেতে খেতে বলে, 'গদল'।

গদল শান্ত ভাবে জবাব দেয়, 'কি বলছো?'

'তুই চলে গেলি তো?'

গদল কিছু বললো না।

ডোড়ী আবার বলে, 'সবাইকেই একদিন যেতে হয়। একদিন তোর জা গেলো, তারপর একে একে অনেকে, তোর দেওরপোরা, আমার দাদা। কিন্তু তুই যেমন ভাবে গেলি, এমন ভাবে তো কেউ যায়নি। জানিস জগত শুদ্ধ লোক হাসছে।'

গদল বিড়বিড় করে বলে ওঠে, 'আমি লোক হাসার পরোয়া করি না, ঠাকুরপো। আমি যখন চোদ্দ বছরের, তোর দাদা আমার গাঁয়ে গিয়ে আমায় দেখে পছন্দ করে এসেছিলো। পরে তুই আমাকে নিতে এসেছিলি তোর দাদাকে নিয়ে। সঙ্গে তোর সেই তেল চুকচকে লাঠি, মনে পড়ে? তখন আমি তোদের এখানে এসেছিলাম তো। তুই মনে করিস, গদলের এখন অনেক বয়স হয়েছে, স্বামীর আর কি দরকার। জানিস কেন আমি গেছিলাম?'

'না।'

'তুই ভাবছিস আমি চলে গেছি, খাওয়া-দাওয়ার সে সুখ আর তোর থাকবে না। বউমারা আর তোর ঝি-গিরি করবে না। তুই, তোর দাদা আর আমাকে খুব ভালোবাসতিস—তাই আমিও তোকে আপন করে রেখেছিলুম। বল, মিথ্যে কিছু বলছি?'

'না, সে কথা তো আমি বলিনি।'

'তাই বলছিলাম ঠাকুরপো, এখানে আমার আপন বলতে আর কে আছে। স্বামী তো গেছে, ও যতদিন বেঁচেছিলো ততদিন ওর সেবা তো করেছি, সেই সঙ্গে ওর আত্মীয়-স্বজন সবায়ের। এখন ও নেই, তবে কেন শুধু শুধু হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মরি। এই ছেলে বৌ-দের বাঁদীগিরি আমি করবো না।'

'হ্যাঁরে, পাগলী, এরা কি তোর সন্তান নয়? বেড়াল তার ছানাপোনার জন্যে সাত ভিটে এক করে বেড়ায়, তুই তো মানুষ! তোর মায়া-মমতা সব গেলো কোথায়?'

'তোমার মায়া-মমতা সব গেছলো কোথায় শুনি? আর বিয়ে করলে না কেন?'

'আমি তো তোর ভরসায় ছিলাম।'

'ভীতু কোথাকার! ভাই মরলো তোর, শ্রাদ্ধশান্তি করলো ছেলেরা। সব যখন চুকে গেলো, বিয়ে করলি না কেন, আমি তো ছিলামই। আমায় ভাত কাপড়ের জন্যে পরের দোরে যেতে হোলো। আমার আপন জনকেই আমি রেঁধে ভাত দেবো! সবাই গতরে ঘুন ধরিয়ে বসে থাকবে আর আমি হাড়মাস কালি করে খেটে যাবো—আমাকে সে বান্দা পাওনি। যেখানে আমার কোনো অধিকার নেই, সেখানে আমি খেতে যাবো কেন? বুঝলে ঠাকুরপো? তখন তো তুমি কিছু বলো নি? এখন পরিবারের কলঙ্কের কথা ভাবছো? বউরা যখন গদলকে চোখ রাঙাতো তখন তো ভাবোনি। মরুক গে যাক্-কে কার পরোয়া করে।'

ডোড়ী ধরা গলায় বলে, 'গদল আমি ভয় পেতাম।'

'কিন্তু কেন?'

'গদল, আমার এখন বয়স হয়েছে, লোক হাসবে, তাই ভয় পেতাম। ভাইপোরা ভাববে খুড়োর আগে থেকেই মার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক ছিলো, তাই খুড়ো দ্বিতীয় বার বিয়ে করেনি। গদল, এতে দাদারও তো বদনাম হোতো?'

'থাক, আর বলতে হবে না,' গদল উত্তর দিলো। 'দাদার জন্যে দরদ উথলে উঠছে। ওর যখন কাজ হয়েছিলো, তখন কি তুমি ছিলে না। আমার শ্বশুর যখন মরেছিলেন, তখন গুরু-গুষবীদের খাইয়ে তোমার দাদা মুখে জল দিয়েছিলো। আর তোমরা, তার ভাই ও ছেলেরা মাত্তর পঁচিশ জনকে খাইয়ে কাজ সেরে দিলে। কারণ দেখালে, যুদ্ধের সময় এর বেশী লোক খাওয়ালে পুলিশ

ধরপাকড় করবে। ভীতু কোথাকার। এ বাড়ীতে আমি থাকতে রাজী নই।'

ডোড়ীর কণ্ঠস্বর একটু কঠিন হয়ে উঠলো, বললে, 'আমি থাকতে তুই পরের ঘর করবি ?'

'হ্যাঁ'।

'আর একবার বলে দেখ দেখি,' বলেই ডোড়ী উঠে এগিয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, একশোবার তো বলছি,' গদল মাটিতে শুয়ে বলে উঠলো।

ডোড়ী আরও একটু এগোয়।

গদল চীৎকার করে ওঠে, 'আর এগিয়ে দেখো।'

ডোড়ী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। গদল তাকিয়ে থাকে। ডোড়ী বসে পড়ে। গদল শুধু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ফিক করে হেসে বলে, 'তুই আমায় করবি, তোর ক্ষমতা কোথায়, ঠাকুরপো। আমার নতুন স্বামী, জেনে রাখ, সে সত্যিই পুরুষ। আমার মনে হয় আমি তোর ভাইকেই যেন ফিরে পেয়েছি। তুই কি ? পুরুষ ? মেয়ে মানুষকে কি কেউ ভয় পায় ? তুই যদি দু'ঘা আমাকে মারতিস তো বুঝতাম তুই সত্যি আমাকে আপন জন মনে করিস। আমি এ বাড়ীতে থাকবো ভেবেছিস ?'

ডোড়ী হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকে। রাত বেড়ে চলে। গদল ঘাগরার একটা দিক দিয়ে গা ঢেকে শুয়ে পড়লো। ডোরী বসে বসে ঢুলতে থাকে।

3

বারান্দায় ঘুম থেকে উঠে আড়ামোড়া ভেঙ্গে দুল্লো জিজ্ঞেস করলো, 'ফিরে এসেছো মা লক্ষ্মী, রাতে ছিলে কোথায় ?'

শুকতারা ডুবে গেছে। ভোর হয়ে আসে। বলদরা উঠে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় ঠাণ্ডা মিষ্টি আমেজ।

গদল ফোঁস করে ওঠে, 'দিদি শুয়েই থাক্। বেশী কলম চালাস

নি।. আমার মেয়েরা তোর বয়সী। তোর ঠাকুরপোর সম্পর্কে আমি তোর ছোট জা, তোর শুকতলা নই।'

ছুল্লো হকচকিয়ে যায়। মৌনীর তখন সবে ঘুম ভেঙেছে। রেগেমেগে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কোথায় গিয়েছিলি ?'

গদল ঘোমটা টেনে দেয়। কিন্তু গলার স্বর তার পালটায় না। বলে ওঠে, 'কোথায় আবার, ওখানেই আমাকে ধরে নিয়ে গেছিলো, সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি।'

মৌনী চুপ করে যায়। মৌনীর বাবা বাইরে থেকে গরু বাছুর নিয়ে চলে যায়। মৌনীও যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে,' গদল জিজ্ঞেস করে।

'ক্ষেত খামারে।'

'আগে আমার ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করে যা,' গদল বলে ওঠে।

মাঝবয়সী এই স্ত্রীলোকের ভাব-ভঙ্গী দেখে ছুল্লো অবাক হয়ে যায়।

'কিসের হেস্তনেস্ত ?' মৌনী প্রশ্ন করে। বয়সে বড় স্ত্রীর মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারে না।

'এবার কি তোর বাড়ীশুদ্ধ লোকের বাঁদীগিরি করবো ভেবেছিস ?' গদল ঝাঁঝিয়ে ওঠে। 'আমরা তো দুটো প্রাণী, আলাদা রাঁধবো, আলাদা খাবো, বুঝলি ?' মৌনীর সম্মতির অপেক্ষা না করেই গদল বলে চলে, 'একসঙ্গে রোজগার করো, আপত্তি নেই। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সব আলাদা।'

মৌনী খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ছুল্লো রেগেমেগে বেরিয়ে এসে বললো, 'চুপ করে কেন, ঠাকুরপো, জবাব দাও। বলি, আমার ছোট জা এনেছো, না শাশুড়ী। এখন বাক সরছে না কেন ? তুই আমাকে যা তা মনে করিস না। রান্না করলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না। ওর বাঁকা বাঁকা ঠেস দিয়ে কথা বলা কিন্তু আমি সহ্য করবো না, বলে দিচ্ছি। আমার মাও আমাকে কড়া-খুন্তি ধরতে শিখিয়েছে।'

'আরে ডাইনি-মুখপুড়ি, রাঁধতে না জানলে তো এতোদিন সবাইকে গিলে খেতিস। তোর রুটিতে মধু মাখানো নেই যে তোর রুটি না খেলে গলা দিয়ে নামবে না,' গদল খিঁচিয়ে উঠলো।

মৌনী কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। দুপুর হয়ে আসে। দুল্লো বসে চরকা কাটে। নারায়ণ এসে হাঁক পাড়ে, 'কি, কেউ আছো?'

দুল্লো একটু ঘোমটা টেনে প্রশ্ন করে, 'কে?'

কোনো রকমে রাগ চেপে নারায়ণ বলে, 'আমি গদলের ছেলে।'

ঘোমটার ভেতর দুল্লো একটু হেসে ওঠে। জিজ্ঞেস করলো, 'ছোট না বড়?'

'ছোট।'

'আরও ক'ভাই আছে?'

'যতই হোক্ না, তোর তাতে কি?' বেরিয়ে এসে গদল জবাব দেয়।

'আরে, এসে পড়েছো,' বলেই দুল্লো ভেতরে পালায়।

'ওকে আগে বাড়ী ফিরতে দে, তারপর তোর মজা দেখাবো,' গদল মাথা নেড়ে শাসিয়ে ওঠে।

'মা এই কি তোর জা?' নারায়ণ প্রশ্ন করে।

'তুই মরতে কেন এখানে এসেছিস? আগে তার জবাব দে,' গদল রাগে ফুঁসিয়ে ওঠে।

'তুমি চলে এসেছো, তাই জরিমানা নিতে এসেছি,' বলে নারায়ণ বসার জন্যে এগিয়ে যায়।

'ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাক, এক পা নড়বি না,' গদল ফুঁসিয়ে ওঠে।

হাতে বালতি আর দড়ি নিয়ে মৌনী ঠিক সেই সময় ফেরে। ফিরে দেখে, গদল পায়ের তোড়া আর গলার হাঁসুলি খুলে নারায়ণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলছে, 'এই নে তোর জরিমানা। আর কোনোদিন কেউ এমুখো হবি না, বুঝলি? ফের যদি এমুখো

হোস তো পুলিশে এজাহার দিয়ে আসবো। বলবো, বৌদের কথায় আমার স্বামীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমাকে ঘর থেকে ছেলেরা বার করে দিয়েছে।'

নারায়ণের মুখে যেন কেউ কালি লেপে দিলো। গয়নাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফিয়ে যায়। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে মৌনী ঘরের ভিতর চলে যায়।

ছুল্লো নালিশ জানায়। বলে, 'শুনলে ঠাকুরপো, ছোট জা তো গয়নাগুলো দিয়ে দিলো। শেষ পর্যন্ত নিজের পাতেই ঝোল টানলো। চার বাড়ীতে ঘর করলে এইভাবে ছেলেদের ক্ষেতের বেড়ারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাড়ীর সামনে সান বাঁধানো দালানও হবে। তুমি তো সাদাসিধে মানুষ, তোমায় তাই বলছি। স্ত্রী-চরিত্র তুমি আর কি করে বুঝবে। এও এক ব্যবসা। এইবার আবার তোমায় নতুন গয়না গড়িয়ে দিতে বলবে।'

গদল একটু হাসে। 'বাহবা দিদি, তোদের বংশের মেয়েরা মৃত স্বামীর ধার দেনা, বর্তমান স্বামীর পয়সাতেই মেটায় বুঝি? গদল স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই চলে, দাসী বাঁদীর মত নয়। চাকরী যদি করতেই হয় তো স্বামীরই করবো, নয়তো বিধবা হয়েই কাটিয়ে দেবো, বুঝলি? মাঝখান থেকে তুই ফোড়ন কাটিসনি।'

ছুল্লো কটমটিয়ে একবার গদলের দিকে তাকালো। রাগে হুম হুম করে পা ফেলে ঘরের ভেতর চলে গেলো।

সব দেখে শুনে মৌনী বলে ওঠে, 'বেশী লম্বা চওড়া হাঁকিসনি, ঘরের বৌ-এর মতো চুপচাপ থাক।'

গদল মুচকি হেসে বলে, 'প্রাণেশ্বর,' তোমার জন্মাবার আগে থেকেই এসব কথা আমার জানা, আমায় আর কি শেখাবে? আমি সমাজ-বিরুদ্ধ কিছু করিনি। যদি কখনও করি, হাজার বার তুই মানা করিস। বড় জা'র মুখ নাড়া সহ্য করতে পারবো না।'

মৌনী মাথা নাড়িয়ে বলে, 'তাহলে একবার মজা দেখাবো।'

গদল হেসে ঘরের ভিতর গিয়ে নিজের কাজ সুরু করে দেয়।

4

বেশ জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ডোড়ী বাইরে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে। খানিকক্ষণ হুঁকো টানার পর বিরক্ত হয়ে কল্কেটাকে উল্টে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

ক্ষেত থেকে ফিরে নিহাল বলদদের বেঁধে জাব্‌না দিয়ে ডোড়ীকে ডাকে, 'কাকা।' আপন মনে ডোড়ী কিছু ভাবছিলো, ডাক শুনতে পায় না।

'কাকা', নিহাল এবার গলার স্বর একটু চড়িয়ে ডাক দেয়।

'হ্যাঁ!' বলে ডোড়ী চমকে ওঠে। 'আমায় কিছু বলছিস?'

'তোমায় বলবো না তো কাকে বলবো। সারাদিন তো তোমায় দেখতে পাইনি। চিম্মন কটেরা বলছিলো যে তুমি সারাদিনই মনমৌজী বাবার আখড়াতেই কাটিয়েছো। সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁরে, একটু ওদিকে গেছিলাম।'

'কেন গিয়েছিলে?'

'এমনি, মনে হোলো তাই।'

'সহরতলী থেকে বেনের লোক এসেছিলো, ঘি-এর কথা জিজ্ঞেস করছিলো। আমি নেই বলে দিয়েছি। সে নাছোড় বান্দা, ঘি নিয়ে তবে যাবে। প্রায় ঝগড়াঝগড়ির উপক্রম।'

'এ রকম করতে নেই বাবা,' ডোড়ী উপদেশ দেয়, 'খদ্দেরের সঙ্গে কি কেউ ঝগড়া করে।'

নিহাল কল্কেটা তুলে ঘুঁটের আগুন দিয়ে ধরিয়ে ফুঁ দিতে দিতে এলো। বলে, 'আমি যাইনি মাথা ফাটাফাটির ভয়ে, নারায়ণকে পাঠিয়ে ছিলাম।'

'কোথায়?' ডোড়ী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে।

'ওই কুলখাগী, কুলক্ষণার কাছে।'

'তোর মার কাছে?'

'জানি না, তুমি ওকে কি চোখে দেখো। আজও তোমার কোনো রাগ নেই ওর ওপর। ওকে মা বলবো আমি?'

'তুই না বললে কি হবে, সারা দুনিয়া ওকে তো তোর মা-ই বলবে। যতদিন স্ত্রীলোকেরা সধবা থাকে, ততদিন স্বামীর নামেই তার পরিচয়। স্বামী গত হলে স্ত্রীলোকের পরিচয় ছেলের নামেই। এ আমি কিছু নতুন কথা বলছি নারে।'

নিহাল মনে মনে গুমরোতে থাকে, বলে, 'ঠিক আছে কাকা, সব বুঝলাম! কিন্তু কেন পাঠিয়েছিলাম তাতো জিজ্ঞেস করলে না?'

'সত্যি তো, তুই তো কিছু বলিসনি এখনও। বল না, কেন?'

'অন্যায়ের জরিমানা আদায় করতে পাঠিয়েছিলাম। পঞ্চায়েত বসাবার আগেই গায়ের গয়না খুলে দিয়ে দিয়েছে।'

ডোড়ী একটু হেসে বললো, 'তার মানে, ও বলতে চায় যে বাড়ীর লোক ওর জন্যে পঞ্চায়েতও বসালো না। মানে আমরা ওকে তাড়াতেই চেয়েছিলাম। নারায়ণ সেগুলো নিয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

ডোড়ী ভাবতে থাকে।

নিহাল জিজ্ঞেস করে, 'ওগুলো কি ফিরিয়ে দেবো?'

'নারে, তা দিতে হবে না। সত্যিই সে অভিমান করে চলে গেছে, এই যা। তোর খাওয়া হয়ে গেছে?'

'না।'

'আগে খেয়ে নে।'

নিহাল উঠে গেলো। ডোড়ী বসে থাকে। রাত বেড়ে যায়। দূরে ঢোলা গানের আওয়াজ শোনা যায়। ডোড়ী উঠে সেদিকে পা বাড়ায়।

নিহাল বৌকে জিজ্ঞেস করে, 'কাকা খেয়েছেন?'

'নাতো।'

নিহাল বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কাকাকে দেখতে পায় না। 'কাকা' বলে ডাক পাড়ে। পাহাড়ের ওপরে হনুমানজীর মন্দির বন্ধ করে চিরঞ্জি পূজারী ফিরছিলেন। পথে নিহালের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে রে?'

'প্রণাম ঠাকুর মশাই,' নিহাল বলে, 'কাকা, এইমাত্র এখানে বসেছিলেন…'

চিরঞ্জি পূজারী কথাটা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'আরে, তোর কাকা ওখানে ঢোলা গান শুনছে। এই মাত্তর আমি দেখে এলাম।'

চিরঞ্জি চলে গেলেন। নিহাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বৌ বাইরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে ?'

'কাকা ঢোলা শুনতে গেছে।' কথাটা নিহাল বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'কাকা আগে তো কখনও যেতো না।'

'যাও না, গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো, অনেক রাত হয়েছে,' বলে বৌ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে লাগলো।

নিহাল কাকাকে নিয়ে ঘরে ফিরলো। কাকার গা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ছোট খাটেতে গুড়িশুড়ি মেরে শুয়ে ডোড়ী বলে, 'একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে, আর কিছু না। ভালো লাগছে না, আজ আর কিছু খাবো না।'

নিহাল দাঁড়িয়ে থাকে। ডোড়ী বলে, 'একবার মনে কর দেখি কতদিন বাদে ঢোলা গান শুনলাম। সেই দাদার ফুলশয্যার রাতে, তারপর এই আজ……।'

নিহাল দেখে, ডোড়ী চোখ বুজে গুন গুন্ করে সুর ভাঁজছে।

5

সন্ধ্যে হয়ে এলো, মৌনী বাইরে বসে। গদল গরম রুটি আর আমের চাটনী খেতে দেয়।

'বাঃ, চমৎকার খেতে হয়েছে', মৌনী খেতে খেতে বলে।

গদল বসে পড়ে। বলে, 'তোমার বয়সের সঙ্গে মানায় এমন মেয়ে বিয়ে করছো না কেন ?'

মৌনী চমকে ওঠে। বলে, 'একটাকেই খাওয়াতে পারছি না।'

গদল উত্তর দেয়, 'ভাবছো বুঝি ঘরে সতীন ডেকে আনছি।

পুরুষদের বিশ্বাসই বা কি? আমার তো অনেক বয়স হোলো, বেঁচে থাকতে থাকতে নিজের চোখেই সতীনকে দেখে যাই। তাছাড়া হুকুম করবার একটা লোকও পাওয়া যাবে তো!'

মৌনী হাসে। বলে, 'আচ্ছা, তাই বল। আসলে তোর একটা ঝগড়া করার লোক চাই।' খাওয়া শেষ হলে গদল কল্কে সেজে দেয়। নিজে একটু আড়াল করে খেতে বসে।

হঠাৎ কানে আসে, 'আরে, এসময় যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

জবাবে শুনতে পায়, 'জরুরী কাজে যাচ্ছি মৌনী। পেশকার সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।'

গদল গলার আওয়াজ চিনতে পারে। এ তারই গাঁয়ের গিরিরাজ গোয়ালার গলা, নিশ্চয় পেশকার সাহেব তাঁর গরু চরাবার জন্যে ডেকেছেন।

মৌনী বলে, 'আরে, তা রাত্তিরে কেন? নে, একটু তামাক টেনে যা।'

গিরিরাজ তামাকের লোভ সামলাতে পারে না। মৌনীর কাছে বসে পড়ে।

গদল আর একটু রুটি ছিঁড়ে মুখে দেয়।

'তুমি শুনেছ?' বলে গিরিরাজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

'কি?' মৌনী প্রশ্ন করে।

'গদলের দেওর ডোড়া মারা গেছে।'

গদলের খাওয়া আর হয় না। হাতের রুটি হাতেই থেকে যায়। তাড়াতাড়ি এক ঢোক জল খেয়ে গরসটা গিলে ফেলে। কান খাড়া করে ওদের কথা শুনতে থাকে। ভয়ে হাত পা সেঁদিয়ে যায়।

'মারা গেল কি করে?' মৌনী জিজ্ঞেস করে। 'স্বাস্থ্যতো বেশ ভালোই ছিলো।'

'রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে গেছিলো।'

গদল দরজার দিকে এগিয়ে এসে 'গিরিরাজ' বলে ডাক দেয়।

'কে, কাকী?' গিরিরাজ উত্তর দেয়।

'সত্যি, মরবার সময় সে তোমার নাম করে মরেছে। বড় ভালো-মানুষ ছিলো।' গদল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গিরিরাজ চলে যায়।

'শুনছো ?' গদল ডাকে।

'কিরে, কি বলছিস ?'

'আমি এক্ষুনি যাবো।'

'কোথায় ?' বলে মৌনী প্রমাদ গোণে।

'ওখানে।'

'কেন ?'

'ঠাকুরপো যে মারা গেছে।'

'ঠাকুরপো ! এখন তো সে তোর ঠাকুরপো নয়।

গদল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'ঠাকুরপো সে আমার পরের জন্মেও থাকবে। সে যদি উদাসীন না হোতো, তবে ও বাড়ী থেকে আমায় নড়ায় কে শুনি ! সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাই আমিও ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। আমি তার শোধ তুলেছি।'

বলতে বলতে গদল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোর যাওয়া হবে না,' মৌনী বলে।

'কেন ? তুই আটকে রাখবি বুঝি ? আমার পেটের ছেলেরা আমাকে রুখতে পারলো না। এখন আর কি ? যাকে লোক চক্ষে হেয় করতে চেয়েছিলাম, সেই-ই রইলো না। তুই এখন বাধা দেবার কে ? স্বেচ্ছায় এসেছি, থাকি বা না-থাকি সেও আমার ইচ্ছে, তুইতো আমায় আর কিনে নিস নি। এ বাড়ীতে বসে এ কথা বলতে পারলি, ও-বাড়ী হোলে এতক্ষণ জিভ টেনে বার করে দিতাম।'

'আরে যা, যা,' বলে মৌনী গদলের হাত ধরে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে নিজে দরজার সামনে চারপাই বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে হুঁকো টানতে লাগলো।

গদল ঘরের ভেতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মৌনী

বুঝতেই পারে না। আজ গদলের চোখের জল কোনো বাধাই মানতে চায় না।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। গভীর নিদ্রায় মৌনীর নাক তখন ডাকছে। গদল ঘরের চাল সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে উঁচু করে সাপের মত গা বেয়ে অন্য দিকে লাফ দেয়।

মৌনী ঘরে বসে বসে তড়পায়। এমন সাহস তার নেই যে গাঁয়ে গিয়ে হৈ চৈ করে লাঠির জোরে গদলকে জোর করে ফিরিয়ে আনে। ইচ্ছে হচ্ছিলো হতচ্ছাড়ির ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়। ছুল্লো ঠেস দিয়ে মৌনীকে শোনায়। গদলের পালিয়ে যাওয়াতে মৌনীর মান-ইজ্জত সব গেছে। শুনে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয় মৌনী। গুজর'রা শুনে মৌনীকে সান্ত্বনা দেয়। ঐ বুড়ীর জন্যে আবার কেউ খুনখারাপি করে নাকি। তাছাড়া মৌনীর তো আর বেশী খরচাও হয় নি। বড় জোর দু'খানা রুটি নয় খেয়ে গেছে, করে খাইয়েও তো গেছে।

মৌনী আরও চটে যায়।

গিরিরাজ এসে আবার শুনিয়ে গেছে। গদল ও বাড়ীতে যখন পৌঁছয়, তখন প্যাটেলও বসেছিলো। নিহাল রুখে বলেছিলো, 'খবরদার বাড়ীর ভেতর ঢুকবে না। মরতে ফিরে এসেছ কেন?'

প্যাটেল অবাক হয়ে বলে ফেলে, 'কি নিতে এসেছো বৌমা?'

গদল ওখানে ব'সে পড়ে বলে, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঠাকুরপো লাঠি হাতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমাদের গ্রামে এসেছিলো। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর সবল হাত দু-খানা দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সত্যিকারের পুরুষ। ভেবেছিলাম এরই ছায়ায় জীবনটা কাটিয়ে দেবো। তুমিই বলো প্যাটেল, স্বামী মারা যাবার পর সেই আমায় রাখতে পারলো না—আমার অন্য আর কি উপায় ছিলো? আমি না থাকাতে এরাই বা কি করতে পারলো? দু-দিনেই তো কাকাকে খেলো। এদের ভরসায় থাকলে না জানি আমার কি হোতো?'

উত্তরে প্যাটেল বলে, 'বৌমা, ছেলেমেয়ের বয়সটাও একবার দেখলে না।'

গদল জবাব দেয়, 'ঠিক বলেছো। ছেলেমেয়ের বয়স দেখবো, না নিজের সম্মান? তুমি কি বলো। ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া ছিলো, তা শেষ হয়ে গেছে। এই আমার ছেলে। যদি সমাজ বিরোধী কিছু কাজ করে থাকি, আমায় বাধা দাও, পঞ্চায়েত ডাকো, সেখানে আমি জবাবদিহি করবো। কিন্তু ছেলেরা যখন জ্ঞাতিগুষ্টির মুখে চূণকালী দিলো তখন তোমরা সব কোথায় ছিলে?'

প্যাটেল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সে আবার কবেকার কথা?'

'তুমি ছাড়া এ প্রশ্ন আর কে করবে? কোনো মতে পঁচিশটা পাত পেড়ে আমার স্বামীর শেষ কাজ দায় সারার মতো সারে এরা।'

'দূর পাগল। সে তো সরকারী নিয়ম ছিলো বলে।'

'কানুন ছিলো,' গদল হাসে। 'সারা দুনিয়া কি কানুন মেনে চলছে। দিন-দুপুরে লোকের বাড়ী থেকে মোষ খুলে নিয়ে যাচ্ছে। যত আইন কি আমার স্বামীর বেলায়। তার চেয়ে সোজা কথা বলো, ছেলেরা ভেবেছিলো, পয়সা নষ্ট করা ছাড়া শুধু শুধু এ সব করে আর কি লাভ? কাপুরুষ কোথাকার।'

নিহাল গর্জে ওঠে, 'কাপুরুষ, আমরা সব কাপুরুষ? তুই সিংহী বুঝি?'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গদল বলে, 'সিংহী? হ্যাঁ, আমি সিংহী। বল, তোর অতো সাহস আছে?'

পাল্টা জবাব দেয় নিহাল, 'তুই-ই বল।'

'তাহলে যা, কাকার শ্রাদ্ধে সবাইকে নেমন্তন্ন করে আয়,' গদল বলে।

নিহাল হকচকিয়ে যায়। বলে ওঠে, 'পুলিশ?'

গদল নিজের বুক চাপড়ে বলে ওঠে, 'এই তোর সাহস?'

প্যাটেল শুনে জবাব দেয়, 'বৌমা ক্ষেপে গেলে নাকি? পুলিশে যদি গুলি চালায়?'

'এইসব ধর্মাবতাররাই সব ডুবিয়েছে। ভগবান, সারা গুজরাতটাই ডুবে গেছে। আর কোনো ভরসা নেই। চারিদিকে শুধু কাপুরুষ আর কাপুরুষ।'

একটু থেমে হঠাৎ বলে ওঠে গদল, 'আমি ব্যবস্থা করবো?'

'তুই?' অবাক হয়ে নিহাল বলে।

'হ্যাঁ, আমি।' কথা শেষে গদলের চোখ ছলছল করে আসে। 'মরার সময় আমার নাম করেছে, তাই আমি তার সব ব্যবস্থা করবো।'

মৌনী অবাক হয়ে সব কথা শুনছিলো। গিরিরাজের মুখেই শ্রাদ্ধের খুব তোড়জোড় হচ্ছে শুনতে পেয়েছিলো। গদল দারোগাকে ঘুষ খাইয়েছে। ঐ দিন দারোগা আর ও পথ মাড়াবেন না। গদল বিরাট আয়োজন করেছে। পাঁচজনে বলাবলি করে যে স্বামী মারা যেতেও গদল শোকে এতো কাতর হয় নি, যা হয়েছে ডোড়ী মারা যাবার পর। এইসব বলে গিরিরাজ মৌনীর মন বিষিয়ে দেয়। মৌনী উঠতে উঠতে আপন মনে বলে ওঠে, 'গদল, যা খুসী তাই করবে ভেবেছো, কিন্তু তা হবে না। ঘুষ দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করেছো। দারোগারও বাবা আছে। আমি জেলার বড় দারোগার কাছে নালিশ করবো।'

6

খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয়েছে। বারে-বারে পাতা সাজানো হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনরা খেয়ে উঠে যাচ্ছে। সমানে লুচি ভাজা হচ্ছে। বাইরে পুরুষেরা ব্যবস্থা করে খাওয়াচ্ছিলো। যুদ্ধের সময় চড়া দামে শস্য বিক্রী করে নিহাল ও নারায়ণ জমানো যা টাকা ঘড়ায় পুরে রেখেছিলো, সে সবই খরচ হোলো, কিছু ধার দেনাও হোলো। লোকেরা কিন্তু বলাবলি করেছিলো গদলের জন্যেই এইসব সম্ভব হয়েছে। ওর ছেলেরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। জ্ঞাতিগুষ্টির চাইতে কি আইনের কদর বেশী?

গদল ক্লান্ত হয়ে মেয়েদের মহলে বসেছিলো। হঠাৎ দরজার বাইরে সিপাই দেখেতে পেয়ে বেরিয়ে এলো। দেখে নিহাল মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার দেওয়ানজী,' গদল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে।

একটি স্ত্রীলোককে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে দেখে দেওয়ানজী একটু হকচকিয়ে যান।

নিহাল উত্তর দিলো, 'দেওয়ানজী বলছেন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিতে।'

'তা কি করে সম্ভব?' গদল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'দারোগাজীর আদেশ,' দেওয়ানজী নম্র ভাবে জানালেন।

'কেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করেই তো এইসব আয়োজন করা হয়েছে।' গদলের কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত যে ঘুষ আগেই দেওয়া হয়ে গেছে।

দেওয়ানজী বললেন, 'তা জানি। দারোগাজী তো মিলে মিশেই থাকতে ভালোবাসেন, কিন্তু কেউ বড় দারোগাজীর কাছে নালিশ করেছে। তাই দারোগাজীকে আসতেই হবে। উনি সেই জন্যেই ভিড় কম করতে বলে পাঠিয়েছেন। তা' না হলে আইনের সাহায্য নিতে হবে।'

কে নালিশ করতে পারে খানিকক্ষণ গদল চুপ করে ভাবতে লাগলো। কিন্তু আন্দাজ করতে পারলো না। বললো, 'দারোগাজী এ বিষয় কি আগে চিন্তা করেননি? এখন কি জ্ঞাতি কুটুমকে খেতে খেতে তুলে দেবো? দেওয়ানজী তুমিও খেতে বসো। গণ্ডগোল বাধলে খবর দেবো। দারোগাজী আসছেনই বা কেন? তিনি তো এখানকার রাজা।'

দেওয়ানজী বললেন, 'সরকারী চাকরী, চলে যাবে যে। তাই ওঁকে আসতেই হবে।'

'তাহলে আসতে দাও,' গদল কটাক্ষ করে বলে। 'ভদ্রলোকের এক কথা—আমি আত্মীয়-স্বজনদের উঠিয়ে দিতে পারবো না।'

নারায়ণ ভয় পাচ্ছিলো। দেওয়ানজী বুঝিয়ে বললেন, 'সবাইকে

গ্রেপ্তার করা হবে, বুঝছো না কেন? সরকারের সঙ্গে লড়ে কি হবে?'

'সরকার কি আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও বেশী,' গদল রেগে বলে ওঠে। 'সরকারের খিদমত এতোদিন খেটে এসেছি, সরকারের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারবো না। যদি ধর্মের ওপর হাত দাও, তাহলে আর বেঁচে থেকে লাভ কি?'

গদল গটমট করতে করতে চলে গেলো।

আরও তিন সারি লোক খেয়ে উঠে গেলো। শেষের পাত পড়েছে।

নিহাল অন্ধকারে দেখে নিয়ে বলে, 'নারায়ণ, তাড়াতাড়ি নে, আর এক সারিতো বাকী।'

গদল চালাঘর থেকে হাঁক দিলো, 'নিহাল'।

নিহাল এগিয়ে যায়।

'ভয় পাচ্ছিস?'

শুষ্ক ঠোঁট জিভ দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিয়ে নিহাল বলে, 'না তো?'

'ভুলে যাসনি তুই আমার ছেলে। তোর কাকা তোকে নিজের ছেলের মত ভালোবাসতো বলে আর বিয়েই করেনি। তার নিজের বলতে আর কেউ নেই, ভুলিস না কিন্তু,' গদল বলে চলে।

নিহাল মাথা হেঁট করলো। একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে ওঠে, 'ঠাকুর্মা।'

'কিরে?' গদল উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'সশস্ত্র পুলিশ আসছে।'

জিজ্ঞাসুনেত্রে নিহাল গদলের দিকে তাকায়।

গদল নিহালকে বললো, 'শেষ সারি খেয়ে উঠতে আর বেশী দেরী নেই।'

'কিন্তু ওরা কি সেকথা শুনবে?'

'ওদের বাধা দিতে হবে।'

'ওদের কাছে তো বন্দুক আছে।'

'বন্দুক তো আমাদের কাছেও আছে নিহাল। বাজারে বন্দুকের কি অভাব পড়েছে?'

'তাহলে আমরা খাবো কি?'

'ভগবান যা দেবেন।'

বাইরে পুলিশের গাড়ীর হর্ণ শোনা যায়। নিহাল এগিয়ে যায়। দারোগা গাড়ি থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি খাওয়ানো দাওয়ানো হচ্ছে?'

নিহাল হতবুদ্ধি হয়ে যায়। যে দারোগা ঘুষ খেয়েছিলো সে এখন নিহালকে চিনতেই পারলো না।

'হ্যাঁ, হচ্ছে,' রেগে নিহাল বলে ওঠে।

'পঁচিশ জনের বেশী?'

'মাথা গুণে আমরা খাওয়াই না, দারোগা সাহেব।'

'কিন্তু আইন তো আর ভাঙ্গতে পারো না।'

'সরকারী আইন তো দুদিন হোলো চালু হয়েছে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম-কানুন আবহমান ক'ল ধরে চলে আসছে। সমাজ নিয়ে আমাদের কাজ, সরকারী আইন নিয়ে নয়।'

'তাহলে আমি গ্রেপ্তার করবো।'

গদল হাঁক পাড়ে, 'নিহাল।'

নিহাল ভেতরে গেলো।

গদল বলে, 'খাওয়ানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখতেই হবে।'

'তারপর?'

'তারপর সবাইকে খিড়কীর দরজা দিয়ে বার করে দেবো। যদি কেউ ধরা পড়ে, তবে আত্মীয়-স্বজন বলবে কি?'

'এদের ঠেকানো যাবে না, এরা গুলী চালাবে।'

'তুই ঘাবড়াসনি, ছাদে চারজন লোক নিয়ে নারায়ণ বন্দুক হাতে বসে আছে।'

নিহাল শিউরে ওঠে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। বলে, 'আমাদের কাছে ছোট বন্দুক, ওদের কাছে রাইফেল।'

'যাই হোক না, ততক্ষণে খাওয়ানো শেষ হয়ে যাবে।'

'তারপর কি করবে?'

'তোরা সবাই পালাবি।'

হঠাৎ লণ্ঠন নিভে যায়।

অন্ধকারে দুম-দাম গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায়।

গদল চীৎকার করতে থাকে, 'আমার, মাথার দিব্যি, তোমরা সবাই খেয়ে তবে উঠবে।'

তখন সবায়ের পালাবার তাড়া। বাইরে তখনও গুলী ছোঁড়ার শব্দ হচ্ছে। একজন আর্তনাদ করে পড়ে গেলো। যারা খাচ্ছিলো তাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে বার করে দেওয়া হোলো।

সবাই যখন চলে গেলো, তখন গদল ছাদে উঠলো। নিহালকে ডেকে বললো, 'বাবা…।'

গদলের এই ডাকে মাতৃত্বের সকল দরদ ও মমতা ফুটে ওঠে। এতো গোলমালের মধ্যেও নিহালের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিহালের উত্তরের আগেই গদল আবার বলে ওঠে, 'আমার মাথার দিব্যি—তুই, নারায়ণ, বৌমাদের আর ছেলেপুলেদের নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যা।'

'আর তুই?'

'আমার জন্যে ভাবিস না। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোর কাকা আমায় ডাকছে।'

নিহাল আর কথা বাড়ালো না। গদল একজন বন্দুকধারীর হাত থেকে ভরা একটা বন্দুক নিয়ে বলে, 'তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাও।'

সংসারের মায়ায় বদ্ধ যারা, আসন্ন বিপদে পুত্র পরিবারের চিন্তাই তাদের মনকে ঘিরে থাকে।

গদল গুলি চালায়। একজন আর্তনাদ করে পড়ে যায়। গদল

হেসে ওঠে। তার অট্টহাসি অন্ধকারের বুকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

হাসি শুনে দারোগা সাহেব চমকে ওঠেন। স্ত্রীলোক! পুরুষগুলো গেলো কোথায়? পেছন দিক থেকে বাড়ীটা ঘিরে ফেলে সিপাহীরা ওপরে উঠে গুলী ছোঁড়ে। গদলের পেটে গুলী বেঁধে।

7

হাঙ্গামা মিটেছে। রক্তাক্ত দেহে গদল পড়ে আছে। পুলিশের লোকেরা সব জড়ো হয়েছে।

দারোগা আপন মনেই বলে ওঠেন, 'এখানে কাউকেই তো দেখছি না।'

একজন সিপাই বলে ওঠে, 'হুজুর, এ স্ত্রীলোক।'

দারোগা সাহেব এগিয়ে এসে গদলকে প্রশ্ন করেন, 'তুই কে?'

গদল শুধু একটু হাসে। শান্ত গলায় উত্তর দেয়, 'দারোগা সাহেব, কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। আত্মার তৃপ্তি হয়েছে।'

দারোগা সাহেব রেগে ওঠেন, 'তুই কে?'

গদল অতি ক্ষীণ স্বরে বলে, 'যে একদিনও একলা থাকতে পারলো না, আমি তারই···।'

গদলের মাথা ঢলে পড়ে।

মুখে তার প্রশান্ত হাসি, যেন অন্ধকারে নিভে-যাওয়া লণ্ঠনটি আবার জ্বলে উঠেছে।

তৃতীয় প্রতিশ্রুতি

হিরামন গাড়োয়ানের পিঠে সুড়সুড়ি লাগে।...

বিশ বছর ধরে হিরামন গাড়ী চালাচ্ছে। গরুর গাড়ী। সীমান্তের ওপারে নেপালের পূবভাগ থেকে ধান আর কাঠ নিয়ে আসে। কণ্ট্রোলের বাজারে কালোবাজারীদের মালপত্তর এপার থেকে ওপারেও পৌঁছে দিয়েছে। এতদিন লাগেনি কিন্তু আজ পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে।

কণ্ট্রোলের বাজার হিরামন কি কখনও ভুলতে পারে। একবার চার গাড়ী সিমেণ্ট ও গাড়ীভর্তি কাপড়ের গাঁঠ যোগবনী থেকে বিরাট-নগর পৌঁছে দিয়েছিলো। তাতেই ওর সাহস খুব বেড়ে গেছিলো। ফারবিসগঞ্জের চোরাকারবারীরা ওকে ছঁদে গাড়োয়ান বলেই জানে। বড় গদির বড় শেঠজী ওর গাড়ীর বলদ দুটোর খুব প্রশংসা করতেন।

চার ক্ষেপ মারার পর পাঁচবারের বার সীমান্তের এধারে সমতল ভূমিতে হিরামনের গাড়ী ধরা পড়ে।

মহাজনের মুনিম গাঁঠরীর মধ্যে গুড়িশুড়ি মেরে লুকিয়ে ছিলো। দারোগাবাবুর দেড়হাত লম্বা টর্চের আলোর কত তেজ হিরামন তা ভালো করেই জানে। চোখ একটু আলো লাগলেই ঘণ্টাখানেকের মতন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আলোর সঙ্গে সঙ্গে কড়া হুমকি, 'এই শালা! গাড়ী থামা। নইলে গুলি করবো।'

বিশ বিশটা গাড়ী একসঙ্গে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে থেমে যায়। হিরামন আগেই বলেছিলো এই বিশ-ই সব বিষিয়ে দেবে। হিরামনের গাড়ীতে মুনিমজী লুকিয়েছিলো। তাঁর মুখে টর্চ মেরে দারেগাবাবু পৈশাচিক হাসি হাসলেন, 'হা-হা-হা। মুনীমজী-ই-ই-ই।

হি-হি-হি ।...এই শালা গাড়োয়ন, হাঁ করে কি দেখছিস। বস্তার মুখ থেকে কম্বলটা সরা।' হাতের ছোট রুলটা দিয়ে মুনিমজীর পেটে এক গোঁত্তা মেরে বলে ওঠেন, 'ওই বস্তাটা। শা-শা-লা ...।'

দারোগাবাবুর সঙ্গে মুনিমজীর সম্ভবত বহু দিনের এক পুরনো শত্রুতা ছিলো। তাই মুনিমজী এত টাকা দিতে রাজী থাকা সত্ত্বেও দারোগাবাবুর মন ভিজলো না। গাড়ীতে বসেই মুনিমজী চার হাজার টাকা দিতে চাইলো। রুলের আর এক গুঁতো খেতেই পাঁচ হাজার টাকা। দারোগাবাবু আবার এক গুঁতো দিয়ে হুঙ্কার ছাড়েন, 'আগে গাড়ী থেকে নাম, বেটা।'

মুনিমজীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দারোগাবাবু তার চোখে টর্চ মারলেন। দু-জন সিপাইকে সঙ্গে করে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে এক ঝোপের ধারে মুনিমজীকে নিয়ে গেলেন। পাঁচটা বন্দুকধারী সিপাই-এর হেফাজতে সব গাড়ীগুলো আর গাড়োয়ানদের রেখে গেলেন। হিরামন বেশ বুঝতে পারে, এবার আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই। নির্ঘাত হাজত বাস! হাজত বাসের ভয় হিরামনের নেই। তার ভাবনা শুধু বলদ দুটোকে নিয়ে। কে জানে, কত-কাল খেতে না পেয়ে পেটের জ্বালায় সরকারী ফটকে আটক থাকবে। পরে আবার নিলামে চড়বে। তাহলে দাদা-বৌদিকে আর মুখ দেখাতে পারবে না। নিলামের ডাক তার কানে বেজে উঠে—এক—দুই—তিন! দারোগাবাবুর সঙ্গে মুনিমের রফা হোলো না।

হিরামনের গাড়ীর পাশে এক সিপাই দাঁড়িয়েছিলো। সে অন্য আর এক সিপাইকে গলাটা একটু নীচু করে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার হে, মামলা গোলমেলে মনে হচ্ছে।' খৈনি দেবার ভান করে সিপাইটার কাছে চলে গেলো।

এক-দুই-তিন। পেছনের তিন চারটে গাড়ী হিরামনের গাড়ীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলো। হিরামন মনে মনে এক মতলব ভাঁজলো। আস্তে আস্তে বলদ দুটোর গলার দড়ি খুলে দিয়ে

গাড়ীর ওপর বসে দুটোকে একসঙ্গে বাঁধলো। এবার তাদের কি করা উচিত বলদ দুটোও যেন বুঝতে পারে। হিরামন গাড়ী থেকে নেমে আস্তে আস্তে বলদের কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে দিয়ে গাড়ীটাকে বাঁশের ঠেকনো দিয়ে রাখলো। বলদ দুটোর কানের পাশে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে মনে মনে বলে ওঠে, 'চলো ভাই, প্রাণে বাঁচলে এ রকম গাড়ী অনেক মিলবে। এক-দুই-তিন! চলো! চুপচাপ কেটে পড়ি!...'

রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়গুলোও গাড়ীটাকে আড়াল করেছিলো। চুপিসাড়ে তিনটে প্রাণী ঝোপঝাড় পার হয়ে গেলো। তারপর এক পা-দু-পা-দে ছুট্। সমতল ভূমিতে এসে পড়ে তারা। বলদ দুটো সাহস করে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। পথ শুঁকে শুঁকে নদী-নালা পার হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুট দেয়। পেছনে পেছনে হিরামন।

বাড়ী পৌঁছে হিরামন দু-দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো। হুঁশ ফিরতেই নাক কান মলে শপথ করে। কোন দিন আর এইসব চোরা-কারবারীদের জিনিষপত্তর গাড়ীতে তুলবে না। চোরাকারবারের মাল? আরে রাম, রাম।...কিন্তু মুনিমজীর কি হোলো? তার গাড়ীটার কি গতি হোলো, ঈশ্বরই জানেন। চাকার ঘুর-ঘুরিটা খাঁটি ইস্পাতের ছিলো, এই যা। একটা চাকাও ছিলো আনকোরা। রঙ্গীন সুতার ফুলও তাতে সযত্নে লাগানো ছিলো।

এ পর্যন্ত দুটো শপথ সে করেছে। এক নম্বর প্রতিশ্রুতি—চোরা-কারবারীদের মাল গাড়িতে তুলবে না; আর দু' নম্বর—বাঁশ। কেউ তার গাড়ী ভাড়া নিতে এলে প্রথমেই সে পরিষ্কার কথা বলে নেয়, চুরিচামারির মাল নয়তো? আর বাঁশ? বাঁশ বোঝাই করতে পঞ্চাশ টাকা দিলেও নয়। অন্য গাড়ী দেখো।

গাড়ি বাঁশে বোঝাই। সামনের দিকে বাঁশ চার হাত বেরিয়ে পেছনের দিকেও তাই। গাড়ীটা সব সময়ই বেসামাল। বেসামাল অবস্থায় গাড়ী চালনো মানে খরৈহিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বাঁশের

যে অংশটুকু সামনে বেরিয়েছিলো ব্যাপারীর বোকা চাকরটা সেটুকু ধরে চলছিলো। নজর তার মেয়েদের স্কুলের দিকে। মোড় ঘুরতেই ধাক্কা লাগে এক ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে। বলদ দুটোর দড়ি টেনে গাড়ীর লাগাম সামলাবার আগেই বাঁশের সামনের অংশটা ঘোড়ার গাড়ীর ছাদ ফুড়ে বেরিয়ে গেলো। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান তাকে সপাসপ চাবুক মেরে গালিগালাজ করে।

এই ঘটনার পর শুধু বাঁশ-বোঝাই নয়, খরৈহিয়া সহর থেকে মাল বোঝাই করাও হিরামন ছেড়ে দিয়েছিলো। পুব নেপাল থেকে ফারবিসগঞ্জে মাল নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে গাড়ীটাই হাতছাড়া হোলো। কয়েক বছর হিরামন অন্যের গাড়ী ভাড়া নিয়ে নিজের বলদ দিয়ে কাজ চালায়। ভাড়ার অর্ধেকটা দিতো গাড়ীওয়ালাকে আর অর্ধেকটা নিতো সে নিজে বলদ দুটোর জন্যে। গাড়োয়ানীটা ফাউ। অর্ধেকটা যা পেতো তাতে বলদ দুটোরই পুরো খোরাক হোতো না। গত বছরই সে নতুন গাড়ী তৈরী করিয়েছে।

সার্কাস কোম্পানীর ঐ বাঘটার মা কালী যেন মঙ্গল করেন! গত বছর এই মেলায় বাঘের খাঁচাগাড়ীর বলদ দুটোই মারা যায়। চম্পানগর থেকে ফারবিসগঞ্জের মেলায় আসবার সময় সার্কাস কোম্পানীর ম্যানেজার গরুর গাড়ীর আড্ডায় ঢোল পিটিয়ে দেন: বাঘের খাঁচাগাড়ী যে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে একশো টাকা দেওয়া হবে। এক আধজন রাজীও হয়, কিন্তু তাদের গাড়ীর বলদরা বাঘের খাঁচাগাড়ী দেখে দশ হাত দূর থেকে ভয়ে ডাক ছাড়ে— বাঁঅাঁ! দড়ি ছিঁড়ে পালায়। হিরামন নিজের বলদ দুটোকে পিঠ চাপড়ে বলে, 'দেখ, এরকম মওকা আর পাবি না। গাড়ী তৈরী করার এমন সুযোগ ছাড়া চলবে না। নইলে আবার সেই ভাগের মা গঙ্গা পায় না…। বাঘতো খাঁচায় বন্ধ। তাকে আবার ভয় কি? পুব নেপালের জঙ্গলে বাঘকে তো ডাকতে শুনেছিস। আর আমি তো আছি-ই…।'

গাড়োয়ানরা সব হাততালি দিয়ে ওঠে। হিরামনের বলদ-দুটো আজ সবায়ের মুখ রেখেছে। সাহস করে বলদগুলো এগিয়ে যায়, একে একে খাঁচাগাড়ীতে জুতে যায়। শুধু ডান দিকের বলদটা জুতে যাবার পর প্রস্রাব করে ফেলে। হিরামন দু-দিন অবধি নাক থেকে পটিটা সরাতে পারেনি। বড় গদীর বড় শেঠজীর মতন নাকে কাপড় না বাঁধলে বাঘের গায়ের গন্ধ সহ্য করা সম্ভব নয়।

হিরামন বাঘের গাড়ীর গাড়োয়ানীও করেছে। কিন্তু কোনদিন তার পিঠে এই রকম সুড়সুড়ি লাগেনি। আজ যেন থেকে থেকে গাড়ীতে চাঁপা ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসে। পিঠে সুড়সুড়ি লাগলেই গামছা দিয়ে সে পিঠটা পুঁছে নেয়।

চম্পানগরের মেলার দেবী ভগবতী দু-বছর থেকে হিরামনের প্রতি খুব সদয়। গত বছর হিরামন বাঘ-গাড়ীর দরুন নগদ একশো টাকা বকশিশ আর সকলের বাহবা কুড়িয়েছে। এ ছাড়া রাস্তায় খাবার চা-বিস্কুটও। সারা রাস্তা নি-খরচায় বাঁদর-ভাল্লুক আর জোকারের তামাসা দেখেছে।

এবারে এক মেয়ে সোয়ারী। মেয়ে তো নয়—যেন চাঁপাফুল! যখন থেকে গাড়ীতে বসেছে তখন থেকেই গাড়ী গন্ধে ভুর ভুর করছে।

কাঁচা রাস্তার গর্তে গাড়ীর ডানদিকের চাকাটা বসে গিয়ে হেঁচকা লাগে। গাড়ীর ভেতর থেকে হালকা একটা আওয়াজ আসে, 'ইস'। ডানদিকের বলদটাকে পাঁচন বাড়ি দিয়ে দু'চার-ঘা কসিয়ে বলে : 'শালা, ভেবেছিস কি, বস্তা নিয়ে যাচ্ছি?'

'আহা মেরোনা।' অদেখা অজানা স্ত্রীলোকটির গলার আওয়াজ শুনে হিরামন একটু অবাক হয়ে যায়। শিশুদের মতন গলার আওয়াজ। গ্রামোফোনের সুরেলা মিষ্টি গলা।

মথুরা মোহন যাত্রাদলে লায়লা সাজে যে হীরাবাঈ, তার নাম কে না জানে। কিন্তু হিরামনের কথা আলাদা। সাত বছর

ধরে সমানে মেলায় জিনিষপত্তরের গাড়ী বোঝাই করেছে কিন্তু কোনোদিন যাত্রা-থিয়েটার বা বায়স্কোপ সিনেমা দেখে নি। লায়লা, হীরাবাঈ-র নামও সে শোনেনি—দেখার কথা না হয় বাদই দিলুম। মেলা ভাঙ্গার পনেরো দিন আগে মাঝ রাতে কালো চাদরে পা-থেকে মাথা অবধি ঢাকা স্ত্রীলোককে দেখে তার মনে অবশ্য একটা খটকা লেগেছিলো। বাক্স বয়ে এনেছিলো একটা চাকর। চাকরটি ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করায় স্ত্রী-লোকটি মাথা নেড়ে তাকে দর কষতে মানা করেছিলো। গাড়ীতে জোত লাগাতে লাগাতে হিরামন চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে, 'কি ভাই, চুরি-চামারির মালপত্তর নয় তো?' কোনো জবাব না দিয়ে হাত নেড়ে হিরামনকে গাড়ী হাঁকাবার ইসারা করে অন্ধকারে লোকটাকে গা ঢাকা দিতে দেখে হিরামনের আরও আশ্চর্য লাগে। মেলায় একটা বুড়ি দোক্তা বিক্রী করে। হিরামনের তার কালো শাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়। কি করে হিরামন গাড়ী হাঁকাবে।

একে তো পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে, তার ওপর তার গাড়ীতে চাঁপা ফুল ফুটে উঠেছে। বলদকে বকলে তার সোয়ারী আবার নিশপিশ করে ওঠে। ওরই সোয়ারী। স্ত্রীলোকটি একেবারে একা। দোক্তা বিক্রী করে যে বুড়ি সে ও নয়। গলার আওয়াজ শোনার পর থেকেই বারবার পেছন ফিরে ছাউনির মধ্যে নজর বুলিয়ে নেয় হিরামন। গামছা দিয়ে মাঝেমধ্যে পিঠটাও পুঁছে নেয়। তার কপালে এবার কি লেখা আছে ঈশ্বরই জানেন। পূব দিকে বাঁক নিতেই এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়ে গাড়ীতে। সোয়ায়ীর নাকের ওপর যেন একটা জোনাকী জ্বলে ওঠে। হিরামনের সব কিছুই রহস্যময় ও আজগুবি বলে মনে হয়। সামনে ধূ-ধূ করছে মাঠ চম্পানগর থেকে সিন্ধিয়া গ্রাম অবধি। কোনো ডাইনি পেত্নী নয় তো?

গাড়ীর মধ্যে হিরামনের সোয়ারী পাশ ফিরে বসে। চাঁদের

আলোয় মুখখানা দেখতে পেয়ে হিরামন চেঁচাতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। বাপরে, এ যে সাক্ষাত পরী!

পরী চোখ খোলে। হিরামন রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জোরে হ্যাট্, হ্যাট্ করে গাড়ী হাঁকায়। জিভটাকে তালুতে ঠেকিয়ে টি-টি-টি-আওয়াজ করে। কে জানে কখন হিরামনের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'ভাই, তোমার নাম কি?'

হুবহু সেই গ্রামোফোনের স্বর। হিরামনের গায়ে কাঁটা দেয়। মুখে কথা যোগায় না। বলদ দুটোও যেন কান খাড়া করে শোনে। 'আমার নাম···আমার নাম হিরামন।'

সোয়ারী একটু হাসলো। হাসিতেও যেন ফুলের সৌরভ।

'তাহলে তোমায় কিন্তু মিতে বলবো, ভাই নয়। আমার নামও হীরা।'

'ইস্!' একথা তো হীরামনের জানা ছিলো না। ছেলেদের আর মেয়েদের নামের মধ্যে তো তফাত হয়।

'হ্যাঁ গো, আমার নামও হীরাবাঈ।'

অনেক তফাত! কোথায় হিরামন আর কোথায় হীরাবাঈ।

হিরামন বলদ দুটোকে এক ধমক দেয়, 'কান খাড়া করে গল্প গিললেই কি তিরিশ ক্রোশ পথ পাড়ি দেওয়া যাবে? বাঁ দিকের বাঁটকুলটার পেটে পেটে সয়তানি!' হিরামন পাঁচন বাড়ি দিয়ে আস্তে এক ঘা মারে।

'তাড়া কিসের? মেরো না ওকে, আস্তে আস্তে যেতে দাও।'

হিরামনের মনে প্রশ্ন জাগে। হীরাবাঈকে গল্প করার সময় কি বলে ডাকবে। তুমি না আপনি? ওরা গুরুজনদের আপনি বলে ডাকে। এই রকম আদালতী ভাষায় তো দু' চারটে কথা বলা চলে, প্রাণ খুলে গল্প করা তো যায় না। গল্প করতে গাঁয়ের বুলিই ভালো।

আশ্বিন কার্তিক মাসে ভোরবেলার কুয়াশা হিরামনের মোটেই

ভালো লাগে না। অনেকবার সে রাস্তা ভুল করে ভুল পথে চলে গেছে। কিন্তু আজকের ভোরের কুয়াশায় সে তন্ময়। নদীর ধারে ধানের ঘন ক্ষেতের মধুগন্ধ হালকা হাওয়ায় ভেসে আসে। পাল-পার্বনের দিনেই শুধু এই রকম সুগন্ধ সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওর গাড়ীতে আবার চাঁপাফুলের উদয়। ফুলেতে এক পরী বসে আছে।...জয় ভগবতী!

আড়চোখে হিরামন দেখে নেয়, তার সোয়ারী—মিতা হীরাবাঈ, তার দিকে তাকিয়ে আছে। হিরামনের মনে এক অজানা সুর বেজে ওঠে। দেহে এক অদ্ভুত শিহরণ। জিজ্ঞেস করে, 'বলদদের পিটুলে বুঝি আপনার খারাপ লাগে?'

হীরাবাঈ পরখ করে নিলো হিরামন সত্যিই হীরের টুকুরো।

হিরামনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সুঠাম দেহ, কাল রং, দেহাতী যুবক। নিজের গাড়ি আর বলদ ছাড়া তুনিয়ার আর কিছুই সে জানে না। বড় ভাই, ক্ষেতের কাজ করে। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে। হিরামন দাদার চেয়ে বৌদিকে বেশী সম্মান করে। আবার তাঁকে ভয়ও করে। হিরামনেরও বিয়ে হয়েছিলো খুব ছোট-বেলায়, 'গৌনা' হবার আগেই বৌ মারা যায়। হিরামনের বৌ-এর চেহারাও মনে নেই। দ্বিতীয় বার বিয়ে?...দ্বিতীয় বার বিয়ে না করার অনেক কারণ আছে। বৌদির জেদ কুমারী মেয়ের সঙ্গেই দেওরের বিয়ে দেবেন। কুমারী মানে চার পাঁচ বছরের মেয়ে। কে আর 'সারদা এ্যাকট্' মানছে। দোজবরেকে দায়ে না পড়লে কোনো বাপই মেয়ে দেয় না। বৌদি তিন সত্যি করেছিলেন, আজও সেই একই দিব্যি গেলে বসে আছেন। বৌদির সামনে দাদাও কিছু বলতে পারে না। হিরামনও ঠিক করে নিয়েছে, সে আর বিয়ে করবে না। এই বয়সে আবার কে আপদ বালাই ঘাড়ে নেয়। বিয়ে করলে গাড়োয়ানী করবে কি করে। হিরামন সব ছাড়তে রাজী, কিন্তু গাড়োয়ানী নয়।

হিরামনের মতো দৃঢ়চেতা মানুষ হীরাবাঈ এর আগে কখনও

দেখেনি। জানতে চায় হিরামন, 'আপনার দেশ কোথায়?' কানপুরের নাম শুনে এতো জোরে হিরামন হেসে উঠলো যে বলদ দুটো ভড়কে যায়। হিরামন মাথা নীচু করে হাসছিলো। হাসি থামলে বলে, 'বাহারে! কানপুর, তাহলে নিশ্চয় নাকপুর নামেও কোনো জায়গা থাকবে।' আর হীরাবাঈ-এর কাছে যখন শুনলো যে নাকপুরও আছে, তখন হেসে কুটি-কুটি, 'বাহারে দুনিয়া! কেমন ধারা সব নাম—কানপুর, নাকপুর!'

হিরামন হীরাবাঈ-এর কানের ফুল দুটো খুঁটিয়ে দেখলো। নাকের দিকে চোখ পড়তেই নাকচাবির পাথর দেখে শিউরে ওঠে—যেন একবিন্দু রক্ত।

হীরাবাঈ-এর নাম হিরামন আগে কখনও শোনেনি। যাত্রাদলের মেয়েদের সে বাঈজী মনে করে না। ও কোম্পানীতে কাজ করা মেয়েদের দেখেছে। সার্কাস কোম্পানীর মালিকের স্ত্রী তাঁর দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে বাঘের খাঁচাগাড়ীর কাছে আসতেন। বাঘকে খেতে দিতেন, আদর করতেন। হিরামনের বলদ দুটোকেও তাঁর বড় মেয়ে পাঁউরুটি বিস্কুট খাইয়েছিলো।

কুয়াশা কেটে যেতেই হিরামন নিজের চাদরটা ছাউনির সামনে পর্দার মতন করে খাটিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ও খুব হুঁসিয়ার। হীরাবাঈকে বলে, 'আর মাত্তর দু'ঘণ্টা। তারপর রাস্তা দিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার। কার্তিক মাসের সকালের রোদ আপনি সহ্য করতে পারবেন না। কজরী নদীর পারে তেগাছার ধারে গাড়ী বাঁধবো। দুপুর পার করে…।'

সামনের দিক থেকে গাড়ী আসতে দেখে সতর্ক হয়ে যায়। বলদ দুটোকে দেখে নিয়ে দড়িটাকে হাতে ঠিক করে নেয়। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় অন্য গাড়ীর গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করে, 'কি, মেলা শেষ হয়ে গেলো?'

হিরামন ঘাড় নাড়ে, জানে না। তার গাড়ীতে কনে বৌ যাচ্ছে। হিরামন একটা গ্রামের নাম করে দেয়।

'ছত্তাপুর পচীরা কোথায় ?'

'যেখানেই হোক না কেন, তা' জেনে আপনি কি করবেন ?' বলেই হিরামন মনে মনে নিজের চালাকির তারিফ করে হাসে। পর্দা টাঙানো সত্ত্বেও ওর পিঠে সুড়সুড়ি লাগে।

পর্দার ফুটো দিয়ে হিরামন দেখতে পায় হীরাবাঈ দেশলায়ের খাপের মতন একটা আয়নাতে নিজের দাঁত দেখছে। মদনপুরের মেলায় একবার হিরামন বলদ দুটোর জন্যে ছোট ছোট সাদা কড়ির মালা কিনেছিলো। দাঁতগুলো যেন সেই রকম ছোট ছোট কড়ির সারি।

তেগাছার তিনটে গাছই দূর থেকে দেখা যায়। হিরামন পর্দাটা একটু সরিয়ে দিয়ে বললো, 'ঐ দেখুন, ঐটাই তেগাছা। দুটো জটাধারী বটগাছ আর একটা...ঐ যে কি ফুল বলে ? যে ফুল আপনার জামায় লুকোনো আছে—সেই ফুলের গাছ। খুব গন্ধ, দু' ক্রোশ দূর থেকেও গন্ধ পাওয়া যায়। ঐ ফুল খৈনিতে মিশিয়েও তো লোকে খায়।'

'আচ্ছা, ঐ আম গাছের ফাঁক দিয়ে যে বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি কোনো গ্রাম না মন্দির ?'

হিরামন একটা বিড়ি বার করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বিড়ি খেলে আপনার কোনো অসুবিধে হবে নাতো ?...ওটাই হচ্ছে নামলগর দেউড়ি। আমরা যে মেলা থেকে আসছি, ওই দেউড়িটা সেই মেলার যে রাজা তার সৎ মায়ের।...দিন কাল তখন অন্য রকম ছিলো।' 'অন্য রকম ছিলো' কথাটা হিরামন একটু রসিয়ে বললো।

হীরাবাঈ পর্দার এক দিক টেনে তেরচা করে গুঁজে দেয়।

'কোন সময়ের কথা ?' চিবুকের তলায় হাত রেখে হীরাবাঈ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

'নামলগর দেউড়ির সময়কার কথা। কি ছিলো আর দেখতে দেখতে কি হোলো।'

হিরামন বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে জানে।

'তুমি কি সেই সব দিনকাল দেখেছো ?'

'দেখিনি, কিন্তু শুনেছি।···রাজত্ব কি করে গেলো জানেন?' হিরামন বলে চলে, 'সে এক উৎপীড়ন আর অত্যাচারের কাহিনী। শোনা যায় রাজবাড়ীতে এক দেবতার জন্ম হয়। আপনি বলুন না, দেবতা দেবতাই, তাই নয়? ইন্দ্রাসন ছেড়ে মর্ত্যে জন্ম নিয়ে এলেও তেজ যাবে কোথায়, আর সে তেজ সামলাবেই বা কে? সূর্যমুখী ফুলের মতন মুখ। পোড়া চোখে কেউ তা' দেখতে পায়নি। তাকে কেউ চিনতে পারেনি। একবার লাটসাহেব স্বস্ত্রীক উড়োজাহাজে করে ওখানে এসেছিলেন। লাটসাহেবও চিনতে পারেন নি—চিনেছিলো শুধু তাঁর স্ত্রী। সূর্যমুখীর মতন মুখ দেখে রাজাকে উদ্দেশ্য করে ইংরিজি ভাষায় বলে উঠেছিলেন, এই ম্যান, রাজাসাহেব, শোনো, এ মানব সন্তান নয়, দেবতা।'

লাটসাহেবের স্ত্রীর কথার নকল করতে গিয়ে হিরামন 'ডৈম, ফৈট, লৈট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। হাসি চাপতে না পেরে হীরাবাঈ হো হো করে হেসে ওঠে।···হাসবার সময় তার সমস্ত শরীর দুলে ওঠে। দেহে একটা হিল্লোল খেলে যায়।

হীরাবাঈ ওড়নাটা ঠিক করে নেয়। হিরামনের মনে হোলো··· ।

'তারপর মিতা ?'

'ইস্-স, গল্প শুনতে বড্ড ভালবাসেন দেখছি! কিন্তু কালো চামড়ার লোক, রাজাই হোক আর মহারাজাই হোক্, কালো আদমী তো। সায়েবদের মতো বুদ্ধি পাবে কোথায়? কথাটা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলো। দেবতা রাণীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার সেবা না করলে আমি আর এখানে থাকবো না। এরপরই সুরু হোলো দেবতার খেলা। প্রথমে হাতী দুটো মরলো। তারপর ঘোড়া, তারপর পটপটাঙ্গ···।'

'পটপটাঙ্গ, সে আবার কী ?'

হিরামনের মনের গতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। নানা রঙের ছোঁয়ায়

মন দুলে দুলে ওঠে।…গাড়ীতে মনে হয় যেন এক দেবী বসে আছে। দেবী তো দেবী-ই।

'পটপটাঙ্গ! ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, গাই-বাছুর, পটপট করে সব সাফ্! দেবতা স্বর্গে ফিরে গেলেন।'

দূরে একটা মন্দির মিলিয়ে যায়, তার দিকে তাকিয়ে হীরাবাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'দেবতা যাবার সময় বলে যান, এই রাজার বাড়ীতে পুত্রসন্তান এক ছাড়া দুই কখনও হবে না। ধনসম্পত্তিও সব সঙ্গে নিয়ে গেলেন দেবতা। রেখে গেলেন শুধু বিদ্যেবুদ্ধি। দেবতার দেখাদেখি সমস্ত দেবদেবীও চলে গেলেন। রইলেন শুধু মা সরস্বতী। এটা তাঁরই মন্দির।'

দিশী ঘোড়ার পিঠে পাটের বোঝা চাপিয়ে বেনেদের আসতে দেখে হিরামন পেছনের পর্দাটা ফেলে দেয়। বলদ দুটোর ল্যাজে একটু মোচড় দিয়ে হিরামন সরস্বতীর বন্দনা সুরু করে, 'জৈ মৈয়া সরোসতি, অরজী করত বানী, হমারা পর হোখু সহাঈ হৈ মৈয়া, হমারা পর হোখু সহাঈ।' (অর্থাৎ হে মা সরস্বতী, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, তুমি সব সময় আমার সহায় থেকো।)

ঘোড়ার পিঠে মাল নিয়ে বেনেদের যেতে দেখে হিরামন উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি দরে পাট কেনা হোলো?' খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে যে বেনে যাচ্ছিলো হিরামনের প্রশ্নের সেই-ই উত্তর দেয়, 'নীচে সাতাশ আটাশ টাকা আর ওপরে তিরিশ, যেমন মাল তেমনি দাম।'

বেনেদের মধ্যে এক যুবক প্রশ্ন করে ওঠে: 'মেলার হালচাল কি রকম ভাই? কোন যাত্রাদল এবার যাত্রা করছে, রোতা কোম্পানী না মথুরামোহন?'

'মেলার খবর মেলার লোকেই জানে,' বলে হিরামন আবার সেই ছত্তাপুর-পচীরা গ্রামের নাম করে।

সূর্য তখন মাথার ওপর। হিরামন বলদ দুটোর সঙ্গে কথা সুরু

করে দেয়, 'আর এক ক্রোশ পথ, মনের জোর করে চল্, এখন্ তেষ্টা পাবার কথা। মনে আছে, সেবার তেগাছার কাছে সার্কাস কোম্পানীর জোকার আর বাঁদর নাচাতো যে সায়েব তাদের দুজনের ঝগড়ার কথা। জোকার ঠিক বাঁদরদের মতন মুখ ভেঙচিয়ে ক্যাচাকেচি করেছিলো।···না জানি কত দেশ থেকে কত রকমের লোকই আসে।'

পর্দার ফুটো দিয়ে হিরামন দেখলো হীরাবাঈ একটা কাগজের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হিরামনের মনে আজ থেকে থেকে একটা হাল্কা সুর বেজে উঠছে। মনে নানা গানের কলি ভেসে আসে। বিশ পঁচিশ বছর আগে বিদেশীয়া, বলবাহী ছোকরা নাচ ইত্যাদি যারা নাচতো তারা সেরা গজল-খেমটা গানও গাইতো, আজকাল গ্রামোফোনের লোকেরা কিসব গানই না গায়। হায়রে, কি দিনই এলো। ছোকরা নাচের গানের কলি হিরামনের মনে পড়ে ঃ

সজনবা বৈরী হো গয়ে হমারা! সজনবা···
অরে, চিঠিয়া হো তো সব কোঈ বাঁটে, চিঠিয়া হোতো···
হায় করমবা, হোয়, করমবা···
কোঈ না বাঁটে হমারো সজনবা···হো করমবা···

(অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পর হয়ে গেছে, চিঠির ভাষা সবাই তো পড়ে বুঝতে পারে কিন্তু হায়রে কপাল, আমার প্রিয়তমের মন কেন বিরূপ হোলো সে কথা কে আমায় বুঝিয়ে দেবে)

গাড়ীর বাঁশেতে আঙ্গুল দিয়ে তবলার ঠেকা দিতে দিতে হিরামন গানটা শেষ করে। ছোকরা নাচের মহুয়া বলে যে নাচিয়ে ছিলো তাকে দেখতে অনেকটা হীরাবাঈ-এর মতন। কোথায় গেলো সে সব দিনকাল! প্রত্যেক মাসে গ্রামেতে নাচের দল আসতো। যে কদিন ছোকরার নাচ চলেছিলো, সে ক'দিন হিরামনকে রোজই বৌদির কাছে কিছু না কিছু কথা শুনতে হোতো। দাদাও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো।

হিরামনের মনে হচ্ছে আজ মা সরস্বতী তার প্রতি সদয়। হীরা-বাঈ বললো, 'বা, কেমন সুন্দর তুমি গান গাও।'

লজ্জায় হিরামনের মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখটা নীচু করে হাসতে থাকে।

তেগাছার মহাবীর স্বামীও যেন আজ হিরামনের সহায়। তেগাছার নীচে আজ একটাও গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই। গাড়ী আর গাড়োয়ানের ভিড় এখানে সব সময় লেগেই থাকে। কেবল একজন সাইকেল-ওয়ালা বিশ্রাম করছিলো। মহাবীর স্বামীকে মনে মনে স্মরণ করে হিরামন গাড়ী থামালো। হীরাবাঈ পর্দাটা সরাতে যাচ্ছিল, হিরামন চোখের ইসারায় জানিয়ে দিলো যে সাইকেলওয়ালা এক দৃষ্টে ওই দিকেই তাকিয়ে আছে।

বাঁশের ঠেকনো দিয়ে গাড়ীটাকে দাঁড় করিয়ে বলদ দুটোকে হিরামন খুলে দিলো। তারপর বেশ কয়েকবার সাইকেলওয়ালার দিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাবে? মেলায়? কোত্থেকে আসা হচ্ছে? বিসনপুর থেকে? ব্যাস্ এইটুকু পথ এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো?...বারে মরদ!'

সাইকেলওয়ালা রোগাপাতলা ছোকরা। মিন মিন করে কি সব বলে একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠে পড়লো।

হীরাবাঈকে সবায়ের নজর বাঁচিয়ে রাখতে চায় হিরামন। তাই চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো আশেপাশে কোনো গাড়ী ঘোড়া আছে কিনা।

তেগাছার কাছে কজরী নদী সুরু হয়ে এসে বিসনপুরের দিকে ঘুরে গেছে। নদীর জলেতে অনেকগুলো মোষ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের পিঠের ওপর অনেকগুলো সারস পাখী বসে আছে। হীরা-বাঈ তা দেখছিলো।

হিরামন বললো, 'যান, ঘাটে গিয়ে মুখ হাত-পা ধুয়ে আসুন।'

হীরাবাঈ গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। হিরামনের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। না, না, দেখছি পা সোজাই, বাঁকা নয়। কিন্তু

পায়ের তলা এতো লাল কি করে হোলো ? মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে গাঁয়ের মেয়ে-বৌদের মতন হীরাবাঈ ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলো। কে বলবে যে যাত্রাদলের মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ নয়, মেয়ে। কুমারীও হতে পারে।

হিরামন গাড়ীতে উঠে বসলো। ছাউনীর ভেতরটা উঁকি মেরে দেখে নিলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার হীরাবাঈ-এর তাকিয়ায় হাত রাখে। তারপর তাকিয়ার ওপর কনুই রেখে একটু হেলান দেয়। এবার পুরোপুরি হেলান দিয়েই বসলো। সারা দেহে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তাকিয়ার ওয়াড়ে ছুঁচের কাজ করা ফুলগুলোর ওপর দিয়ে আঙ্গুল বুলিয়ে নেয়, শোঁকে, আঃ! এতো গন্ধ ফুলগুলোয়। হিরামনের মনে হোলো পাঁচ ছিলিম গাঁজা খেয়ে সে নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে। হীরাবাঈ-এর ছোটো আয়নাটায় সে নিজের মুখ দেখে নিলো। চোখছুটো এতো লাল হয়েছে কেন ?

হীরাবাঈ ফিরতেই সে হেসে বললো, 'এইবার আপনি গাড়ী পাহারা দিন, আমি এই এলুম বলে।'

হিরামন নিজের ঝোলা থেকে কাচা গেঞ্জী বার করলো। গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে হাতে বালতি নিয়ে ঘাটমুখো হোলো। বলদ ছুটো শব্দ করে ওকে যেন কিছু বলে। হিরামন যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তেষ্টা সবায়েরই পেয়েছে, ফিরে এসে ঘাস দোব। বদমাইসি কোর না।'

বলদ ছুটো কান নাড়লো।

হিরামন কখন যে চান করে ফিরেছে, হীরাবাঈ তা জানতে পারে নি। সারারাত জেগে থাকার ক্লান্তি—কজরী নদীর ধারা দেখতে দেখতে চোখ ছুটি তার ঘুমে জড়িয়ে আসে। পাশের গাঁ থেকে হিরামন জলখাবারের জন্যে দই, চিঁড়ে, চিনি নিয়ে এলো।

'উঠুন, ঘুম থেকে উঠুন, একটু জল খাবার খেয়ে নিন।'

হীরাবাঈ চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখে। এক হাতে একটা

নতুন বাসনে দই আর কলার পাতা, অন্য হাতে এক বালতি জল, চোখে আত্মীয়ের অনুরোধ।

'এতো সব নিয়ে এলে কোত্থেকে?'

'এই গাঁয়ের দই-এর খুব নাম আছে। ফারবিসগঞ্জের আগে চা পাওয়া যাবে না।'

'তুমিও পাতা নাও,' হীরাবাঈ বললো।

'কেন?'

'তুমি যদি না খাও তো সব থলিতে পুরে রাখো, আমিও খাবো না।'

'ইস্-স!' হিরামন একটু লজ্জা পেয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আগে আপনি খেয়ে নিন্।'

'আগে পরে কেন? তুমিও একসঙ্গে খেয়ে নাও।'

হিরামনের প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। হীরাবাঈ নিজে হাতে পাতা পেতে জল ছিটিয়ে চিঁড়ে দিয়ে দিলো। ইস্! হিরামনের মনটা ধন্য ধন্য করে উঠলো। তার মনে হোলো যেন স্বয়ং দেবী ভগবতী তাকে জল খাবার গুছিয়ে দিচ্ছেন। লাল টুকটুকে ঠোঁটে প্রশান্তির হাসি।…পাহাড়ী টিয়াকে কখনও দুধ ভাত খেতে দেখেছো? দুপুর গড়িয়ে গেলো।

ছাউনির ভেতর হীরাবাঈ আর রাস্তায় সতরঞ্চি বিছিয়ে হিরামন শুয়ে পড়লো। দুজনের একসঙ্গেই ঘুম ভাঙ্গে।…মেলায় যাবার গাড়ীগুলো তেগাছার কাছাকাছি এসে থেমেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

হিরামন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। ছাউনির ভেতর উঁকি মেরে ইসারায় বললো, দিন গড়িয়ে গেছে। অন্য গাড়োয়ানদের কথার কোন জবাব না দিয়ে হিরামন বলদ দুটোকে গাড়ীতে জুতে দিলো। গাড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে বললো, 'সিরপুর হাসপাতালের ডাক্তারনী। রোগী দেখতে যাচ্ছেন। কাছেই কুড়মা গাঁয়ে।'

ছত্তাপুর—পচিরার নাম হীরাবাঈ ভুলে গেছিলো। গাড়ীটা একটু দূরে যেতেই হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'পত্তাপুর ছপিরা!'

হাসতে হাসতে হিরামনের পেটে খিল ধরে যায়। 'পত্তাপুর ছপিরা', বলে হিরামন হো হো করে হেসে উঠলো। 'ওরা যে ছত্তাপুর-পচিরারই গাড়োয়ান, ওদের কি কয়ে বলবো।' বলেই হি হি করে হেসে ফেলে।

হীরাবাঈ মুচ্‌কি হেসে গ্রাম দেখতে থাকে। রাস্তাটা তেগাছিয়া গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পর্দা দেওয়া গাড়ী দেখে তালি দিতে দিতে ছড়া কাটতে লাগলো ঃ

লালী লালী ডোলিয়া মে
লালীরে দুলহিনিয়া পান খায়ে…।

হিরামন হাসলো। নববধূ…লাল পাল্কীতে। নববধূ পান খেয়ে বরের পাগড়ীতে মুখ মোছে। ওহে নববধূ, তেগাছিয়া গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কথা মনে রেখো। ফেরার সময় আমাদের জন্যে গুড়ের নাড়ু নিয়ে এসো। তোমার স্বামীর যেন হাজার হাজার বছর পরমায়ু হয়…।

অনেক দিনের একটা সাধ হিরামনের আজ মিটলো। না জানি এই রকম কত শত স্বপ্নই না সে দেখেছিলো।…সে যেন নিজের বউকে নিয়ে ফিরছে আর গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তালি বাজিয়ে গান গাইছে। গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা উঠোনে বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখছে। পুরুষরা জিজ্ঞেস করছে, কোথাকার গাড়ী, কোথায় যাচ্ছে। ওর বৌ পাল্কীর পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। আরও কত শত স্বপ্ন…।

গ্রাম ছাড়িয়ে এসে একবার আড়চোখে হিরামন ছাউনির ভেতরটা দেখে নিলো। দেখতে পেলো, হীরাবাঈ চিন্তায় মগ্ন। হিরামনও কিছু একটা ভাবতে ভাবতে খানিক পরে গুনগুন করে গান ধরে ঃ

সজনরে ঝুট মাত বোলো
খুদাকে পাস জানা হৈ।

নহীঁ হাথী, নহীঁ ঘোড়া, নহীঁ গাড়ী···
ওহাঁ পৈদলহী জানাহৈ। সজনরে···

(অর্থাৎ হে আমার প্রিয়, মিথ্যে বোলো না। খোদার কাছে সবাইকে যেতে হবে। সেখানে হাতী,. ঘোড়া, গাড়ী কিছুই যাবে না, হেঁটেই যেতে হবে, হে আমার প্রিয়···)

হীরাবাঈ শুধায়, 'মিতা, তোমার নিজের ভাষার কোনো গান জান না ?'

হিরামন এখন দ্বিধাহীনভাবেই হীরাবাঈর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। ভাবে, কোম্পানীর মেয়েছেলেরাও এমনি হয়। সার্কাস কোম্পানীর মালিক তো মেমসাহেব ছিলো। হীরাবাঈ গাঁয়ের ভাষায় গান শুনতে চাইছে। হিরামন হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'গাঁয়ের ভাষা কি আপনি বুঝতে পারবেন ?'

'হুঁ' বলে হীরাবাঈ ঘাড় নাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে কানের ঝুমকোও তুলে উঠলো।

এরপর কিছুক্ষণ হিরামন চুপচাপ বলদ দুটোকে হাঁকাতে থাকে। বলে, 'সত্যিই গান শুনতে চান ? না শুনে ছাড়বেন না ? ইস্-স ! দেহাতী গান শোনার এত সখ আপনার ? গান গাইতে গেলে রাস্তা ছাড়তে হবে। যাতায়াতের রাস্তা দিয়ে কি করে গান গাইতে গাইতে যাবো ?' বাঁয়ের বলদটার দড়িটা জোরে টেনে ধরে হিরামন ডাইনের বলটাকে রাস্তা থেকে নাবিয়ে নিয়ে বলে, 'তাহলে আর হরিপুর হয়ে যাবো না।'

পাকা রাস্তা ছাড়তে দেখে পেছনের গাড়োয়ান চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে ওঠে, 'কেন হে ভায়া, তুমি সোজা রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলে কেন ?'

উত্তরে হিরামন হাওয়ায় পাঁচনবাড়িটা ঘুরিয়ে জবাব দিলো, 'অন্য পথে গেলুম কোথায় ? ঐ রাস্তাটাতো আর ননপুর যাবে না।' তারপর বিড়বিড় করতে লাগলো, 'এখানকার লোকেদের এই অভ্যেসটাই খারাপ। পথ চলতে চলতে হাজারোটা প্রশ্ন করবে।

আরে বাবা, তোমার যেতে হয় ঐ পথ দিয়ে যাও।···যতসব গেঁয়ো ভূত !'

ননন্‌পুরের রাস্তায় গাড়ীকে ঘুরিয়ে নিয়ে হিরামন বলদদের দড়ি আলগা করে দিলো। বলদ দুটো জোরে পা চালানো বন্ধ করে দিয়ে ঢিমে তালে চলতে লাগলো।

হীরাবাঈ দেখে ননন্‌পুরের রাস্তা সত্যিই ফাঁকা। হীরাবাঈ যে ভয় পেয়েছে তা বুঝতে পেরে হিরামন বলে, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই রাস্তাটাও ফারবিসগঞ্জে গিয়েছে, রাহাঘাটের লোকেরাও খুব ভালো। রাত একটার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো।'

হীরাবাঈ-এর ফারবিসগঞ্জে পৌঁছনোর তেমন কোনো তাড়া নেই। হিরামনের ওপরেও তার এতো বিশ্বাস যে ভয়ডরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হিরামন মনের আনন্দে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো। কোন গানটা গাইবে তাই ভাবতে থাকে। হীরাবাঈ-এর কথা ও সুর দুয়েতেই আগ্রহ আছে···মহুয়া ঘাট-মাঝির গান? 'আচ্ছা, আপনার যখন এতই সখ তাহলে শুনুন, মহুয়া-ঘাট মাঝির গানটা। এর কথা ও সুর দুইই খুব সুন্দর।'

···কতদিন পরে দেবী ভগবতী তার এ মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ করলেন। জয় ভগবতী! আজ হিরামন মনটা হাল্কা করে নেবে। সে হীরা-বাঈ-এর হাসিমাখা মুখখানা দেখতে থাকে।

'শুনুন, পরমান নদীতে আজও মহুয়া-ঘাট মাঝির নামে পুরনো ঘাট আছে। মহুয়া সেখানকারই মেয়ে। পেশায় যদিও ঘাট-মাঝি ছিলো, তাহলেও খুব গুণের মেয়ে। বাপ তার দিনরাত তাড়ি আর মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো। সৎ মা তার সাক্ষাৎ রাক্ষসী। যেমন চালাক তেমনি ধূর্ত। রাতে যারা গাঁজা আফিম আর মদের চোরাকারবার করতো তাদের সঙ্গে তো বটেই, এছাড়া আরও কত লোকের সঙ্গে যে তার যোগসাজশ ছিলো, তা বলার নয়। সবায়ের সঙ্গেই তার বেশ দহরম-মহরম। মহুয়া ছিলো কুমারী। কিন্তু কাজ করিয়ে করিয়ে সৎ মা ওর অস্থি-চর্ম সার করেছিলো। বিয়ের বয়স

হলেও বিয়ের কোনো কথাবার্তা ওর রাক্ষসী মা তোলে না। এক রাতের ঘটনা আপনাকে শোনাই।'

হিরামন আস্তে আস্তে গুনগুনিয়ে গলাটা সেধে নিলো :

হে-অ-অ-অ সাবনা ভাদবা কে-র-উমড়ল নদিয়া
মৈ-য়া ও-ও, মৈয়ো
গেরৈনি ভয়াবনি-হে-এ-এ-উ, তড়কা-তড়কে
ধড়কে করেজ-আ-আ-
মোরা কি হুমহু যে বারি-নান্হী রে-এ-এ······

অর্থাৎ, ওমা, শাবন ভাদরের ভরা নদী উঠছে পড়ছে, ভয়াবহ রাত, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি ছোট মেয়ে, ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করছে। কি করে একলা ঘাটে যাবো? সেও এক বিদেশী যাত্রীর পায় তেল মাখাতে। সৎ-মা তার শক্ত বাজের মতন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আকাশে ভীষণ মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মহুয়া তার মৃত মায়ের কথা মনে করে কাঁদতে থাকে। আজ তার মা থাকলে এই দুঃসময়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেন। মাগো, এর জন্যেই কি তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলে? মহুয়ার মার ওপর অভিমান হয়, মা কেন ওকে নিয়ে মরলো না, মাকে দুষতে থাকে।

হিরামন খুব দরদ দিয়ে গান সুরু করলো :

হুঁ-উঁ-উঁ-রে ডাইনিয়াঁ মৈয়োঁ মোরী-ঈ-ঈ,
নোন্ওয়া চটাই কাহে নহি
মারলি সাঁরী ঘর-অ-অ। এহি দিনবা
খাতির ছিনরো হিয়া
তেহুঁ পোসলি কি নেনু-দুধ-উটগন···।

অর্থাৎ, আমার ডাইনী মা, তুই আঁতুরে আমাকে নুন গিলিয়ে কেন মেরে ফেলিসনি। ওরে দুশ্চরিত্রা, এই দিন দেখতে হবে বলেই কী তুই আমায় এতো আদরে মানুষ করেছিলি?

গান গাইতে গাইতে হিরামন একটু দম নিয়ে বললো, 'ভাষা কিছু বুঝলেন, না, শুধু গানই শুনছেন ?'

হীরাবাঈ জবাব দেয়, 'বুঝতে পারি। উটগন মানে সর-ময়দা তো—যা গায়ে মাখা হয় ?'

হিরামন আশ্চর্য হয়ে বললো, 'ইস্-স্...। তা কান্নাকাটি করে আর কি হবে, সওদাগর তো মহুয়ার পুরো দামই চুকিয়ে দিয়েছিলো। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নৌকোয় উঠিয়ে মাঝিকে হুকুম দিলো, নৌকো খোলো, পাল তোলো। পাল তোলা নৌকো পাখীর মতন উড়ে চললো। সারারাত মহুয়া কান্নাকাটি করলো। সওদাগরের চাকর বাকরেরা মহুয়াকে ধমকালো, ভয় দেখালো—চুপ কর, তা নইলে জলে ফেলে দেবো। মহুয়ারও কথাটা মনে ধরলো। ভোরের তারা মেঘের আড়াল থেকে একবার উঁকি মেরে আবার লুকিয়ে পড়লো। আর মহুয়াও ঝপাং করে জলে ঝাঁপ দিলো।...সওদাগরের এক চাকর মহুয়াকে দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। মহুয়ার সঙ্গে সেও জলে ঝাঁপ দিলো। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা সোজা নয়, তায় আবার ভাদ্র মাসের ভরা নদী। মহুয়া জাত মাঝি। মাছও জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু মহুয়া পুঁটি মাছের মতন ফরফরিয়ে জল কাটতে কাটতে ছুটে পালায়। আর তার পেছনে সওদাগরের চাকর থেমে থেমে বলতে থাকে—মহুয়া, একটু থামো, আমি তোমায় ধরতে যাচ্ছি না, আমি তোমার সাথী। আজীবন তোমায় সঙ্গ দেবো। কিন্তু...।'

হিরামন-এর এ গানটা বড় প্রিয়। মহুয়া ঘাটমাঝির গান গাইতে গাইতে তার চোখের ওপর শ্রাবণ ভাদ্রমাসের ভরা নদী ভেসে ওঠে, অমাবস্যার রাত আর ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বিদ্যুতের সেই আলোতে হিরামন যেন সেই বারিকন্যা মহুয়াকে ঢেউ-এর সঙ্গে যুঝতে দেখে। মহুয়াকে আরো তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে দেখে তার মনে হয় যেন সেই সওদাগরের চাকর। মহুয়া কিছু শোনে

না। কিছু অনুভব করে না। ফিরেও তাকায় না। আর সে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এইবার তার মনে হয় যেন মহুয়া নিজেকে ধরা দিয়েছে। নিজেই ধরা দিয়েছে। সে যেন মহুয়াকে ধরে ফেলেছে, তাকে আপন করে পেয়েছে, তার সব ক্লান্তি মুছে গেছে। গত পনেরো কুড়ি বছর ধরে ভরা নদীর উল্টো স্রোতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আজ যেন তার মন কিনারায় এসে ঠেকেছে। আনন্দ অশ্রু আজ আর বাধা মানতে চায় না।

হীরাবাঈ-এর সামনে চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু হীরাবাঈ সবই বুঝতে পারে। হিরামনের গলা ধরে আসে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলদ দুটোকে বকে ওঠে···'না জানি কি মাদকতা আছে এই গানটায়। শুনলেই দুটোতে একবারে থমকে যায়। হঠাৎ যেন কেউ ঘাড়ে একশো মন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।'

হীরাবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হিরামনের দেহমন আনন্দে নেচে ওঠে।

'মিতা, তুমি তো দেখছি গানে একেবারে ওস্তাদ।'

'ইস্-স।'

বেলা পড়বার আগেই আশ্বিন-কার্তিক মাসের রোদ যেন মিইয়ে যায়। সূর্য ডোবার আগেই ননন্‌পুর পৌঁছুতে হবে। তাই হিরামন বলদ দুটোকে বুঝিয়ে বলতে থাকে, 'একটু পা চালিয়ে আর বুক বেঁধে চল, বাপ !···এ···ছিঃ···ছিঃ। এগো বাপু। হ্যাট্, হ্যাট্, হ্যাট্।'

ননন্‌পুর পর্যন্ত সে এইভাবেই বলদ দুটোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। প্রত্যেক হাঁকের সঙ্গে হিরামন বলদ দুটোকে পুরনো ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

'মনে নেই চৌধুরীর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রীদের কতগুলো গাড়ী ছিলো, সব কটাকে কি রকম হারিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সেই চালেই চলতো দেখি! লে-লে-লে। ননন্‌পুর থেকে ফারবিসগঞ্জ তো তিন কোশ পথ। আর তো দু ঘণ্টার মামলা।'

ননন্‌পুরের হাটে আজকাল চা-ও কিনতে পাওয়া যায়। হিরামন নিজের ঘটীতে চা নিয়ে এলো। কোম্পানীর স্ত্রীলোকদের সে চেনে। তারা সারাদিন ধরে মিনিটে মিনিটে চা খায়। চা অন্ত প্রাণ তাদের। হীরাবাঈ হেসে লুটোপুটি খায়, 'আরে, তোমাকে একথা কে বলেছে, আইবুড়ো ছেলেদের চা খেতে নেই?'

হিরামন লজ্জা পায়। সে আর কি বলবে। লজ্জারই কথা। কিন্তু তার একবার শিক্ষা হয়ে গেছে। সার্কাস কোম্পানীর মেমের হাতের চা খেয়ে সে বুঝেছিলো, চায়ে শরীর বড় গরম হয়ে যায়।

'গুরুজী, একটু খান,' বলে হীরাবাঈ হাসলো।

'ইস্‌-স।'

ননন্‌পুর হাটে আগেই সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠেছে। হিরামন এগোতে হবে বলে হ্যারিকেনটা জ্বেলে গাড়ীর পেছনে ঝুলিয়ে দিলো। আজকাল সহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে যারা থাকে তারাও নিজেদের সহুরে মনে করে। আলো জ্বালিয়ে না চললে শুধু শুধু ধরে চালান দেয়, নানান ঝঞ্ঝাটে ফেলে।

'আপনি আমাকে গুরুজী বলবেন না।'

'তুমি আমার ওস্তাদ। শাস্ত্রে আছে, একটা অক্ষরও যে শেখায় সে গুরু আর যে রাগ শেখায় সে ওস্তাদ।'

'ইস্‌-স! শাস্তোর পুরাণও জানেন দেখছি।...আমি আবার কি শেখালাম? আমি কি...?'

হীরাবাঈ হেসে গুনগুনিয়ে উঠলো—হে-অ-অ-অ সাবনা-ভাদওয়া কে-র...। শুনে হীরামনের মুখে আর কথা সরে না।...ইস্‌-স এতো ভালো স্মরণশক্তি। হু-ব-হু মহুয়া ঘাট মাঝি।

গাড়ী শুকিয়ে-যাওয়া সীতাধার নদীর উৎরাই দিয়ে গড়গড়িয়ে নেমে যায়। হীরাবাঈ হিরামনের কাঁধটা একহাতে ধরে ফেলে। বেশ খানিকক্ষণ হাতটা হিরামনের কাঁধেই থাকে। হিরামন অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। গাড়ী চড়াই-এর মাথায় উঠতেই হীরাবাঈ আবার কাঁধটা শক্ত করে চেপে ধরে।

সামনে ফারবিসগঞ্জ সহরের আলো ঝিলমিল করছে। সহর পেরিয়ে খানিক দূরেই মেলার আলো। ছাউনির হ্যারিকেনের আলোয় চারিপাশের ছায়াগুলো একটা অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করেছে। চোখে যখন জল ভরে আসে, তখন দূরের প্রতিটি আলোকে যেন সূর্যমুখী ফুল মনে হয়।

ফারবিসগঞ্জ তো হিরামনের ঘরবাড়ী। না-জানি কতবার সে ফারবিসগঞ্জে এসেছে। মেলায় গাড়ীতে মাল বোঝাই করেছে। কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে? হ্যাঁ, একবার। যে বছর তার বৌদি গৌনা হয়ে এসেছিলো। এই ভাবেই তেরপল দিয়ে চারিদিক ঘিরে গাড়ীর মধ্যে বাসা তৈরী করা হয়েছিলো। হিরামন গাড়ীটাকে তেরপল দিয়ে ঘিরে নিলো। সকাল হলেই গাড়োয়ান পট্টীর ধারে রোতা কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে হীরাবাঈ ঐ যাত্রা' দলে যোগ দেবে। পরশু থেকে মেলা সুরু হবে। এবারে মেলা খুব জমজমাট।...ব্যস্, আর একটা রাত্তিরের মামলা। আজ রাতটা হীরাবাঈ হিরামনের গাড়ীতেই থাকবে।...হিরামনের গাড়ীতে নয়, তার তৈরী ঘরে।

—কোথাকার গাড়ী?...কে? হিরামন? কোন্ মেলা থেকে? কি মাল নিয়ে আসা হচ্ছে?

এক একটা গাঁয়ের গাড়োয়ানরা নিজেদের খুঁজে পেতে নিয়ে মিলেমিশে পাশাপাশি গাড়ী রেখে থাকবার মতো বাসা বেঁধে নেয়। নিজের গাঁয়ের লালমোহর, ঘুন্নীরাম আর পলটদাস গাড়োয়ানের দলকে দেখে হিরামন একটু থতমত খেয়ে যায়। ওধারে পলটদাস ছাউনির ভেতরে উঁকি মেরে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায়। হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে। হিরামন সবাইকে চুপ করতে ইসারা করে। গাড়ীর দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'চুপ! কোম্পানীর স্ত্রীলোক, যাত্রাদলের।'

'কোম্পানীর—ইর—ইর—ইর?'

'? ?......? ?......! ! !'

এখন এক নয়, চার চারটে হিরামন। চারজনই আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। কোম্পানীর নামের কি মহিমা! হিরামনের কথায় তিনজনে একসঙ্গে সটকে পড়লো। লালমোহর একটু দূরে সরে গিয়ে ইসারায় জানালো, সে একটু হীরাবাঈ-এর সঙ্গে কথা বলতে চায়। হিরামন ছাউনির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, 'হোটেল তো এখনও খোলেনি, হালুইকরের দোকান থেকে পুরী তরকারি নিয়ে আসবো ?'

'হিরামন, এদিকে একটু শুনে যাও। আমি এখন কিছু খাব না। এই নাও, তুমি খেয়ে এসো।'

'ওটা কি ? পয়সা ? ইস্—স !' ফারবিসগঞ্জে হিরামন কখনও পয়সা খরচ করে কিছু কিনে খায়নি। ওর গাঁয়ের এতো গাড়োয়ান তবে কিসের জন্যে ? তার পক্ষে হীরাবাঈ-এর কাছ থেকে পয়সা নেওয়া সম্ভবও নয়। হীরাবাঈকে তাই বললো, 'খামকা মেলার মধ্যে হুজ্জোত করবেন না। পয়সা রেখে দিন।' মওকা বুঝে লালমোহরও ছাউনির কাছে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে বললো, 'চারজনের খাবার থেকে আরো দুজনের খুব ভালো করে হয়ে যাবে। ডেরায় ভাত ফুটছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমরা একই গাঁয়ের। গাঁয়ের সব বন্ধুবান্ধব থাকতে হিরামন কোন দুঃখে হোটেলে বা হালুইকরের দোকানে খেতে যাবে ?'

হিরামন লালমোহরের হাতটা টিপে দেয়। 'বেশী বকবক করিস নি।'

গাড়ী থেকে চারহাত দূরে যেতে না যেতেই ঘুন্নীরাম যে কথাটা বলবার জন্যে হাঁকপাঁক করছিলো তা বলে ফেললো, 'ইস্। হিরামন, তুমিও খুব দেখালে বটে! গতবছর কোম্পানীর বাঘ, এবছর কোম্পানীর মেয়েছেলে!'

একটু গলা নামিয়ে হিরামন বলে, 'ভাইরে, এ দেহাতী মেয়ে নয় যে আমাদের কথা শুনে চুপ করে থাকবে। একে তো পশ্চিমের মেয়ে তায় আবার কোম্পানীর।'

ঘুন্নীরাম নিজের আশঙ্কাটা প্রকাশ করেই ফেলে, 'কিন্তু কোম্পানীতে শুনেছি, বেশ্যারাই তো কাজ করে।'

'ধ্যেত,' সবাই একসঙ্গে ওকে ছি ছি করে ওঠে। 'কি রকম লোক তুই, কোম্পানীতে আবার বেশ্যারা কাজ করে? একবার বুদ্ধির বহরটা দেখো।...খালি শুনেছিস, চোখে তো আর দেখিস নি।'

ঘুন্নীরাম নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়। পলটদাসের একটা কথা মনে এলো, বললো, 'হিরামন ভাই, মেয়েছেলে গাড়ীতে একেবারে একলা থাকবে। যাই বলো না কেন, মেয়েছেলে মেয়েছেলেই। যদি কিছু দরকার হয়?'

কথাটা সবায়েরই বেশ মনে লাগে। হিরামন বুঝে, 'কথাটা ঠিকই বলেছো। পলট, তুমি ফিরে গিয়ে গাড়ীর কাছাকাছি থাকো। হ্যাঁ, আর শোনো, গল্প-স্বল্প একটু বুঝে সুঝে কোরো।'

হিরামনের গা থেকে গোলাপী আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। হিরামন যখন যে মাল গাড়ীতে বোঝাই করে তার গন্ধ তার গায়েও লেগে থাকে। সেবার মাস কয়েক তার গা থেকে বাঘের গন্ধ যায়নি। লালমোহর হিরামনের গামছাটা শুঁকেই নিলো! যেতে যেতে হিরামন থমকে দাঁড়িয়ে যায়। 'কি আর বলবো লালমোহর ভাই, একটু কিছু বললেই জেদ ধরে, বলে, আমাকে যাত্রা দেখতেই হবে।'

'বিনা পয়সায়?'

'একথা গাঁ অবধি পৌঁছবে না, ভাবছো?' হিরামন বললো, 'না বাবা, এক রাত্তির যাত্রা দেখে সারাজীবন কে খোঁটা খাবে?... দেশী মুরগী বিলাতি খানা।'

ঘুন্নীরাম জিজ্ঞেস করলো, 'নিখরচায় দেখলেও কি তোমার বৌদি কথা শোনাবে?'

কাঠের দোকানের সাজসরঞ্জাম নিয়ে যে সব গাড়োয়ানরা এসেছে তারা লালমোহরের ডেরার পাশেই ডেরা গেড়েছে। ঐ ডেরার

বুড়ো গাড়োয়ান মীর-মিয়া-জান হুঁকোয় টান দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ ভাই, মীনাবাজারের মাল নিয়ে কে এসেছে?'

'মীনাবাজার! মীনাবাজার, যেখানে বেশ্যারা থাকে।...বুড়ো বলে কি রে?' লালমোহর হিরামনের কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'তোমার গা সত্যিই গন্ধে ভুরভুর করছে।'

লহসনওয়া গাড়োয়ান লালমোহরের কাছে চাকরী করে। বয়সে সে সবায়ের ছোট। প্রথমবার মেলায় এলে কি হবে, ছোটবেলা থেকেই সে বাবুদের বাড়ী চাকরী করেছে। থেকে থেকে নাক কুঁচকে কি যেন শুঁকছে। হিরামন দেখলো লহসনওয়ার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। ধুমদাম করতে করতে কে যেন আসছে। 'কে, পলটদাস? কি ব্যাপার?'

পলটদাস এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখটাও লাল। 'কি হয়েছে? জবাব দিচ্ছো না কেন?' হিরামন প্রশ্ন করে।

কি আর জবাব দেবে পলটদাস। হিরামন তো আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো কথাবার্তা বুঝে বলার জন্যে। পলটদাস চুপচাপ হিরামন যেখানে বসে সেখানে গিয়েই বসেছিলো। হীরাবাঈ প্রশ্ন করেছিলো, 'তুমিও কি হিরামনের সঙ্গী?' ঘাড় নেড়ে পলটদাস 'হ্যাঁ' বলেছিলো। হীরাবাঈ শুয়ে পড়ে।...চোখ মুখ দেখে আর কথাবার্তা শুনে পটলদাসের কেন জানি বুক দুর দুর করতে থাকে। মনে পড়ে, রামলীলায় সুকুমারী সীতা ক্লান্ত হয়ে এই রকম ভাবেই শুয়েছিলো। জয়! সীতাপতি রামচন্দ্রের জয়! পলটদাস মনে মনে জয় জয়কার করে ওঠে। জাতে সে দাস বৈষ্ণব। কীর্তন গেয়ে বেড়ায়। আঙ্গুলের ইসারায় ক্লান্ত সীতার পা টেপার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যেমন করে বাদক হারমোনিয়মের রীড্ টেপে। হীরাবাঈ রেগে টঙ্ হয়ে উঠে বসে—'আরে পাগল নাকি? যাও, ভাগো।'

পলটদাসের মনে হোলো রেগে গিয়ে হীরাবাঈ-এর চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। পলটদাস ওখান থেকে পালিয়ে আসে।

পলটদাসের বলারই বা কি আছে। সে ভাবছে এখন মেলা থেকে

কি করে পালানো যায়। বললো—'কিছু না, একটা খদ্দের পেয়ে গেছি কিনা। এক্ষুনি স্টেশনে গিয়ে মাল বোঝাই করতে হবে। ভাতের তো এখনও দেরী আছে। ভাত হতে হতেই আমি ফিরে আসবো।'

খাবার সময় ঘুন্নীরাম আর লহসনওয়া পলটদাসের অভ্যেসের নিন্দে করছিলো, 'ছোটলোক, বড় নীচ প্রবৃত্তি ওর। এক এক পয়সার হিসেব করে।' খাওয়া-দাওয়ার পর লালমোহরের দল নিজেদের ডেরা তুলে দিলো। ঘুন্নী আর লহসনওয়া নিজেদের গাড়ী জুতে নিয়ে হিরামনের ডেরায় যায়। এগোতে এগোতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে হিরামন লালমোহরকে বলে—'আমার এই কাঁধটা একটু শুঁকে দেখো তো। একবার শুঁকেই দেখো না।'

লালমোহর কাঁধটা শুঁকে চোখ বন্ধ করে বললো—'এ—হে।'

'একটু হাত দিয়ে ছুঁতেই এতো গন্ধ, বুঝলে'—হিরামন বলে।

লালমোহর হিরামনের হাতটা চেপে ধরলো, 'সত্যি, কাঁধে হাত রেখেছিলো? শোনো হিরামন, যাত্রা দেখার এমন সুযোগ আর কখনও মিলবে না।'

'তুমিও দেখবে?'

লালমোহরের বত্রিশ পাটি দাঁত ঝলমল করে ওঠে। ডেরায় পৌঁছে হিরামন দেখে ছাউনির পাশে দাঁড়িয়ে কে একজন হীরাবাঈ-এর সঙ্গে কথা বলছে। ঘুন্নী ও লহসনওয়া একসঙ্গে বলে ওঠে—'কোথায় রয়ে গিয়েছিলে পেছনে? অনেকক্ষণ ধরে তোমায় খোঁজাখুঁজি করছে কোম্পানীর··· ।'

হিরামন ছাউনির কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলো—আরে, এতো বাক্স বয়ে এনেছিলো যে চাকরটা সেই। চম্পানগর মেলায় হীরাবাঈকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলো।

'হিরামন এসে গেছো। ভালো কথা, এদিকে এসো। এই নাও তোমার ভাড়া আর এই নাও তোমার দক্ষিণা, পঁচিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ।'

হিরামনের মনে হোলো কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে স্বর্গ থেকে

ধরাতলে ফেলে দিলো। কেউ হতে যাবে কেন? এই বাক্স-বওয়া চাকরটাই তো। এলো কোত্থেকে? হিরামনের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। ইস্-স! দক্ষিণে। হিরামন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

হীরাবাঈ বললো—'নাও, ধরো।' আর শোনো, কাল সকালে রোতা কোম্পানীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পাশ দিয়ে দেবো।···কথা বলছো না কেন?'

লালমোহর বলে উঠলো—'মালিক যখন বকশিস দিচ্ছেন, তখন নিয়ে নাও না হিরামন।'

হিরামন রেগে লাল হয়ে লালমোহরের দিকে তাকায়।··· লালমোহর ভদ্রভাবে কথা বলতেও জানে না।

ঘুন্নীরাম আপন মনে বলে ওঠে, 'গাড়ী-বলদ ছেড়ে মেলাতে কোন গাড়োয়ান যাত্রা দেখতে পারে?' কথাটা সবাই শুনলো। হীরা-বাঈও।

হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে হিরামন বললো—'কি আর বলবো।' শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করে হিরামন।

কোম্পানীর স্ত্রীলোক কোম্পানীতে ফিরে যাচ্ছে। এতে হিরামনের কি বলার আছে। বাক্স-বওয়া লোকটা পথ দেখিয়ে বললো, 'এদিক দিয়ে।' হীরাবাঈ যেতে যেতে থেমে দাঁড়ালো। হিরামনের বলদ দুটোকে উদ্দেশ্য করে বললো—'চললুম ভাই।'

বলদ দুটো 'ভাই' শুনে কান নাড়লো।

'??······??······!!!'

ভাইসব, আজ রাত্তিরে, দি রোতা কোম্পানীর মঞ্চে 'গুলবদন' দেখুন, 'গুলবদন'। আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুসী হবেন যে মথুরা মোহন কোম্পানীর স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মিস্ হীরাদেবী, যাঁর এক একটি অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখতে হাজার হাজার লোক পাগল, তিনি এবার আমাদের রোতা কোম্পানীতে যোগ দিয়েছেন। স্মরণ রাখবেন, আজ রাতে মিস হীরাদেবীর 'গুলবদন'···।

যাত্রাদলের এই ঘোষণা মেলার প্রতিটি ডেরায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। হীরাবাঈ? মিস হীরাদেবী? লয়লা, গুলবদন…ফিল্মের অভিনেত্রীকেও ছাড়িয়ে যায়।…তেরী বাঁকী অদা পর মৈঁ খুদ হুঁ ফিদা, তেরী চাহত কী দিলওয়ার বয়াঁ ক্যা করুঁ। য়হি খোয়াহিস হ্যায় কি-ই-ই-ই তু মুঝকো দেখা করে, অউর দিলজান ম্যায় তুঝকো দেখা করুঁ। কির-র-র-র……কড়-ড়-ড়-ড়-ড়-র্-র্-ঘন্-ঘন্-ঘড়াম্। অর্থাৎ তোর লাস্যে ভরা রূপ দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি, তোকে আমি যে কত ভালোবাসি তা কি করে বোঝাই। এই আমার ইচ্ছে যে তুই আমার দিকে চেয়ে থাক আর আমি তোর দিকে চেয়ে থাকি।

প্রত্যেকের মনে একটা উত্তেজনা।

ছুটে হাঁফাতে হাঁফাতে লালমোহর হিরামনের কাছে এসে বললো, 'এই হিরামন, এখানে বসে কেন, এগিয়ে একবার দেখ কি রকম জয় জয়কার পড়ে গেছে। বাজনা-বাছি মায় ছাপা কাগজেও হীরাবাঈর নাম, হীরাবাঈর জয়জয়কার সর্বত্র।'

হিরামন ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লো। লহসনওয়া বললো—'ঘুন্নী কাকা, তুমি ডেরায় থাকো, আমিও দেখে আসি।'

ঘুন্নীর কথা আর কে শোনে। তিনজনই যাত্রাদলের যারা ঘোষণা করছিলো তাদের পিছু পিছু চলতে সুরু করলো। প্রত্যেকটা মোড়ের মাথায় বাজনা-বাছি বন্ধ করে ঘোষণা করা হচ্ছিলো। তাদের এক একটা কথা শুনে হিরামনের মনে পুলক জাগছিলো। হীরাবাঈ-এর নামের সঙ্গে লাস্য, মুগ্ধ ইত্যাদি কথা শুনে হিরামন লালমোহরের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলে উঠলো—'ধন্যি, ধন্যি, হীরাবাঈ। নয় কি?'

লালমোহর বলে ওঠে—'আচ্ছা, ভেবে দেখ্ এখনও, যাবি কিনা?'

সকাল থেকেই ঘুন্নীরাম আর লালমোহর হিরামনকে যাত্রা দেখার ব্যাপারে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। 'কোম্পানীতে গিয়ে দেখা করে আয়। যাবার সময়ও তোকে বলে গেছে।' কিন্তু হিরামনের সেই এক কথা, 'ধ্যেৎ, কে দেখা করতে যায়। কোম্পানীর স্ত্রীলোক

কোম্পানীতে গেছে। আর ওর সঙ্গে আমার লেন-দেনের কি সম্পর্ক। চিনতেই পারবে না হয়তো।'

এতক্ষণ হিরামনের মনে একটা অভিমান ছিলো। ঘোষণা শোনার পর সে লালমোহরকে বললো, 'নিশ্চয়ই দেখা উচিত, কি বলো লালমোহর।'

নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে ছুজনে রোতা কোম্পানীর দিকে এগোলো। তাঁবুর কাছে পৌঁছে হিরামন লালমোহরকে ইসারা করে। জিজ্ঞাসাবাদ করার ভার লালমোহরের। লালমোহর সহুরে ভাষা জানে। কালো কোট গায়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে বললো—'হ্যাঁ মশাই, একটু শুন্থন না।'

কালো কোট-পরা ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'কি ব্যাপার, এদিকে কেন?'

লালমোহরের সহুরে ভাষা হারিয়ে গেলো। ভ্রূকুটি দেখে বললো, '…গুলগুল…না, না,…বুল-বুল…না…!'

হিরামন তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললো—'হীরাদেবী কোথায় থাকেন, বলতে পারেন?'

লোকটির চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নেপালী দারোয়ানকে বললো—'এদের এদিকে কেন আসতে দিয়েছো?'

'হিরামন!' ঐ মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন কোত্থেকে ভেসে এলো। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে হীরাবাঈ ডাকলো—'এখানে, ভেতরে চলে এসো!…দেখো বাহাত্বর, একে চিনে রাখো, এ আমার হিরামন, বুঝলে!'

নেপালী দারোয়ান হিরামনকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে মুচ্‌কি হেসে চলে গেলো। কালো কোট-পরা লোকটির কাছে গিয়ে বললো, 'হীরাবাঈ-এর লোক, আটকাতে বারণ করেছে।'

লালমোহর নেপালী দারোয়ানের জন্যে পান নিয়ে এসে বললো—'খাওয়া যাক।'

ইস্-স, একটা নয়, পাঁচ পাঁচটা পাস! পাঁচটাই আট-আনা-ওয়ালা। বললেন, 'যে-কটা দিন মেলায় আছো, রোজ রাতে এসে দেখে যেও।' সবায়ের কথাও খেয়াল রাখেন। আরও বললেন—'তোমার আরও সঙ্গী সাথী আছে, তাদের জন্যেও পাশ নিয়ে যাও।' কোম্পানীর স্ত্রীলোকদের কথাই আলাদা, তাই না!

লালমোহর লাল কাগজটা ছুঁয়ে দেখলো—'পা—স! বাহবা হিরামন!...পাঁচটা পাস নিয়ে কি হবে, পলটদাসতো এখনও পর্যন্ত ফিরে আসেনি?'

হিরামন বলে, 'যেতে দাও, ও বেটার কপালে নেই।...হ্যাঁ, সবচেয়ে আগে এই যাত্রা দেখার কথা গাঁয়ের কাক-পক্ষীতেও যেন জানতে না পারে, সবাইকে কিন্তু এই শপথ করতে হবে।'

লালমোহর উত্তেজিত হয়ে বললো—'কোন্ শালা বলবে গাঁয়ে গিয়ে। পল্টা যদি বদমাইশি করে তো পরের বার থেকে আর ওকে সঙ্গে আনবো না।'

হিরামন তার পয়সায় থলিটা হীরাবাঈ-র কাছে গচ্ছিত রেখে এলো। মেলার ব্যাপার, কিছু বলাতো যায় না। নানান ধরণের পকেটমার প্রত্যেক বছর এই মেলাতে আসে। নিজের সঙ্গী-সাথী-দেরই বা বিশ্বাস কি। হীরাবাঈ রাজীও হয়েছে। হিরামনের কালো কাপড়ের থলিটা হীরাবাঈ তার চামড়ার বাক্সের মধ্যে পুরে রাখে। বাক্সের ওপরে সুন্দর কাপড়ের ঢাকা আর ভেতরে ঝলমলে রেশমী কাপড়ের অস্তর। হিরামনের মান-অভিমান সব ধুয়ে মুছে যায়।

লালমোহর আর ধুন্নী দুজনেই হিরামনের বুদ্ধির খুব তারিফ করে, হিরামনের ভাগ্য যে কত ভালো সে কথাও বারবার বলে। গলা একটু নীচু করে হিরামনের দাদা-বৌদির খুব নিন্দে করে। হিরামনের মতন হীরের টুকরো ভাই পেয়েছিলো তাই, অন্য কোনো ভাই হোলে...।

লহসনওয়াকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো, ঘোষণা শুনতে শুনতে

সে না জানি কোথায় চলে গিয়েছিল। সন্ধ্যের সময় ফিরেছে। লালমোহর মালিক, তাই বেশ করে ধমকালো। 'শালা' বলে গালাগালিও দিলো।

ঘুন্নীরাম খিচুড়ি চড়াতে চড়াতে বললো, 'আগে ঠিক করো, গাড়ীগুলোর কাছে কে থাকবে।'

'থাকবে আবার কে, লহসনওয়া কোথায় যাবে?'

লহসনওয়া কেঁদে ফেললো। করজোড়ে বললো, 'মালিক, মিনতি করছি, শুধু একটিবার, শুধু একটিবার, একটু খানি…।'

হিরামন উদারতা দেখালো—'আচ্ছা আচ্ছা, একটু কেন, এক ঘণ্টা দেখিস। আমি ফিরে আসবোখন।'

যাত্রা সুরু হবার দু ঘণ্টা আগে থেকেই নাকাড়া বাজতে থাকে। কাতারে কাতারে লোক ছুটে চলে। টিকিট ঘরের সামনে ভীড় দেখে হিরামনের হাসি পায়। 'লালমোহর একবার দেখ, লোকে কি রকম ধাক্কাধাক্কি করছে।'

'হিরামন ভাই।'

'কে, পলটদাস। কোথায় মাল পোঁছে এলে?' লালমোহর অপরিচিত লোকের মতন জিজ্ঞেস করে।

পলটদাস হাত কচলাতে কচলাতে ক্ষমা চায়—'দোষ করেছি ভাই, যা সাজা দেবার দাও, আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু সত্যি কথা বলছি সীতা সুকুমারী…।'

নাকাড়ার তালে তালে হিরামনের মনটাও বিকশিত হয়ে পড়ে। বলে—'দেখ পল্টা, সে কিন্তু আমাদের গাঁ-ঘরের মেয়ে-বৌ-এর মতন নয়। দ্যাখ তোর জন্যেও পাস দিয়েছে। নিজের পাসটা নিয়ে নে আর খেলা দেখ।'

লালমোহর বলে উঠলো—'পাস পাবে, কিন্তু একটা সর্তে। মাঝে মাঝে লহসনওয়াকেও—।'

পলটদাসকে আর বুঝিয়ে বলতে হয় না। সে আগেই লহসনওয়ার সঙ্গে কথা বলে এসেছে।

লালমোহর এবার দ্বিতীয় সর্তের কথা বললো—'গাঁয়ের যদি কেউ এ কথা জানতে পারে তাহলে…।'

'রাম-রাম!' জিভ কেটে পলটদাস জবাব দেয়।

পলটদাস আট আনার গেটটা দেখিয়ে দিলো। ফটকের দারোয়ান এদের হাত থেকে পাসগুলো নিয়ে প্রত্যেকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিলো। বললো, 'এ তো পাশ, কোত্থেকে পেয়েছো?'

এবারে লালমোহরের মুখ থেকে সহরে বুলি ছুটলো। তার রাগ দেখে দরোয়ান একটু ঘাবড়ে যায়। 'কোত্থেকে পেলাম? তোমার কোম্পানীকে একবার জিজ্ঞেস করে এসো। চারটে নয়, আরও একটা আছে।' পাঁচ নম্বর পাসটা পকেট থেকে বার করে লালমোহর ওকে দিলো।

এক টাকার গেটে নেপালী দারোয়ান দাঁড়িয়েছিলো। হিরামন চিৎকার করে দারোয়ানকে বললো, 'ওহে সিপাই ভায়া, সকালে না আমাদের চিনিয়ে দিলো, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

নেপালী দারোয়ান বলে ওঠে—'এরা সব হীরাবাঈ-এর লোক। যেতে দাও। পাস আছে যখন আটকাচ্ছো কেন?'

আট আনার দরজা।

তিনজনে এই প্রথমবার অপেরা হাউসের ভেতর ঢুকলো। সামনে চেয়ার ও বেঞ্চি পাতা সীট, পর্দার ওপরে রামের বনগমনের ছবি। পলটদাস চিনতে পেরেছে। পর্দার ওপরে আঁকা রাম, সীতা সুকুমারী ও লক্ষণভাইকে হাতজোড় করে প্রণাম করলো। জয় হোক্, জয় হোক্। পলটদাসের চোখে জলে ভরে এলো।

হিরামন লালমোহরকে জিজ্ঞেস করলো—'এগুলো ছাপা না জ্যান্ত?'

লালমোহর তার আশেপাশের দর্শকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। বললো, 'যাত্রা এখনও সুরু হয়নি, পর্দা উঠলে সুরু হবে। লোক জড়ো করার জন্যে এখনও গান বাজনা চলছে।'

পলটদাস ঢোলক বাজাতে জানতো, তাই ডুগির তালে তাল দিয়ে

মাথা নাড়াচ্ছিলো, আর দেশলাই দিয়ে তাল ঠুকছিলো। বিড়ি দিয়ে হিরামনও দু-একজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিয়েছে। লাল-মোহরের সঙ্গে যার আলাপ হয়েছিলো তিনি চাদরটা মুড়ি দিয়ে বললেন, 'নাচ সুরু হতে এখনও দেরী আছে, ততক্ষণ এক ঘুম দিয়ে নেওয়া যাক।···সব ক্লাসের সেরা আট আনার ক্লাসটা, সবচেয়ে পেছনে আর সবচেয়ে উঁচু। মাটিতে খড় বেছানো। হে-হে। চেয়ার বেঞ্চিতে বসে এই শীতের মধ্যে যারা যাত্রা দেখবে তারা ঘন ঘন চা খেতে উঠবে।' লোকটি নিজের পরিচিত এক আত্মীয়কে বললো—'যাত্রা সুরু হলে জাগিয়ে দিও। না, না, যাত্রা সুরু হলে নয়, হিরিয়া মঞ্চে এলে জাগিয়ে দিও।'

কথাটা শুনে হিরামন একটু রেগে গেলো। 'হিরিয়া!' লোকটা বড় মেয়েন্যাকরা মনে হচ্ছে। হিরামন চোখের ইসারায় লালমোহরকে এই লোকটার সঙ্গে বেশী কথা বলতে মানা করলো।

ঘন্-ঘন্-ঘন্-ঘড়াম্। মঞ্চের পর্দা উঠলো।··হে-এ হে-এ, সুরুতেই হীরাবাঈ ষ্টেজে নেমে পড়েছে। প্রেক্ষাগার লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গা নেই। অবাক হয়ে হিরামন হাঁ করে দেখতে লাগলো। লালমোহরের না জানি কেন হাসি পেতে লাগলো। হীরাবাঈ-এর গানের প্রতিটি পদ শুনে সে অকারণে হাসে।

গুলবদন দরবার সাজিয়ে বসে আছে। ঘোষণা করা হয়েছে, যে অনেক পাপড়ীওয়ালা ফুলের মতন সিংহাসন তৈরী করে দেবে, সে যা চাইবে তাই তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এমন কেউ কৃতী শিল্পী কি নেই যে এক্ষুনি এই সিংহাসন তৈরী করে দিতে রাজী হয়? কিড়কিড়-কিরি···। সত্যিই ভালো নাচে। কি গলা। জানো, এই লোকটা বলছিলো যে হীরাবাঈ পান-বিড়ি সিগারেট জর্দা কিছুই খায় না। ঠিকই বলেছে। খুব নাম করা বেশ্যা।···কে বলেছে ও বেশ্যা? দাঁতে মিশি কোথায়? পাউডার দিয়ে দাঁত মেজে নেয় বোধ হয়' হতেই পারে না।···কে এইসব আজেবাজে কথা

ওড়াচ্ছে ? কোম্পানীর স্ত্রীলোককে বেশ্যা বলছে।…তোমার গায়ে কেন ফোস্‌কা পড়ছে ? কে এ বেশ্যার দালাল ?

মারো শালাকে মারো। তোর…।

হৈ চৈ-এর মধ্যে হিরামনের গলা প্রেক্ষাগৃহের চারিদিকে শোনা যায়—'ভাগো, এক এক করে সব কচুকাটা করবো।'

লালমোহর পাঁচন বাড়ি দিয়ে সামনের লোকগুলোকে পটাপট পিটতে লাগলো। পলটদাস একজনের বুকের উপর চড়ে বসেছে—'শালা, সীতা সুকুমারীকে গাল দিচ্ছিস, তাও আবার মুসলমান হয়ে।'

ঘুন্নীরাম গোড়া থেকেই চুপচাপ ছিলো। মারপিট সুরু হতেই প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে সে পালিয়েছে।

কালো কোট-পরা যাত্রাদলের ম্যানেজার নেপালী দারোয়ানকে নিয়ে ছুটে এলেন। দারোগা সায়েব হাণ্টারের বাড়ি সবাইকে পিটতে লাগলেন। হাণ্টারের বাড়ি খেয়ে লালমোহর হকচকিয়ে গেলো। সহুরে ভাষায় ভাষণ দিতে সুরু করে দিলো, 'দারোগা সাহেব, মারতে হয় মারুন। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এই পাস দেখে নিন, এ টা পাস পকেটেও আছে। হুজুর মনে করলে দেখতেও পারেন। টিকিট নয়, পাস !…এরপর আমাদের সামনে কোম্পানীর স্ত্রীলোককে কেউ বেইজ্জত করে তো তাকে কি করে ছেড়ে দেবো ?'

কোম্পানীর ম্যানেজার সব কিছু বুঝতে পারলেন। উনি দারোগাকেও বুঝিয়ে বললেন, 'হুজুর, আমি সব বুঝতে পেরেছি। এইসব বদমাইসি মথুরা মোহন কোম্পানীর। যাত্রার সময় ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিয়ে কোম্পানীর বদনাম…। হুজুর, এদের ছেড়ে দিন, এরা হীরাবাঈ-এর লোক। বেচারীর প্রাণ সংশয়। হুজুরকে তো আগেই জানিয়েছি।'

হীরাবাঈ-এর নাম শুনেই দারোগা এদের তিনজনকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তিনজনের পাঁচনবাড়ি কেড়ে নিলেন। ম্যানেজার তিনজনকে নিয়ে গিয়ে এক টাকাওয়ালা সীটে বসালেন—'আপনারা এখানেই

বসুন, জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।' প্রেক্ষাগৃহ শান্ত হোলো। হীরাবাঈ আবার ষ্টেজে ফিরে এলেন। নাকাড়া আবার বেজে উঠলো।

খানিকক্ষণ পরে একসঙ্গেই তিনজনের ঘুন্নীরামের কথা খেয়াল হোলো। আরে, ঘুন্নীরাম কোথায় গেলো।

'মালিক, ও মালিক।' লহসনওয়া প্রেক্ষাগৃহের বাইরে গলা ছেড়ে ডাকছে—'ও লালমোহর মালিক।'

উত্তরে লালমোহর তারস্বরে জবাব দেয়, 'এদিকে—এদিকে—এক টাকার গেট দিয়ে।' সব দর্শকরাই একবার লালমোহরের দিকে ফিরে তাকালো। লহসনওয়াকে নেপালী সিপাই লালমোহরের কাছে পৌঁছে দিলো, লালমোহর পকেট থেকে পাসটা বার করে দেখিয়ে দেয়। লহসনওয়া এসেই জিজ্ঞেস করে—'মালিক, কে কি বলেছিলো? একবার বলুন তো দেখি। চেহারাটা দেখিয়ে দিন।'

লোকেরা লহসনওয়ার খাড়া চওড়া বুক দেখলো। শীতকালেও গা খালি। বুঝলো চ্যালা চামুণ্ডও সঙ্গে আছে।

লালমোহর লহসনওয়াকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

ওদের তিন চার জনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ওরা যাত্রায় কি দেখলো, তাহলে বোধহয় ওরা কেউই গল্পটা বলতে পারবে না। গল্প মনে থাকবেই বা কি করে। হিরামনের মনে হচ্ছিলো যে হীরাবাঈ সারাক্ষণ তার দিকে চেয়েই নাচছিলো, গাইছিলো। লালমোহরের মনে হচ্ছিলো হীরাবাঈ তাকেই দেখছিল। হীরাবাঈ এবার বুঝতে পেরেছে, লালমোহর হিরামনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। পলটদাস গল্প বোঝে…গল্প আর কি, সেই এক রামায়ণেরই কথা। সেই রাম, সেই সীতা, সেই লক্ষণ ভাইয়া আর সেই রাবণ। সীতা সুকুমারীকে রামের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে রাবণ বারবার নানারূপ ধরে আসছে। রামসীতাও রূপ বদলাচ্ছে। এতেও সিংহাসন যে তৈরী করবে সেই মালীর ছেলেও রাম। গুলবদন সীতা সুকুমারী। মালীর ছেলের বন্ধু সেই লক্ষণভাই আর সুলতান হলেন রাবণ। ঘুন্নীরামের তেড়ে জ্বর এসেছে। ভাঁড়ের পার্টটাই

লহসনওয়ার সবচেয়ে ভালো লাগে…'চিরিয়া তোহকে লেকে না যাইবে নরহটকে বজারিয়া।' অর্থাৎ, পাখী তোকে নরহট-এর বাজারে নিয়ে যাবো না।

সে ঐ ভাঁড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায়। ভাঁড় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না।

হিরামনের একটা গানের অর্ধেক লাইন মুখস্থ হয়ে গেছে—'মারে গয়ে গুল্‌ফাম'। অর্থাৎ, মারা গেছে গুলফাম্। কে এই গুলফাম? হীরাবাঈ কাঁদতে কাঁদতে গাইছিলো—'আজি হ্যাঁ, মারে গয়ে গুলফাম। টিড়িড়িড়ি'...বেচারা গুলফাম। অর্থাৎ বেচারা গুলফাম সত্যিই মারা গেছে।

তিনজনের পাঁচনবাড়ি ফেরত দিয়ে থানার সিপাই বললো—'লাঠিসোঁটা নিয়ে কি যাত্রা দেখতে আসতে হয়?'

দ্বিতীয় দিন মেলার চারিদিকে এই খবরটা ছড়িয়ে পড়লো—মথুরা মোহন কোম্পানী থেকে পালিয়ে এসেছে হীরাবাঈ, সেইজন্যে এবার মথুরা মোহন কোম্পানী মেলায় আসেনি।...ওদের গুণ্ডারা এসেছে। ...হীরাবাঈও কিছু কম যায় না। খুব ঝুঁদে মেয়ে। তেরো তেরোটা দেহাতী লাঠিয়াল পুষছে।...

দশদিন। রাতদিন।...

সারাদিন হিরামনের গাড়ী মাল আনা নেওয়া করে। সন্ধ্যে হলেই যাত্রাদলের নাকাড়া বেজে ওঠে। নাকাড়া বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ভেসে আসে হীরাবাঈর ডাক—'ভাই...মিতা হিরামন...ওস্তাদ ...গুরুজী।' সব সময়ই কোনো না কোনো বাজনা সারাদিন ধরে তার মনের আঙিনায় বাজতে থাকে। কখনও হারমোনিয়ম, কখনও নাকাড়া, কখনও ঢোলক, আবার কখনও বা হীরাবাঈ-এর পায়ের মল। বাজনার তালে তালে হিরামন সারাদিন ওঠে বসে, ঘোরে-ফেরে। যাত্রাপার্টির ম্যানেজার থেকে সুরু করে যে ড্রপসীন তোলে সে অবধি হিরামনকে চিনে গেছে।...হীরাবাঈ-এর লোক।

পলটদাস রোজ যাত্রা সুরু হবার আগে ষ্টেজকে নমস্কার করে

হাত জোড় করে। লালমোহর একদিন তার সুহুরে বুলি হীরাবাঈকে শোনাতে গিয়েছিলো। হীরাবাঈ তাকে চিনতেই পারেনি, সেদিন থেকেই ও একটু মনমরা হয়ে পড়েছে। ওর চাকর লহসনওয়া এখন ওর নাগালের বাইরে। সেও যাত্রাদলে ভর্তি হয়ে গেছে। এখন ভাঁড়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। সারাদিন জল তোলে, কাপড় কাচে। বলে, গাঁয়ে কি আছে যে ফিরে যাবো। লালমোহর সারাক্ষণই বিমর্ষ। ঘুন্নীরাম অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেছে।

হিরামন আজ সকাল থেকে তিন চার ক্ষেপ মাল নিয়ে ষ্টেশনে গেছে। না জানি কেন আজ তার বৌদির কথা মনে পড়ে। ঘুন্নীরাম জ্বরের ঘোরে কিছু বলে দেয়নি তো। এখানেই তো আজেবাজে বকছিলো—গুলবদন, সিংহাসন। লহসনওয়া আনন্দে আছে, সারাদিনে নিশ্চয়ই হীরাবাঈকে অনেকবার দেখতে পায়। গতকালই হিরামনকে বলছিলো—'মালিক, তোমার কৃপায় বেশ আনন্দেই আছি। হীরাবাঈ-এর কাপড় ধোবার পর বালতির জল গোলাপী আতরের গন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। তাতে আমার গামছাটা ভিজিয়ে রাখি। শুঁকে দেখবে?' রোজ রাতে কারুর না কারুর মুখে ও শুনতে পায়, হীরাবাঈ বেশ্যা। কতজনের সঙ্গেই বা ও লড়বে। না দেখে লোকে এসব কথা বলে কি করে। রাজাকেও লোকে পেছনে গালি দেয়। আজ হীরাবাঈকে সে দেখা করে বলবে যে যাত্রাদলে থাকলে লোকেরা বড় বদনাম দেয়। সার্কাস কোম্পানীর বাঘের কাছে যাবার কার সাহস হয়? হীরাবাঈও নিরাপদে থাকবে।...কোথাকার গাড়ী আসছে?

'হিরামন, ওহে হিরামন ভাই।'

লালমোহরের ডাক শুনে হিরামন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। 'লালমোহর, কি মাল বোঝাই করে এনেছো?'

'হীরাবাঈ তোমাকে ষ্টেশনে খুঁজছেন। তিনি চলে যাচ্ছেন,' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো লালমোহর। হীরাবাঈ মেলা থেকে লালমোহরের গাড়ী করেই ষ্টেশনে গেছে।

'চলে যাচ্ছেন? কোথায়? রেলগাড়ী করে যাচ্ছেন?' হিরামন লালমোহরকে জিজ্ঞেস করে। হিরামন গাড়ীর জোত খুলে দিলো। মালগুদামের চৌকিদারকে বললো—'ভায়া, গাড়ী আর বলদ দুটোর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

স্ত্রীলোকদের বিশ্রাম করার ঘরের দরজার পাশেই হীরাবাঈ চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, হিরামনকে দেখেই থলিটা এগিয়ে দিয়ে বললে—'ওস্তাদ, নাও। যাক্ দেখা হয়ে গেলো। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা আমি তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমি চললাম, গুরুজী।'

বাক্স-বওয়া লোকটা আজ কোট-প্যাণ্ট পরে একেবারে বাবুসাহেব সেজেছে। মালিকদের মতন কুলীদের হুকুম করছে, 'মেয়েদের গাড়ীতে চড়িয়ে দেবে, বুঝলে।'

হিরামন থলিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জামার ভেতর থেকে হীরাবাঈ থলিটা বার করে দিয়েছিলো।...পাখীর গায়ের মতন থলিটা গরম।

গাড়ী আসছে। বাক্স-বওয়া লোকটা মুখে একটু বিরক্তি এনে হীরাবাঈর-এর দিকে তাকালো। মুখ দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছে যে সে বোধহয় ভাবছে এতো বাড়াবাড়ি কেন।

হীরাবাঈ একটু অস্থির হয়ে উঠলো। বললো—'হিরামন, এদিকে, একটু ভেতরে এসো। আমি আবার মথুরা মোহন কোম্পানীতে ফিরে যাচ্ছি। আমার দেশের কোম্পানী।...বনৈলীর মেলায় আসবে তো?' হীরাবাঈ হিরামনের কাঁধে হাতটা রাখলো। এবারে ডান কাঁধের ওপর। তারপর নিজের থলি থেকে টাকা বার করে নিয়ে বললো—'এই টাকায় একটা গরম চাদর কিনে নিও।'

এতক্ষণ পরে হিরামনের মুখে কথা ফুটলো, 'ইস্-স। সব সময় টাকা-পয়সা। টাকা রেখে দিন।...চাদর নিয়ে করবো কি?'

হীরাবাঈ-এর হাত মাঝপথেই থেমে যায়। হিরামনের মুখের

ভাবটা নিরীক্ষণ করে বলে—'তোমার মনটা বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে কেন, মিতা? মহুয়া ঘাট মাঝিকে যে সওদাগর কিনে নিয়েছে গুরুজী, তাই তো যেতে হচ্ছে।' হীরাবাঈ-র গলাটা ধরে আসে। বাক্স-বওয়া লোকটা হাঁক দিলো—'গাড়ী এসে গেছে।' হিরামন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। যাত্রাদলের ভাঁড়ের মতন মুখ করে বাক্স-বওয়া লোকটা বললো—'প্ল্যাটফর্ম থেকে ভাগো। বিনা টিকিটে ধরা পড়লে, তিন মাসের হাজতবাস…।'

হিরামন চুপচাপ ফটকের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

…ষ্টেশনের কথা, রেলের রাজত্ব। তা না হলে এই বাক্স-বওয়া লোকটাকে পিটিয়ে সিধে করে দেওয়া যেতো।

হীরাবাঈ ঠিক সামনের একটা কামরায় উঠলো। ইস্-স। এতো টান! গাড়ীতে বসেও হিরামনের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।…

লালমোহরকে দেখে গা জ্বলে ওঠে। সব সময় পেছনে পেছনে, ভাগ বসাতে ওস্তাদ।

রেলগাড়ীর হুইসিল বেজে উঠলো। হিরামনের মনে হোলো তার অন্তর থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এসে হুইসিলের শব্দের সঙ্গে মিলে ওপরে চলে গেলো—কু-উ-উ—ইস্-স…

ছি-ঈ-ঈ-ছক্ক। গাড়ী নড়ে উঠলো। হিরামন ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিষে দিলো। বুকের ধড়-ফড়ানিটা ঠিক হয়ে গেলো। হীরাবাঈ হাতের বেগুনি রঙের রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো। রুমাল নাড়িয়ে হিরামনকে চলে যেতে ইসারা করলো।…শেষের কামরাটাও পার হয়ে গেলো, প্ল্যাটফর্ম খালি…সব খালি…সব শূন্য! দুনিয়াই যেন শূন্য! হিরামন নিজের গাড়ীর কাছে ফিরে আসে।

হিরামন লালমোহরকে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি কবে নাগাদ গাঁয়ে ফিরছো?'

'এখন গাঁয়ে গিয়ে কি করবো,' লালমোহর জবাব দেয়।

'এখনই তো টাকা রোজগারের সময়। হীরাবাঈ চলে গেছে, এবার মেলা ভেঙ্গে যাবে।'

'ভালো কথা। তোমার বাড়ীতে কিছু জানাবার আছে ?'

লালমোহর হিরামনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু হিরামন গাড়ী নিয়ে নিজের গ্রামের রাস্তা ধরলো।···আর মেলায় কি আছে, সব প্রাণহীন।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গরুর গাড়ী যাবার কাঁচা রাস্তা। হিরামন আজ পর্যন্ত কোনোদিন রেলে চাপেনি। ওর মনে আবার সেই পুরাতন ইচ্ছে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে, রৈলগাড়ীতে চেপে গান গাইতে গাইতে জগন্নাথ ধাম যাবে।

মুখ ফিরিয়ে পেছনের ছাউনিটা দেখার সাহসও আজ আর তার নেই। পিঠে আজও তার সুড়সুড়ি লাগে। আজও থেকে থেকে তার গাড়ীর মধ্যে চাঁপাফুল ফুটে ওঠে। মনে পড়ছে, একটুকরো গানের কলি, বার বার তাল কেটে যাচ্ছে নাকাড়ার তালের সঙ্গে।··· মুখ ফিরিয়ে দেখলো চটের থলেগুলো নেই, বাঁশও নেই, বাঘও নেই ··· পরী···দেবী ··· মিতা ··· হীরাদেবী··· মহুয়া ঘাট মাঝি··· কে-উ নেই। হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো যেন মুখর হয়ে ওঠে। হিরামনের ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। বোধহয়, তৃতীয় প্রতিশ্রুতি— কোম্পানীর স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে আর ···।

হিরামন হঠাৎ বলদ দুটোকে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। পাঁচন বাড়ি দিয়ে মারতে মারতে বলে, 'ফিরে ফিরে রেল লাইনে দেখছো কি ?' বলদ দুটো ছুটতে সুরু করে। হিরামন গুনগুনিয়ে ওঠে—অজী হাঁ, মারে গয়ে গুলফাম্··· ।

লণ্ডনে একটি রাত

দ্বিতীয়বার আমি ওখানে গেলাম। প্রথম রাতে পৌঁছোতে একটু দেরী হয়েছিলো। আগেই কাজের ভাগ বাঁটরা হয়ে গিয়েছিলো। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবছিলাম, শেষ মুহূর্তে যদি ওদের আরও লোকের দরকার হয় তো আমায় ডেকে নেবে। ঘড় ঘড় শব্দে মেশিনগুলো চলছে, সমানে সোডার বোতল খোলার আওয়াজ আসছে। যারা সেদিন কাজ পেয়ে গেছে, তারা তাড়াতাড়ি নিজেদের পোষাক ছেড়ে কাজের পোষাক পরে নিয়েছে।

বাইরের বারান্দায় বোতল রাখা ছিলো। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সেগুলো চক্‌চক্ করছে। ফ্যাক্টরীর দেওয়ালের গায়ে একের ওপর এক থাক করে সাজানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কাঁচের একটা লম্বা ঢিপি, তার ওপর অনেক বেড়াল একে অন্যের গলা জড়িয়ে বসে আছে।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার এখনো যে দাঁড়িয়ে?···বললাম তো, আজ আর কোনো কাজ নেই।' কথা শেষ করে নিজের হাতটা আমার কাঁধে রাখলেন।

'না, আমি এমনি দাঁড়িয়ে।' আস্তে আস্তে আমার কাঁধ থেকে ওঁর হাতটা সরিয়ে দিলাম।

'কাল মিনিট পনেরো আগে এসো। যদি কাল কোনো লোক না আসে তো তোমাকে নিয়ে নেবো। গুড-নাইট,' বলে তিনি চলে গেলেন।

আজ দ্বিতীয় রাত। টিউব স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে দেখি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে। দূরে মিলের চিমনীর মধ্যে লণ্ডনের ধোঁয়াটে আকাশ।

কাল যে পথে গেছিলাম, আজও সেই পথ দিয়ে চলেছি। কালকের পরিচিত পথ জ্যোৎস্নার আলোয় আজ অচেনা মনে হচ্ছে।

নর্থ এক্টন ছাড়িয়ে কিছুদূর যাই। পা আর চলছে না। ভেবেছিলাম, আজ বুঝি তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি। গেটে আমি ছাড়া আর কেউই থাকবে না। কিন্তু আমার অনুমান একেবারেই মিথ্যা। গেটে পৌঁছে দেখি জন কুড়ি-পঁচিশ বেকার ছোঁড়া আমার আগেই ভীড় করে আছে। এর মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ যুবক, কিছু বর্মী ছাত্র, আর কিছু দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো। যে যার দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেরই নজর গেটের দিকে। কয়েকজনকে দেখে মনে হোলো মুখ চিনি। সম্ভবত গতকাল রাতে দেখে থাকবো। সবাই আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বোঝে আমিও ওদের মতই একজন চাকরীপ্রার্থী। সবাই চুপচাপ। সবায়ের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা আমাকে দেখে নয়, চাকরী জুটবে, কি জুটবে না এই ভেবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

আমিও এক কোণে ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম—ওদের দেখে ভয় হোলো। চাকরী খুঁজতে এসেছি বলে মনে করলাম আমি ওদেরই একজন।

পৌনে নটা নাগাদ ম্যানেজার বেরিয়ে এলেন। ম্যানেজারকে দেখে একটু হতাশ হলাম। কাল যিনি আমার কাঁধের ওপর হাত রেখেছিলেন, এ দেখছি তিনি নন। এঁর হাতে এক চিরকুট। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম। চিড়িয়াখানার মূক নিরীহ পশুদের মত নিজেদের মনে হোলো—দর্শকের কাছ থেকে কিছু খাবার জিনিষ পাবার লোভে যারা যন্ত্রচালিতের মত খাঁচার সিকের দিকে মুখ বাড়ায়। ম্যানেজার এক নজরে সবাইকে দেখে নিলেন। তারপর নিজের কাগজে চোখ বুলিয়ে নামগুলো তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হোলো আমাদের ভাবশূন্য অনুভূতিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন।

গতকাল রাত্রে যারা কাজ করেছে তাদের নাম ডেকে আলাদা দাঁড়াতে বললেন। আরও তিনজন নতুন লোক নিলেন। দুজন ভবঘুরে ইংরেজ যুবক আর অন্যজন দক্ষিণ আফ্রিকার ছাত্র। সবার আগে সে দাঁড়িয়েছিলো। মাঝে মধ্যে ম্যানেজারের কানে ফিসফিস করে কি যেন বলছিলো।

'আজ আর লোক নেওয়া হবে না। তোমরা সব কাল এসো, কাল বোধহয় আরও লোক লাগবে,' বলেই আমাদের দিকে একটু সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে দু-তিনজন ছেলে এগিয়ে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করার চেষ্টা করলো। তিনি হাত নেড়ে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

অপেক্ষা করে লাভ নেই, তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। তিন মিনিট আগে যা কিছু ঘটে গেলো, তা যেন এখনও অপূর্ণ, এমনই একটা অবাস্তব তথ্য যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই···আমাদের মধ্যে অনেকেই লণ্ডনের অন্য এক প্রান্ত থেকে তিন চার শিলিং খরচা-করে টিউবে করে এখানে এসেছি। প্রত্যেকের কাছেই একটা করে ঝোলা। ঝোলায় রাতের ডিউটি দেবার পোষাক আর খাবার। পরের টিউবে করে আমাদের ফিরে যেতে হবে, ভাবতেও পারছিলাম না। ফ্যাক্টরীর পাইপ থেকে গরম জল বেরিয়ে আসছে, জ্যোৎস্নার আলো পড়ে চিকচিক করে। সেখানে নালীতে একটা খালি বোতল। একটু আগেই এসব কিছুতেই আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিলো না। কিন্তু এখন যেন সব অর্থহীন মনে হচ্ছে। আমরা সবাই কেন যে এখানে এসেছিলাম তাও যেন ভুলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে চাকরী না পাওয়ার যে দুঃখটা আমরা অনুভব করেছিলাম, সেটা এখন যেন বোঝা হয়ে পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে কোনো বিরক্তি বা অনুশোচনা ছিলো না—ছিলো শুধু হতাশা আর ক্ষুধার জ্বালা। কয়েক

মুহূর্তের এই অনুভূতি। মোহের ঘোর যেতে সময় লাগে না। আমরা সবাই আবার বাস্তবে ফিরে আসি। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চাপা গভীর দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসে, এক কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি। সবাই আমরা একটা যায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন যে যার পথে ছড়িয়ে পড়লাম। শুধু আমরা তিনজনে অনিশ্চিত একটা আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার পেছনে আস্তে একটা শব্দ হোলো।

'ব্লডী বাষ্টার্ড' ছেলেটি চাপা গলায় কথাটা বলে এগিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোতলের ঝুড়ি থেকে একটা সোডা তুলে নিয়ে খেতে থাকে। আর একটা বোতল তৃতীয় ছেলেটির হাতে জোর করে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'আরে খেয়ে নাও, ওই শালারা কিছুই টের পাবে না।'

তৃতীয় ছেলেটির বয়স কম। দেখতে নিগ্রো ছাত্রের মত। প্রথমে বোতলটি নিতে একটু ইতস্ততঃ করছিলো। পরে কি ভেবে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিলো। তারপর ছোট শিশুদের দুধ খাওয়ার মত করে দু'হাতে বোতলটা নিয়ে সোডা খেতে থাকে। বেশ খানিকটা খেয়ে হাতে মুখটা মুছে নেয়। তারপর বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

'এই নিয়ে তৃতীয় দিন আমি এখানে এলাম। গতকাল যে ভদ্রলোক আমায় নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তিনি আজ গায়েব।'

'কালও এই একই ব্যাপার ঘটবে। আবার কোনো নতুন লোক আসবে। আমরা আজ এসে ফিরে যাচ্ছি হয়তো জানবেও না।'

'কাল আবার কে আসবে—আমি তো আর আসছি না। ড্যাম দীজ...'

প্রথম ছেলেটি নিজের ওভারকোটের বোতামগুলো খুলে ফেলে। এত গরমে ওভারকোট পরে থাকতে দেখে আমি কিন্তু আশ্চর্য

হইনি। তার ব্যক্তিত্ব ওভারকোটের সঙ্গেই যেন ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছে। ওভারকোট বাদ দিয়ে ছেলেটিকে ভাবাই যায় না।

স্বাস্থ্য বেশ ভালোই। লাল রঙের ছোট্ট দাড়ি, চোখে মুখে একটা বিরক্তি ও তিক্ততার ভাব। তিক্ততা বললে বোধ হয় ঠিকমত বলা হবে না, একটা নার্ভাস টেন্‌সনের ভাব। জানোয়ারদের শিকার করার সময় চোখ মুখের ভাব অনেকটা এই রকম হয়। চেহারা অনেকটা হলিউডের ভিলেনদের মত, অন্ধকারে দেখলে ভয় পাবার কথা।

আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নর্থ এক্টনের পুল পেরিয়ে এলাম। লণ্ডনের ডবল-ডেকার বাস পাশ দিয়ে চলে যায়। অগাষ্ট মাসে শরতের ঝরাপাতা বাসের পেছনে অনেক দূর অবধি ছুটে চলে।

তৃতীয় নিগ্রো যুবকটি এখনও অবধি বেশ উদাস। চুপচাপ মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছে।

দাড়িওয়ালা ছেলেটির নাম উইলি। নিগ্রো ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'লণ্ডনে কতদিন আছো ?'

ছেলেটি কোনো উত্তর দিলো না।

'কোথা থেকে এসেছো ?'

'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এখানে পড়াশুনো করি।'

ছেলেটি আর কথা বাড়াতে চায় না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে অন্য দিকে তাকাই। প্যাকেটের শেষ সিগারেট দেখে সিগারেট খাবার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে 'না' বললাম। কিন্তু ভদ্রতা বেশীক্ষণ বজায় রাখা যায় না। ঐ একটা সিগারেটই আমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে টানতে লাগলাম।

আমাদের সামনেই লণ্ডনের গভীর রাত। থমথমে, ধোঁয়াটে, শান্ত। এদিকটায় লোক বসতি কম, রাস্তা ফাঁকা। ফাঁকা কিন্তু পরিত্যক্ত নয়। পাতার খস খস শব্দ। পুরাণো বাড়ির সেঁতসেঁতে গন্ধ—মনে হচ্ছিলো যেন কাদার মধ্যে দিয়ে কিছু ঠেলতে ঠেলতে

এগোচ্ছি। হাওয়া কাটিয়ে আর ল্যাম্পপোস্টগুলোকে পেছনে ফেলে এগোচ্ছি।

'তুমি কোথায় যাবে ?'

'ওয়ারেন ষ্ট্রীট,' উত্তর আসে। 'গত দু'দিন ধরে আসছি। শুধু যেতে-আসতেই পাঁচ পপস্ খরচ হয়ে গেছে। এই পয়সা দিয়ে তো টেনিস খেলা যেতো।'

এই সময় টেনিস খেলার কথাটা কানে লাগে। মুখ দেখে মনে হয় গত দু'দিন ধরে তার আধপেটা খাওয়াও জোটেনি।

'আমার বন্ধুর তো চাকরী হয়ে গেলো,' উৎসাহ ভরে নিগ্রো ছেলেটি বললো। 'আমরা দুজনে এক সঙ্গেই থাকি। কাল ওর কাছ থেকে হয়তো কয়েক শিলিং ধার পাওয়া যেতে পারে।'

'ড্যাম হিম ইফ্ হি ডাসন্ট,' উইলি বেশ বিরক্তির স্বরে বললো। 'আমি কাল কোনমতেই আসছি না।...প্লীজ কাম টু মরো,' ম্যানেজারকে নকল করে মুখ বেঁকিয়ে কথাটা বললো। 'টু মরো বি ড্যামড্। কাল তুমি আসবে ?' এই প্রথমবার সে আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো।

'সম্ভবত আসবো,' ওকে একটু চটাবার জন্যে ইচ্ছে করে একথা বললাম। ওর ঠিক এই সময় আসছে কালের কথা জিজ্ঞেস করাতে বেশ দুঃখও হোলো।

'শালারা কত টাকা দেয় ?'

'আড়াই পাউণ্ড,' নিগ্রো ছেলেটি জবাব দেয়।

'রোজ সকালে ?'

'হ্যাঁ, রোজ সকালে। আমার বন্ধু বলছিলো অর্দ্ধেক রাতে চা আর স্যাণ্ডউইচেসও দেয়। গতকাল আমরা দুজনে একই সঙ্গে এসেছিলাম। ওকে কাজে নিয়ে নেয়। আমি বাদ পড়ে যাই।'

'সে কি নিগ্রো ?'

'না, বর্মী।'

'আর আপনি ?' উইলি সন্দিগ্ধ নয়নে আমার দিকে তাকালো। নিরীক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করে। 'আপনি কি জাপানী ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। এই রকম ছোটখাটো ব্যাপারে প্রতিবাদ করাটা আমার কাছে নিরর্থক মনে হোলো।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ টিউব স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। গরম হাওয়ার ঝাপটা লেগে শিউরে উঠতে থাকি। খিদেতে তখন নাড়ী চুঁই চুঁই করছে। মনে হচ্ছিলো হাওয়া ল্যাম্পপোস্টের হলদে ধীমে আলোটাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলেছে।

'রীতিমতো গরম, গত পাঁচ বছরে এতো পড়েনি।'

'গত পাঁচ বছর লণ্ডনে আছো ?'

'পাঁচ বছরের বেশীই মনে হয়...অনেক রকম কাজই করেছি। আর বেশীদিন থাকবো না।'

'বাড়ী ফিরে যাবে ?' উইলি প্রশ্ন করে।

'বাড়ী ?' নিগ্রো ছাত্র জর্জের কণ্ঠস্বরে নিঃসঙ্গতা ও হতাশার ভাব ফুটে ওঠে। মনে হোলো 'ঘর' শব্দটি তার কাছে নতুন, সে এই প্রথম শুনলো। 'আমি তো এখানেই থাকতে চাই, কিন্তু ওরা আমাদের চায় না।'

'ওরা···আহ।' উইলি বলে।

ওরা···আমরা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কাউকে কোথাও দেখতে পেলাম না, অথচ ওরাই আমাদের সঙ্গে সব জায়গায় সব সময় আছে। ওরা আমাদের বাইরেও যতটা, ভেতরেও ততটা।

'জারিং হিলে যখন বিদ্রোহ হয়, তখন কি তুমি এখানেই ছিলে ?' উইলি একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'না, তখন আমি লণ্ডনে আসিনি।'

'আমি ওখানেই থাকি। তিন দিন এক ইংরেজ মেয়ের ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। এক এক করে প্রতিটি নিগ্রোকে লিঞ্চ করা হয়েছিলো, আমি ঐ সাদা চামড়া হোর-র সঙ্গে শুতাম। ও ভেবেছিলো আমি

ওকে চাই···আমি কিন্তু তারপর ওর দিকে ফিরেও তাকাতাম না। ও সাদা চামড়া বলে আমি যে প্রতিশোধ নিচ্ছিলাম তা ও জানতো না···' বলে হাত দিয়ে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করলো। ইঙ্গিতের মধ্যে যত না অশ্লীলতা ছিলো, তার চেয়ে বেশী ছিলো ঘৃণার ভাব।

দূরে কারখানার ধোঁয়ায় টিউব স্টেশনের আলোগুলো ফ্যাকাশে মনে হচ্ছিলো। পৃথিবীর যেন একটা জায়গা হঠাৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে আর তার মধ্যে থেকে হীরের ঝকঝকে ঝালোর ওপরের দিকে বেরিয়ে আসছে।

'তুমি কি এখানে পড়ো ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু গরমের ছুটিতে কাজ করি। প্রথমে নাচতে যেতাম।' জর্জ উত্তর দেয়। ওর গলার স্বরও বেশ উদাস। কাজ না পাবার দুঃখ যেন এখনও ভুলতে পারে নি।

'তুমি কনটিনেণ্টে যাও না কেন ?' উইলি প্রশ্ন করে। 'আমার এক বন্ধু জার্মানী গেছে। ওখানে চাকরির অভাব নেই। শুনেছি ওখানে মেয়েরা নাকি কালো চামড়া বলতে পাগল।···ইসারা করতে যা দেরী।'

'সম্ভবত গত যুদ্ধের দরুন,' জর্জ বলে ওঠে।

'কয়েক বছর আগে বাবা ওখানে গেছিলেন, বলছিলেন, পুরুষ মানুষ চোখেই পড়েনি, খালি মেয়ে···'

'ও! হাউ আই উইস ফর এ্যানাদার ওয়ার···এ্যানাদার এণ্ড দেন এ্যানাদার,' উইলি জবাব দেয়।

জর্জ একটু আশ্চর্য হয়ে প্রথমে উইলির দিকে ও পরে আমার দিকে তাকায়। মনে হোলো কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে দিলো।

কিছু মন্তব্য না করে বোধ হয় সে ঠিকই করেছিলো। লণ্ডনের নিস্তব্ধ গরমের এই রাত্রিতে 'যুদ্ধ' অনেক দূরের কথা বলেই মনে হচ্ছিলো—অর্থহীন ও হাস্যাস্পদ। তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা করার কোনো মানেই হয় না। হোলোও তাই, উইলির কথাগুলো ভুলতে

আমাদের মোটেই দেরী হয় না। এরপর নানান দেশের মেয়েদের নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চললো। মনে হোলো পুরাণো ক্ষিদের ভেতর থেকে এক নতুন ক্ষিদের উদ্রেক হোলো।

'আমি স্পেনে যেতে চেয়েছিলাম, ওখানকার মেয়েরা—আঃ। প্যাশন। কিন্তু শালারা ভিসা দিলো না। নিজের দেশের কুমারীদের ভার্জিনিটিকে যেন জোর করে ধরে রাখতে চায়।'

স্পেন···কেউ যেন এক পুরনো জিনিস মনে করিয়ে দিলো।

'তুমি কি ওখানে গেছো ?'

'অনেক আগে একবার যেতে চেয়েছিলাম।'

'সিভিল ওয়ারের সময় ?'

'আমি তখন খুব ছোট।'

'সিভিল ওয়ার আমাদের দেশে বোধ হয়···'

জর্জ হঠাৎ চুপ মেরে যায়। ওর কোঁকড়ানো চুলে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করে ওঠে।

'আই ডোণ্ট লাইক সিভিল ওয়ার,' উইলী বলে।

ঘুরে ফিরে আমরা আবার সেই একই জায়গায় এসে পেঁৗছলাম। অনেকটা ব্যাগাটেলির ঘুঁটির মতো, চারিদিক ঘুরেটুরে সেই একই গর্তে এসে পড়া। ওর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। লণ্ডনের রাত আজ খুব শান্ত। খুব গরম বটে, যুদ্ধের সম্ভাবনা সুদূর বলেই মনে হচ্ছিলো।

রাস্তার ডান দিকের পুরণো একটা ট্যাভার্ণ থেকে হাসির হট্টরোল ও গানবাজনা ভেসে আসছে। ট্যাভার্ণের পেছনেই গলি—ঘন অন্ধকার। এক কোণায় দুটি ছায়া মূর্তি একে অন্যের আলিঙ্গনাবদ্ধ—বেশ কয়েকবার নড়ে উঠলো। স্কার্টটা বেশ একটু ওপরে উঠে গেছে। সুডোল নগ্ন উরু থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। একটা হাতও থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। সমানে নগ্ন উরু টিপে যাচ্ছে।

'চলো, একটু বীয়ার খাওয়া যাক। একটু ড্রিঙ্ক না করলে আমার ঘুম আসে না,' উইলী বলে।

আমার একটু দ্বিধা হয়। পকেটে মাত্র শেষ দু শিলিং, টিউবে করে ফেরার ভাড়া। দেখে শুনে মনে হচ্ছিলো জর্জের অবস্থা আমারই মতো। জর্জ যেন কথাটা শুনতে পায়নি, এইরকম একটা ভাব করে অন্ধকারে শিস দিতে লাগলো।

উইলী ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিলো। তাই জর্জের কাঁধে হাত রেখে বলে, 'চিন্তার কি আছে। এখানকার লোক আমায় চেনে—এক কালে আমার এখানে খুব আসা-যাওয়া ছিলো।'

জর্জের শুনতে না পাওয়ার ভাবটা হঠাৎ উবে যায়। গোমড়া মুখে হাসি ফোটে।

'আমি একটু জিন খাবো। কাল বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক শিলিং ধার মিলবে আশা করছি।'

আমরা পাবের দিকে এগিয়ে গেলাম।

দরজাটা খুলতেই এক ঝলক গরম হাওয়া মুখে লাগে। চারিদিকে হৈ-হট্টগোল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর বিচিত্র আওয়াজ—মনে হয়, এক আওয়াজের সঙ্গে অন্য আওয়াজ মিশে যাচ্ছে, কখনও বা একটা আওয়াজ অন্য আওয়াজকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বেরোতে না পেরে ফুটন্ত নোংরা গরম জলের মতই একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ধীমে আলো। তাকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। কাউকে বিশেষ চেনা যায় না, চিনলেও অন্যের থেকে আলাদা করা যায় না।

কয়েক ধাপ নামলেই নীচে বেসমেণ্ট। বিচিত্র সব ছায়া—বড়, ছোট। এক একটা এত ছোট, মনে হয় যেন স্বচ্ছ জলের নীচের মাছ, উঠেই নীচে ডুবে যায়।

আমরা এক কোণের একটা টেবিলে বসলাম। একটু পরেই উইলী তিন বোতল বীয়ার ও তিনটে গ্লাস নিয়ে হাজির হয়। আমরা খেতে সুরু করি।

'আগে আমি এখানেই কাজ করতাম। বেশ কয়েক মাস কাজ করেছিলাম, ভালো লাগেনি তাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই পাবের

মালিক এক ইতালিয়ান। লোকটা খারাপ নয়, বড্ড ভীতু। এদিকে এলেই তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো,' উইলী বলে চলে।

'বকশিস্ বেশ ভালোই পেতে, কি বলো ?'

'ইংরেজরা বেশী দেয় না—খুব জোর ছ'পেনি। কনটিনেণ্ট থেকে যে সব টুরিষ্ট আসে, তাদের কথাই আলাদা। খুব দিল দরিয়া, বোকাও বটে।'

'এবার আমি যে কাজ পাবো, তাতেই লেগে পড়বো,' জর্জ বলে।

গলার ভেতর দিয়ে বীয়ার নেমে যাচ্ছে, বন্দী মন এখন উড়ু উড়ু।

'আমি বেশীদিন আর এখানে থাকবো না। আমার এক বন্ধু জার্মানীতে, যদি পারি তো একদিন ওখানেই চলে যাবো,' উইলী বলে।

উইলীর গ্লাসটা শেষ হোলো। সেটাকে টেবিলের ওপর উল্টে দেয়, এক ফোঁটাও বীয়ার ছিলো না। ভিজে সাদা বালু কণার মত বীয়ারের ফ্যানা উইলীর সারা দাড়িতে।

'জার্মানদের আমি সহ্য করতে পারি না,' জর্জ আবার বলে।

'দেয়ার ইজ রিয়েল লাইফ্। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে,' উইলী উত্তর দেয়।

'জার্মানদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না,' জর্জ জোর দিয়ে আবার বললো। আমি একটু হাসলাম।

জর্জ আমার দিকে তাকায়। ওর চাহনী বড় অসহায় মনে হোলো।

'সব লোকই এক,' উইলী মন্তব্য করে।

'কিন্তু ওরা,' দরজার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে জর্জ ইসারা করে।

'ওরাও...তুমি স্রেফ ভয় পাও,' উইলী জবাব দেয়।

মুহূর্তের জন্যে জর্জের হাতের গেলাস কেঁপে ওঠে।

'ইউ আর এ রটার,' জর্জের গলা শোনা যায়।

জর্জের কথায় এমন একটা ইঙ্গিত ছিলো যে উইলীর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

'দেখ, লোকটা আমি মোটেই সুবিধের নই। একথা দ্বিতীয়বার যেন তোমার মুখে না শুনি।'

'ওঃ! তাই বুঝি?' জর্জের গলা কেঁপে ওঠে। 'ইয়েস, ইউ আর এ রটার।'

গ্লাসটা নিয়ে উইলী সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে।

'আর একবার বলো।' উইলী গ্লাসটা জর্জের মাথার কাছে ধরলো। গ্লাসের গায়ে লেগে-থাকা বীয়ারের ফেনা আলোতে চক্‌চক্ করতে থাকে।

আধো-বোজা চোখে উইলীর দিকে তাকিয়ে জর্জ গর্জে ওঠে, 'ইয়েস্, ইউ আর এ রটার অলরাইট।'

গ্লাসের তলায় জর্জের মাথাটা তখনও কাঁপছিলো। মানুষের মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে শুধু মেরুদণ্ডের ওপর কাঁপতে পারে দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিলো।

চোখে মুখে গভীর বিস্ময়ের ভাব নিয়ে উইলী জর্জের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে, 'বোধ হয় তুমি ঠিকই বলেছো...মে বি, আই এ্যাম।' উইলী নিজের চেয়ারে বসে পড়ে।

আমরা এমন কিছু বেশী বীয়ার খাইনি। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে আমাদের চারিদিকে কেউ যেন একটা ভয়ঙ্কর ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছে, ছুঁলেই রক্ত পড়বে।

একটু বাদেই পাবের মালিক আমাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গোলগাল আঁটসাঁট চেহারা, গায়ের রঙ্ হলদেটে, মাথাটা দেহের তুলনায় একটু ছোটো, এক মাথা তেল চুকচুকে কালো কোঁকড়ানো চুল।

'আরও চাই?' মুচকি হেসে উইলীর দিকে তাকালেন।

'এখনও শেষ হয়নি···পরে,' উইলী জবাব দেয়। গলার স্বরে এখন আর তেমন ঝাঁঝ নেই, অবশ্য তিরস্কারের ইঙ্গিত আছে। 'এরা সধ আমার বন্ধু।'

ইতালিয়ান ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকালেন। দৃষ্টির মধ্যে কোনোরকম কৌতূহল নেই।

'উইলী আমার এখানে কাজ করতো।' বেশ একটু গর্বের সঙ্গে উইলীর দিকে তাকালেন। মনে হোলো উইলীর চেয়েও আমাদের নগণ্য জীব মনে করছিলেন।

'এখানে অনেক দিন আছো?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

জর্জ চুপ করেছিলো। ঈশ্বরের কৃপায় ওর মাথাটা আর কাঁপছে না। খালি গেলাসটা আমি নাড়াচাড়া করছিলাম। প্রশ্ন শুনে হাতটা থেমে গেলো।

'এইমাত্র ক'দিন,' আমি জবাব দিই।

'ইজনট্ ইট ফাইন?'

'ইট ইজ ফাইন।'

'কিছু কাজ-টাজ?' বলে আমার জামার কলারটা ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। না জানি কত দেশের ধুলো ওতে জমে আছে।

'এখন কিছু করছি না,' জবাব দিই।

'উইলী কাজ পেয়ে যাবে, কিন্তু ওতো এক জায়গায় মন টিকিয়ে বেশীদিন কাজ করবে না,' উইলীর দিকে স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। দৃষ্টিতে তিরস্কারও মেশানো।

'আমি তোমার এখানে টিকে থাকতে পারতাম, শুধু তুমি...' উইলী বলে ওঠে।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক একটু ক্ষুব্ধ হন। 'তুমি তো জানো···।'

'জানা আছে, তোমরা সবাই একছাঁচে গড়া,' উইলী জবাব দেয়।

'বড্ড গরম।' মাঝখান থেকে জর্জ বলে ওঠে।

'তুমি তো জানোই···।' ইতালিয়ান ভদ্রলোক কথাটা খুব আগ্রহ দেখিয়েই বললেন।

'না···আমি কিছু জানি না। শুধু জানি, ডান্স করবো,' চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উইলী উঠে পড়লো।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক চট করে উইলীর কাঁধটা চেপে ধরলেন। চোখে তাঁর পরাজয়ের গ্লানি। উইলীর লম্বা ছিপছিপে চেহারা। তার সামনে ইতালিয়ান ভদ্রলোকের বেঁটে, গোলগাল চেহারা বড্ড করুণ দেখাচ্ছিলো।

'উইলী! তুমি জানো, এখানে···' একঝটকায় উইলী কাঁধটা ছাড়িয়ে নেয়। টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। জর্জ দু'হাতে বীয়ারের বোতলটা ধরে ফেলে। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হোলো যেন আমরা টলমলে জাহাজের ডেকের ওপর বসে আছি।

অর্কেষ্ট্রা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা জুটী বেঁধে বেসমেণ্টের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক ওদের দিকে না তাকিয়ে শূন্যে দৃষ্টি মেলে রইলেন।

উইলীকে দেখা যাচ্ছে না।

ওর গেলাসটা শুধু আমাদের টেবিলে পড়েছিলো। জর্জ বোতল থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো। ওর হাতের তেলোর ছাপটা ঘামেতে বোতলের গায়ে লেগে গিয়েছিলো।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক এবার আমাদের দিকে তাকালেন। মনে হোলো, উনি আমাদের চিনতেই পারছেন না। অলসভাবে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পাগল···নয় কি ?'

আমরা চুপ করে থাকি। ওই সময় ওখানে কিছু ছিলো, যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু তার ম্লান ছায়া আমাদের মধ্যে এসে পড়েছিলো। ভারী ক্লান্ত পদক্ষেপে ইতালিয়ান ভদ্রলোক কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'বড্ড গরম। তোমার কাছে কত পয়সা আছে?' জর্জ জিজ্ঞেস করে।

'কেন?' হঠাৎ আমি চটে উঠি।

'আমার কাছে দেড় শিলিং আছে, এতে কি লাগরের পয়সা হয়ে যাবে?' জর্জ জিজ্ঞেস করে।

উইলির খালি গেলাসটা পড়ে আছে আমি দেখছি। উইলী এখন কোথায় থাকতে পারে?

ধীমে আলোর নীচে এধারে ওধারে জুতো আর স্যাণ্ডেলের খট্ খটাখট্ শব্দ, চারিদিক যেন ভেঙ্গে পড়ছে। অবিশ্রান্ত আওয়াজের একঘেয়েমি, তারই মধ্যে এককোণে আমরা···একটা টেবিল, জর্জ আর লাগরের ছুটো গেলাস। সব সেই একই রকম যেমন ঢুকেই দেখেছিলাম।

তফাত এই, একটা চেয়ার খালি।

'খুব সম্ভব ওর মেজাজটা আজ খারাপ···আমি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না,' জর্জ বলে ওঠে।

'তুমি তো ওকে কিছুই বলোনি।'

'আমি নিজেকে সামলাতে পারি না।'

টেবিলের ওপর আমার হাতটা চেপে ধরে জর্জ। আঙ্গুলগুলো ওর হাতের তেলোর ঘামে চ্যাপ চ্যাপ করে।

'তুমি জানো না, আমার বক্সিং লড়ার ভীষণ সখ।···যখন আমি প্রথম লণ্ডনে আসি, তখন গোড়ায় গোড়ায় রোজই আমি বক্সিং লড়তে যেতাম। তখন অবশ্য আমি বেকার ছিলাম না। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোনোদিন জিততে পারলাম না। একবারও না।···জানো, আমার মধ্যে শুধু একটা উত্তেজনাই সৃষ্টি হয়। অপর পক্ষ আমায় হিট করুক, প্রথমে এই অপেক্ষাতেই আমি থাকি। কিন্তু যখন করে না, তখন আমার মাথায় খুন চেপে যায়। অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি।...জানি এটা ভুল, এ রকম

ভাবে লড়া যায় না। আর এই জন্যেই আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। বাবার মত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই।'

'তোমার বাবা কার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন?'

'আমি জানি না, রাজনীতিতে আমার কোনো উৎসাহও নেই।' ওর মাথা লাগরের গেলাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো।

ঘামে ভেজা হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিলাম···কাছে টেনে নিলাম—যেন একটা পোষা জানোয়ার। মনে হোলো আঙ্গুল দিয়ে গাঁথা একটা মাংস পিণ্ড, তাতে বড় বড় কালো চুল, চুলগুলি এতক্ষণ ওর হাতের মধ্যে চাপা ছিলো। ভাবতে লাগলাম আমাদের হাতের এই রূপটা আমরা কবারই বা দেখি। হাত দিয়ে যা কিছু ধরি তাতো আমার নাও হতে পারে।

'জানো, কেন আমি উইলীকে রটার বলেছি?'

'ইট ইজ নাথিং,' আমি ওর চোখে চোখ রেখে ঠিক কথা বলতে পারছিলাম না।

'কেন···আসলে আমি নিজেই একটা। আমি একটু আগেই তোমায় বলেছি, বাবাকে আমি কত সম্মান করি। তুমি ওঁকে জানো না, বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। ওরা ওঁর পিছু নিয়েছিলো।'

ওর বাবাকে যে ও খুব সম্মান করে একথা আগে কখনও বলেনি।

'ওরা কারা?'

'ওরা···', সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো একটা গভীর আতঙ্ক ওর চোখে মুখে ফুটে উঠলো।

'তুমি কখনও দেখোনি।' আমার হাতটা ওর হাতের মুঠোর মধ্যে জোরে চেপে ধরলো। ওর কালো মুখে শুধু দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিলো। ও হাসছে কিম্বা এমনি মুখ খুলে রেখেছে, বুঝে উঠতে পারলাম না।

'এখানে আমি নিরাপদে আছি···এ্যাণ্ড ফর ছাট আই হেট, হিম, আই হেট হিম লাইক হেল্।'

আমরা চুপচাপ মদ খাচ্ছিলাম। ঘড়িটা আমার সামনেই ছিলো, এই প্রথম সময় দেখলাম। ভাবলাম, একটা সিগারেট খাই···অনেকক্ষণ খাইনি।

'ভাবছো কি ?' শিশুসুলভ সুরে জিজ্ঞেস করে।

'কই, কিছু নাতো ?'

'আমার জায়গায় যদি তুমি হতে, তাহলে কি করতে ?'

'তোমার জায়গায় হোলে ?' হাসতে থাকি। আমার নিজের জায়গায় কি করা উচিত তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।

'তুমি একটা কিছু করবে ভেবেই দেশ ছেড়েছিলে ?'

'হয়তো বাঁচার তাগিদে।'

'কার হাত থেকে বাঁচতে ?'

'নিজের দেশের লোকের হাত থেকে···হয়তো আরো অনেক কারণে, সে সব আমার ঠিক মনে নেই।'

ঠিক এই সময় আমার মনে হোলো, বেশী মদ খাওয়া বোধহয় উচিত হবে না। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি। নাড়ী-ভুঁড়িগুলো লাগরে ভিজে গেছে। যে কটা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে পাচ্ছি, শুধু দেখছি নীল-সবুজের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, যেন পথ খুঁজতে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আটকে গেছে। ওখানে একটা ঘড়ির ডায়েল ছিলো···ধবধবে সাদা···যেন একটা বাসী মড়া হাওয়ায় ভেসে ভেসে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'তুমি হাসছো কেন ?'

আমি হাসছি, শুনে আশ্চর্য হলাম···যখন বুঝলাম সত্যিই হাসছি, তখন হাসি বন্ধ করাটা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

'কি ব্যাপার ?'

'কিছু নয়, একটা কথা মনে পড়ে গেলো,' এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম—আসলে মনে আমার কিছুই পড়েনি।

'কি মনে পড়লো ?' আমার দিকে এমন ভাবে ঝুঁকলো যেন আমার গলায় ঝুলে পড়বে—'বলো কি মনে পড়েছে ?'

'জানো, তিন দিন আগে আমি জেলে যেতে বসেছিলাম। এক চুলের জন্যেই বেঁচে গেছি।'. একটার পর একটা প্রশ্ন। প্রশ্নের চাপে সব কিছুই মনে পড়ে যায়...আর সত্যিই তিন দিন আগের এক ঘটনা মনে আসে।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, এক চুলের জন্যেই বেঁচে গেছিলাম।' এই ধরণের প্রবাদ কথায় কথায় ব্যবহার করতে আমি বড্ড ভালোবাসি। ব্যবহারের সুযোগও আমি করে নিই।

'লণ্ডনে এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি উঠেছি। কয়েকদিন আগে ফিনল্যাণ্ড থেকে ওর গার্লফ্রেণ্ড ওর কাছে থাকতে এসেছিলো। মোটে একটা ঘর, তাই আমি বাইরে থাকতাম। দিনটা মিউ-জিয়ামের লাইব্রেরীতে কাটিয়ে রাত্তিরে ইউষ্ট্যাণ্ড স্টেশনে শুতে যেতাম। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমার বন্ধুটি এসে আমাকে কয়েক শিলিং দিয়ে যেতো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোনো কাজে আটকে পড়ায় বন্ধুটি আসতে পারেনি। আমার কাছে মাত্তর দশ পেনি ছিলো। সারাটা দিন মিউজিয়ামে ছিলাম, ক্ষিদের জ্বালাটা তেমন বুঝতে পারিনি। রাত্তিরে ক্ষিদের জ্বালায় চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে থাকি। তখন কিংগ্‌স্‌ ক্রসের সস্তার রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বাসে চেপে সহরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে একটা গ্রীক রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছিলো সস্তারই হবে। পটেটো চিপস্‌ আর টোষ্টের অর্ডার দিয়ে ভেতরে ঢুকে বসলাম। তুমি তো জানো, এইসব খাবারই সবচেয়ে সস্তা—খুব বেশী হলে আট পেনি। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে দেওয়ালে টাঙ্গানো প্রাইস্‌-লিষ্টের দিকে নজর পড়লো। ক্ষিদের তাড়নায় গোড়াতে এটা নজরে আসেনি। টোষ্ট আর চিপসের দাম দেড় শিলিং। দেখলাম···আমার পকেটে মাত্তর দশ পেনি। আর

বেশী এক পেনিও ছিলো না।···জানো, তখন আমি কি করেছিলাম? এইভাবে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'গুড ইভনিং, আরে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?' সত্যিই চীৎকার করে উঠেছিলাম। হোটেলের মালিক কৌতূহল ভরে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। তাঁকে বললাম, আমার এক বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে, ওর সঙ্গে দেখা করে এক্ষুনি ফিরে আসছি। টোষ্ট আর চিপসের প্লেট ছেড়ে সোজা এমনিভাবে টেবিলগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আর দরজা পেরিয়েই···তুমি জানো, আর কোনোদিকে তাকাই নি। অনেকক্ষণ ধরে খালি ছুটতে থাকি।' বলতে বলতে টেবিলের ধারে জর্জের কাছে ফিরে এসে লাগরের গেলাসে একটা বড় চুমুক দিলাম।

'তোমাকে কি সে তাড়া করেছিল?'

'না, ও আমায় তাড়া করেনি, তা সত্ত্বেও মজার কথা এই যে আমি এক অন্ধকার গলি থেকে অন্য গলিতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম··· দশটা পেনি যেমনকার তেমনি পকেট রয়ে গেলো, আমার ক্ষিদে আগেই মিটে গেছিলো।'

'তুমি অদ্ভুত লোক বটে,' হাসতে হাসতে জর্জ বললো।

জর্জকে হাসতে দেখে আমার খুব আনন্দ হোলো। পরের দিন ঘটনাটা শুনে আমার বন্ধু ও তার বান্ধবীও খুব হেসেছিলো।

যারা এইসব ঘটনা শোনে—বিশেষ করে যাদের কেন্দ্র করে এইসব ঘটনা ঘটে—তারা কি ভাবে ঘটনাগুলোকে এতো সহজ ভাবে নেয়, ভেবে আমি আশ্চর্য হই। যখন ঘটনাগুলো ঘটে তখন মানুষের বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। গা বেয়ে টস টস করে ঘাম ঝরে পড়ায় জামাটা ভিজে চ্যাপ চ্যাপ করছে। এতো বয়স ও এতো রকমের অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও, ভয়ে আশঙ্কায় মন দুরু দুরু করতে থাকে।···সেদিন যখন দশ পেনি পকেটে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটছিলাম, সেই সময় কে যেন বারবার বলছিলো—'ইউ ফকিং ফুল, ইউ ইডিয়েট···ইউ···'

'তুমি দেখালে বাবা,' জর্জ বলে ওঠে। বারবার তিনবার যখন সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো তখন আমার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হোলো না। চোখের সামনে ঘড়ির ডায়েলটা ঘুরতে লাগলো, টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। টয়লেটটা নীচে বেসমেণ্টে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। ভয় হচ্ছিলো, সিঁড়িতেই না কিছু করে ফেলি। মুখে হাত চাপা দিয়ে রহস্যের হাসি হাসতে থাকি।

কিছুই হোলো না। না সিঁড়িতে, না ওয়াস বেসিনে। ওয়াস বেসিনে অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি কিছু বেরিয়ে যায়। কিন্তু না, কিছুই বেরোলো না। ঘড়ির সাদা ডায়েলটা আর চোখের সামনে ঘুরছে না। নিরিবিলিতে একটার পর একটা ঘটনা মনে করার চেষ্টা করি। বাইরের এতো আওয়াজে তা পেরে উঠছি না। বেসিনের কলটা খুলে দিলাম। বাইরের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। ভাবতে থাকি, এতো রাতে এখানে আমি কি করছি? না, এভাবে চলবে না। প্রত্যেকটি ঘটনা সিরিয়ালী সাজাতে হবে। এগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেন এর পেছনে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে। 'সিরিয়ালী' কথাটা আমার খুব ভালো লাগলো। বারবার তাই এই কথাটা মুখে আওড়াতে থাকি। ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা না করে আমি বারবার মনে তোলপাড় করতে থাকি যে আমাকে ঘটনাগুলো সিরিয়ালী মনে রাখতে হবে।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। নাচিয়ে জুটীদের মধ্যে পড়ে গেছি। সবাই একবার করে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়, কাঠের পুতুলের মত আমি কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাঁয়ে। পা শক্ত করে দাঁড়াতে চেষ্টা করি, মনে হচ্ছিলো ডান্সিং ফ্লোরটা পায়ের তলায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, আমি যেন একটা ঘুরন্ত লাট্টুর ওপর দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কাঁধের ওপর কি যেন ভার মনে হোলো।

'তুমি এখানে?' উইলীর দাড়ি আমার কপালে ঠেকে যায়, 'আর জর্জ?'

'ওখানে আছে,' বলে ওপরের দিকে ইসারা করি।

যে মেয়েটি ওর সঙ্গে নাচছিলো তার মুখ ওর বুকেতে চাপা পড়ে গেছে। শুধু সোনালী চুলগুলো মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো।

'তুমি আসবে না ?···তোমার লাগর···' আমি উইলীকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আসবো।···তুমি নাচবে না ?'

মেয়েটি এবার মুখ তুলে চাইলো। ওর কাঁধের অনাবৃত অংশে হালকা পাউডার, পরনে সস্তা ছিটের সামার স্কার্ট, ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বোধহয় অনেকক্ষণ নাচার ফলে লিপষ্টিকের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ভীড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আদৌ সম্ভব ছিলো না। আমার খুব কাছে ওরা ধীমে তালে নাচতে থাকে—ছোট্ট একটা বৃত্তের মধ্যে—কখনও উইলীর মাথাটা আমার দিকে, কখনও মেয়েটির সোনালী চুলগুলো।

'কি রকম লাগলো ?' উইলী মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে আস্তে নাড়িয়ে দিলো।

'এ ভীষণ খারাপ···নয় কি ?' মেয়েটি হাসতে হাসতেই বলে। এই প্রথমবার আমার মনে হোলো মেয়েটির চোখ পুতুলের মতন—শোয়ালেই চোখ বুজে যায় আর সোজা করলেই খুলে যায়।

'নাচবে ?···মে বি উইথ হার,' উইলী বললো। ওরা দুজনে ঘুরে ঘুরে নাচছিলো, খুব ধীমে তালে। যার মুখটা যখন আমার কানের কাছে আসছে, কিছু না কিছু বলে চলে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে যারা চায় তারা সবাই ওখানে বসে আছে···মেয়েটির সঙ্গে আমাকে দেখলে সবাই হিংসেতে ফেটে পড়বে। উইলী আঙ্গুল দিয়ে দূরে ইসারা করে।

'তুমি নাচবে না ? মে বি উইথ মি,' মেয়েটি জানতে চায়।

'ওই ইতালিয়ান ভদ্রলোক তো মানা করেছিলেন,' উইলীকে বললাম।

'আরে, মরতে দাও ওকে,' উইলী জবাব দেয়। অর্কেষ্ট্রার

একঘেয়ে সুর। মাত্তর আধ মিনিটের জন্যে মোসার্টের 'লিটল নাইট'-এর সুর হঠাৎ ভেসে আসে। আমার নিঃশ্বাস তখন বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। মনে হোলো আঙ্গুলে সুতো গোটানোর মত কে যেন আমার নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছে।

'জিন খাবে? পয়সা এই মেয়েটি দেবে,' উইলী কানে ফিস-ফিস করে বলে।

'মে বি উইথ মি,' মেয়েটি উদাসভাবে বলে উঠলো। আমি জবাব দেবার আগেই নাচিয়ে জুটীদের ভীড় ওদের তুজনকে ঠেলতে ঠেলতে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেলো। ওরা যেন হঠাৎ ভীড়ে হারিয়ে গেলো। আমার মাথা এখনও ঘুরছে, কিন্তু তেমন জোরে নয়, যেমন টয়লেটে যাবার আগে ছিলো। চারিদিক এখন আর তেমন কুয়াসাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে না, অদ্ভুত একটা হাল্কা ভাব, যেন বৃষ্টির পর আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলেছে।

ভীড়ের মধ্যে পথ খুঁজে নেওয়া সহজ ছিলো না। বেসমেণ্টের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে হোলো, সিঁড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

'হ্যালো!' আমার হাতটা কে যেন ঝাপটে ধরলো। ফিরে দেখি পাবের মালিক সেই ইতালিয়ান ভদ্রলোক। জামার গোটানো হাতটা খুলে গিয়ে ঝুলছিলো, সম্ভবতঃ দূর থেকে ছুটে এসেছিলেন। ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছিলেন, মনে হোলো আশপাশের আবহাওয়ায় যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'শোনো, ও কি তোমার বন্ধু?'

আমি কাঁধটা একটু নাড়লাম।

'তুমি কি ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো না, মানে এই জায়গা থেকে?' ভদ্রলোকের স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেলো।

আমাদের চারিদিকে নাচিয়ে জুটির দল বৃত্তাকারে নাচছিলো, বৃত্তটা কখনও ছোট আবার কখনও বা খুব বড় হয়ে যাচ্ছিলো। একজন লাউড স্পীকারটা তু'হাতে ধরে ব্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে

গান গাইছে। আমাদের দুজনের মাঝখানে আর কেউ নেই, শুধু দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিলো।

'তুমি কেন বলছো না ?'

'ওকে আমি কিছু বলতে পারবো না...ও আমার কথা শুনবে না।'

'কিন্তু কেন...ওর এখানে থাকাতে আপত্তি কিসের ?'

'এ জায়গাটা ওর পক্ষে ভালো নয়'—ভদ্রলোকের গলা ধরে আসে, স্বরে একটা অদ্ভুত কাতরতা। 'আগেও আমি ওকে বারণ করেছিলাম।'

আবার আমার ঐ সিঁড়িতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'দেখুন, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আমাদের আলাপ। আপনার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না ?' ভদ্রলোকের করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে মনে ঘৃণার উদ্রেক হোলো। যেন কোনো হড়হড়ে জিনিসে হাত দিয়ে ফেলেছি—'আমি ওকে ভালো ভাবে চিনি না, পুরো নামটাও জানি না।' এমন ভাব নিয়ে কথাটা বললাম যেন জীবনে পুরো নাম জানা একান্তই দরকার, না জানলে কিছুই সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। এসে একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন—'তুমি··· তুমি এখানেই থাকবে ?'

'হ্যাঁ', বলে ঘাড় নাড়লাম। 'যতক্ষণ না তুমি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

ওঁর হাতের মুঠোটা একটু শিথিল হয়ে এলো। চোখ দেখে মনে হোলো যেন উনি আমাকে আঁচ করার চেষ্টা করছেন।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মনে হচ্ছিলো ভদ্রলোক যেন আমাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছেন···হায় ভগবান, এখন যদি একটা সিগারেট পেতাম। যেন এক যুগ সিগারেট খাইনি। ধাক্কা খেয়ে আর ধাক্কা দিতে দিতে টেবিলের কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম। দেখি জর্জ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা টেবিলের

ধারে, শরীরটা চেয়ারের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে। চোখ আধবোজা অবস্থায়, চোখের ভেতরকার সাদা অংশটাকে যেন একটা ময়লা তুলো মনে হচ্ছিলো। প্রথমে ভাবলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখের দু'পাশে খড়ির মত সাদা শুষ্ক ফেনা লেগেছিলো, সবায়ের অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে সেটা মুছে দিলাম।

এতক্ষণ পরে কেন জানি মনে হোলো, জর্জ আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, ভেবে হাসলাম। আবার ভাবলাম ওতো অপরিচিত আগন্তুক।

আমার গেলাস খালি, ওর গেলাস থেকে খানিকটা লাগর ঢেলে নিলাম। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হোলো জর্জ আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে···হাসিতে বিদ্রূপের রেশ।

মনে হোলো, ঘুমোয়নি, শোবার ভাণ করে আছে, আমাকে দেখছে। এটা বোধহয় আমারই মনের ভুল। মদ খেতে থাকি। হঠাৎ নিজেকে বড় একলা লাগলো। ভাবলাম, বন্ধুকে টেলিফোন করে দি, ওর গার্ল ফ্রেণ্ড হয়তো এতদিনে চলে গিয়ে থাকবে। আমি তাহলে ওর ঘরে গিয়ে শুতে পারি। গার্ল ফ্রেণ্ড যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ওর খারাপ লাগবে ...একবার ভাবলাম, জর্জকে তুলে দি, এভাবে কতক্ষণ ঘুমোবে। এতো বয়স হয়েছে, তবুও বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়। ইউরোপে আসার আগে—চলে আসার দিন, মা রাত্রে বারবার জল খাবার নাম করে আমাকে দেখছিলেন। আমার বাড়ীর ছাদে সেই আমার শেষ রাত কাটানো —জুলাই মাস, পরের দিনই রওনা হওয়ার কথা···বাবা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ভেবেছিলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি জেগে জেগে সব দেখছিলাম···এমনিতেই জুলাই মাসের রাত বেশ পরিষ্কার—চোখ বন্ধ করলেও সব দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ ইচ্ছে হোলো বাইরে চলে যাই।···এটাই বোধহয় খুব সহজ। প্রথমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবো,. তারপর দরজা খুলবো, বাইরে চলে যাবো···যাস্ট টু কাম আউট্···আমি ভাবলাম, এ আর এমন

কী বড় কথা···জর্জের মুখ থেকে থুত্‌নী অবধি আবার নাল গড়িয়ে পড়েছে, থুতনীতে খোঁচা খোঁচা নীল দাড়ি। রুমাল দিয়ে আবার ওর মুখটা মুছে দিলাম। একটা আওয়াজ···সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চীৎকার।

বেসমেণ্টের দেওয়ালের ওপর ছায়াগুলো যেন দুলতে থাকে, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের মত। চেয়ার টানাটানির শব্দ, এলোমেলো হাসির আওয়াজ···আসলে কিছুই নয়। আমি উঠলাম না···গেলাসে খানিকটা লাগর এখনও আছে, তাই ওঠা সম্ভব নয়···মনে এক বিচিত্র শান্তি···চারিদিকে পুঞ্জীভূত উত্তপ্ত চিড়বিড়ে বালি, আমি যেন সেই বালি ধরে আছি।

'যাস্ট টু কাম আউট্‌, যাস্ট টু···'

আমি জর্জকে প্রাণপ্রণে ঝাঁকাতে থাকি। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে জর্জ বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—অনেকটা ট্রেণ্ড জানোয়ারের মত, যেন পার্ট ভুলে গিয়ে ট্রেনারদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে মুখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখলাম।

'কি ব্যাপার ?'

'চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

'কিন্তু···এখুনি ?'

ও কিছুই জানতো না। ওকে কিছু বলা উচিত হবে কি হবে না, তাড়াতাড়িতে তা ঠিক করতে পারছিলাম না।

'আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ?' জর্জ প্রশ্ন করে। ঠিক জানি না, কিন্তু মনে হোলো, আমার চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো যা ওকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

'এতো চেঁচামেচি কিসের ?'

সোডা ওয়াটার ফ্যাক্টরীর সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওর চেহারাটা যেমন দেখেছিলাম এখনও সেই রকম মনে হোলো। সেই সময়টা এখন মনে হচ্ছে যেন কত দূরের আর কত অবাস্তর।

'আমাদের যেতে হবে···বাইরে।' বাইরে লণ্ডনের রাত···আমাদের অপেক্ষায়—আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে যেন ব্যাকুল।

'উইলী কোথায়? ওকে ছেড়ে আমরা যাবো কি করে?'

'ও—ও আসতে পারবে না।'

পাবের দরজাটা খুলে যায়···কিছু লোক হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'দে আর দেয়ার···দি ড্যামড···।' একটা বিশ্রী অশ্রাব্য গালাগালি আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জনের গলার আওয়াজ শোনা গেলো। মাছির ভিনভিনিনির মতো অর্থহীন মনে হোলো।

জর্জের হাত ধরে টান দিলাম।

'আমি যাবো না···'

'তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'ওরা কোথায়?'

'ওরা···' রেগেমেগে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে দিলাম। ও এখন আমার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে। 'বলো, ওরা কারা?'

আমি ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিগ্যেস করি।

'বলো, কে ওরা?'

'ইউ আর ড্রাঙ্ক!' বলে এক ঝটকায় সে নিজেকে মুক্ত করে নিলো।

ভাবলাম ও বোধহয় ঠিকই বলছে।···সত্যি, আমি অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছি। এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

'তুমি এখানেই থাকবে?'

'আমি যেখানেই থাকি না কেন,' জর্জ বলে ওঠে।

'শোনো,' বলে আমি মধ্যেকার চেয়ারটা সরাবার চেষ্টা করি

'ইউ আর ড্রাঙ্ক,' বলে সে দু পা পিছিয়ে গেলো।

আমি যাবার জন্যে তৈরী হই। জর্জও তৈরী হোলো, আমার সঙ্গে নয়, আলাদা। এ যেন এক তামাসা। দু'জনে চোখে রুমাল বেঁধে চলতে চলতে ভাবে একজন অন্যের চেয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। আসলে কিন্তু একে অন্যের দিকেই এগিয়ে আসে।

দরজার দিকে···পথে প্রথমে টেবিলগুলো, আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, খালি গেলাস আর বোতল, চেয়ারের ওপরে ইভনিং নিউজ পেপার, মেঝেতে এক কোণে লিপষ্টিকের কৌটো, তাড়াতাড়িতে বোধহয় কোনো ভদ্রমহিলা তুলতে ভুলে গিয়ে থাকবেন—যেন কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্মে মোটেই কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই পালাতে ব্যস্ত, পলায়মান জনতার ঘূর্ণীর পাকে সবাই যেন জড়িয়ে পড়েছে।

উইলী গেল কোথায় ?

আর সেই ইতালিয়ান ভদ্রলোক ?···

চিন্তায় ছেদ পড়লো। সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো। মনে হোলো জর্জ শেষ মুহূর্তে আলাদা হয়ে গেলো। শেষ মুহূর্ত নাও হতে পারে, হয়তো এটাই প্রথম মুহূর্ত। ওকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করি। ওকে যে আমার বিশেষ দরকার। আমার মাথাটা আবার বনবন করে ঘুরে গেলো। যে হাত দিয়ে জর্জকে ধরতে গেলাম, সেটা মুচড়ে গেলো। ছাদ ? না, এটাতো ছাদ নয়, শুধু আলো, একটা বাল্ব, অদ্ভুতভাবে ঝোলানো—আমার হাতটা আরো মুচড়ে গেলো—'ডোণ্ট লেট দেম এসকেপ,' একটা হিংস্র আওয়াজ, সেটাও মিলিয়ে গেলো। আমার হাতটা থরথর করে কাঁপছে, সেটা কাঁপছে আমি দেখতে পাচ্ছি···এটা যেন আমার হাতই নয়। কে যেন এক নাগাড়ে হাতটা প্রাণপণে মোচড়াতেই থাকে, যতক্ষণ না হাতটা ভাঙছে···সমস্ত দেহে···না, এটা ব্যথা নয়, ব্যথার একটা সীমানা আছে, সীমা ছাড়ালে ব্যথা আছে কি নেই, বোঝা যায় না।

'আই সে···লীভ হিম এ্যালোন···,' এটা ইতালিয়ান ভদ্রলোকের গলা না, আমি একটু অবাক হয়ে যাই। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে-পড়া চেহারাগুলো একে একে উঠে যায়, কিন্তু ওদের আমি দেখতে পারছিলাম না···শুধু আমার ঘাড়ের ওপর ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করছিলাম। একটু পরে, তাও নয়।

'তুমি উঠতে পারবে ?'

নিজের হাতটা দেখতে থাকি, সেটা মেঝেতে পড়ে আছে—অবাক হলাম, ওটা এখনও ভেঙ্গে আলাদা হয়ে যায়নি।

উঠে বসলাম। হাতটা আপনা হতেই গালে চলে গেলো। গালটা ভেজা—সেটা যে আমার চোখের জল, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—চোখের জল অভদ্রের মত আপনা থেকেই বেরিয়ে এসেছে, আমি বুঝতেই পারিনি...অনেকটা সেই লোকের মত যে সকালে নিজের বিছানা ভিজে দেখে বিশ্বাসই করতে পারে না যে সেই...

'একটু মদ খাও,' ইতালিয়ান ভদ্রলোক আমার চারিদিকে ঘুর ঘুর করছিলেন।

'উইলী কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওরা ওকে মেরে ফেলবে—আমি তোমায় কি বলেছিলাম ?' গলাটা তাঁর ধরে আসে।

'কি বলেছিলে ?' আমার এখন কিছুই মনে পড়ছে না।

'তোমার জানা আছে।...তুমি যদি ওকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে তাহলে আর কিছুই হোতো না।'

কিছু হোতো না...কিন্তু যা ঘটেছে তা রোধ করার কথাও কারুর জানা ছিলো না।

'এবার আমি যাবো,' বলে উঠলাম।

'কোথায় ?' ইতালিয়ান ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'যেখানেই হোক, বাইরে কোথাও।' চারিদিকে তাকালাম, জর্জকে কোথাও দেখতে পেলাম না। একটু খুসী হলাম।

'বাইরে ?' ইতালিয়ান ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, আঁচ করতেও পারছিলেন না যে আমি কতটা মদ খেয়েছি···আমার কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য।

'এখন নয়, ওরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'দেখো, আমি কিছু কোরবো না, সোজা বাড়ী ফিরবো,' সহজ ভাবে উত্তর দিই।

'কি আজেবাজে বোকছো,' ভদ্রলোক ধমক দিয়ে ওঠে। 'ওরা জানে তুমি উইলীর সঙ্গে এসেছিলে...তুমি ওদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

তর্ক করা মিছে, আমার কথা শুনবে না বুঝলাম। হঠাৎ বাইরের হৈ-চৈ বেড়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে একটা মোচড় এঁকে বেঁকে ঠাণ্ডা বরফের টুকরোর মত পিঠের শির-দাঁড়া দিয়ে সরে সরে যেতে লাগলো। এটা কি, আমার জানা। এটা শুধু ভয়... সুরুতে যে ভয় করে, নিজের মধ্যে সে নগ্ন, নীরব।

আমি বোধহয় হাসছি।

'দেখো, আমাকে অল্প একটু হুইস্কি দেবে?' খানিকক্ষণ ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আগেই সরে এসেছিলাম। আমরা হু'জনে এতো কাছাকাছি, যে অত হৈ চৈ-র মধ্যেও আমি ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

'তুমি চলে যাবে না তো?' সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা, তুই মিলে ওর গলার স্বর একটু উত্তেজিত শোনালো।

'আমি পাগল হইনি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তোমায় এখানে একলা ছেড়ে যেতে আমি পারবো না,' ও বললো।

একবার মনে হোলো ওর গোলগাল চেহারাটা টুকরো টুকরো করে ফেলি···কিন্তু সেই রকমই হাসতে থাকি।

'আমি এখানেই থাকবো···তোমার জন্যে না হলেও হুইস্কির জন্যে। এটুকু বিশ্বাস আমায় করতে পারো।'

এতক্ষণে ওর মুখে হাসি ফুটলো···অপ্রত্যাশিত। হাসির মধ্যে একটা অসহায় নিরীহ ভাব। ও আমাকে বিশ্বাস করে, হেসে নিজেকে আশ্বাস দিতে চায়।

কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলো। অনেক রকম মদ আর বীয়ারের বোতল। বারবার ফিরে ফিরে আমায় দেখে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্কচের বোতলটা কাউন্টারে রেখে দিলো। তারপর আমার দিকে তাকালো, যেন, আমাদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। দু'জনেই নীরব কিন্তু কথার চেয়ে বেশী মুখর, ঠিক তরঙ্গের মত—একটার সঙ্গে আর একটা এসে মিশছে…উঠে দরজায় ধাক্কা খেয়ে অন্তহীন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ও গেলাসটা ধুলো। কল থেকে জল সমানে পড়ে যাচ্ছিলো… ঝকঝকে গেলাসে পিছলে যাওয়া এক একটা কণা—আমি কণাগুলো লক্ষ্য করছিলাম, মনে হলো বমি পাচ্ছে। নগ্ন কাঁচের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়াটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না…অদ্ভুত একটা শিথিলতা আমায় পেয়ে বসেছে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার দিকে তখন ওর পিঠ ফেরানো…আমার হৃদয় স্পন্দন কলের জলের আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। সেই মুহূর্তেই মনে হোলো ফিরতে চাইলেও আমি আর ফিরতে পারবো না। নিজের ওপর কোনো ভরসা নেই। পায়েরও কোনো জোর নেই...আমার সত্ত্বা থেকে আমি যেন বিচ্ছিন্ন।

মুহূর্তের জন্যে দরজাটা খুলে গেলো...আর পরক্ষণেই আমি দরজার বাইরে।

বাইরে অন্ধকারে।

যাস্ট টু কাম আউট...মনে মনে বললাম...

গ্রীষ্মের নির্মল আর স্নিগ্ধ রাত...এক বিরাট বন্য পশুর মত শান্ত... সারাদিনের ক্লান্তির পর ডেরায় এসে শুয়ে পড়েছে।

ঘাম শুকিয়ে আসে। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম একবার...দুবার …একটু অনুশোচনাও হোলো…হুইস্কিটা ছেড়ে এসেছি বলে...ওটা যদি আমার পেটের মধ্যে থাকতো...আবার নিঃশ্বাস নিই...ইস্, যদি একটা সিগারেট খেতে পারতাম।...বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলিতে ঢুকে পড়লাম। বেশীর ভাগ গলির মোড়ে সিগারেটের অটো মেশিন।

'হিয়ার হি ইজ, দি সান অফ্ এ বিচ।'

দাঁড়িয়ে পড়ি...না, এখন আমি ভয় পাচ্ছি না, খুব শান্ত...শুধু একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে চলে গেলো—

ওরা ওখানে ছিলো...দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ছায়াগুলো এগিয়ে এলো।

'হোল্ড হিম।' একটা বিকট চিৎকার···আমি ঘুরে দাঁড়ালাম... একটা হাত আমার বগলের তলায়।

'গড ড্যামড নীগার....'

'ওয়েট, যাষ্ট ওয়েট...'

ও পেছন দিক থেকে এসেছিলো। আমি বুঝতেও পারিনি যে আমার মাথাটা পেছনে অতটা ঝুঁকে গেছে···আর এক মুহূর্ত···আমি দুখান হয়ে যাবো।

যদি ওর মুখটা দেখতে পেতাম।...

হাত আমার অবশ হয়ে গেছে...কানে রক্ত চলাচলের শব্দ শুনতে পাই। একটু নড়ে ঘসটে ঘসটে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ও ঘসে ঘসে এগিয়ে আসে—এ কোনো অন্য লোক হবে, শুধু আমার হাত দুটো জাপটে ধরে আছে। এটা কি আমার শরীর, এ রকম থর থর করে কাঁপছে।

'ইউ শিটিং সোয়াইন।'

একটা ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চুল ওর হাতের মুঠোয়। ওর খোলা হাতটা আমার মুখের সামনে তুলে ওঠে···আমি সহজে ওর হাতটা কামড়ে ধরি...

'ও লীভ ইট বাগার।...' তার দম ফুরিয়ে আসে। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করে, ঝাঁকুনি দেয়...একবার, দুবার। প্রত্যেক বারই মাতালের মত আমি ওর হাতে ঝুঁকে পড়ি।

'লীভ হিম এ্যালোন, ইউ সন্ অফ এ ওয়াইট হোর।'

এটা কি উইলীর গলা ?...আমি প্রাণপণে চেঁচাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আতঙ্কে গোঙানি ছাড়া মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দ বেরোলো না।

মনে হলো ওর মুঠিটা শিথিল হয়ে গেছে।…আমি নিজে এবার উঠতে পারি। আমি চোখ খুললাম। অন্ধকারে চোখের সামনে দিয়ে যেন একটা নীল নদী—নদীতে লাল, সবুজ, গোলাপী ছোপ যেন ভেসে যাচ্ছে—এদের অনেকদিন আগে যেন দেখেছি, একটা চেনা দুঃস্বপ্ন যেন, দ্বিতীয়বার দেখছি, গোড়া থেকে শেষ অবধি।

আমার দু হাত দূরেই সে দাঁড়িয়েছিলো—গলির দেওয়ালে গা ঘেঁসে। এক মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হোলো, এ কী উইলী, যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে লাগর খাচ্ছিলাম…

কিন্তু ও কি আমায় চিনতে পেরেছে?

আর ঐ মেয়েটি যার চুল সোনালী…আর জর্জ…ওরা কি এখন শুধু বিস্মৃতি, রাতের মাঝে হারিয়ে গেছে, আমাদের এখানে ছেড়ে, এই মুহূর্তে নিজেদেরও চিনতে পারছে না!

শুধু দু হাত, মধ্যে অন্ধকার।

ভীড়, বেশ লম্বা একটি যুবক উইলীর ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে …উইলীর জামার কলার চেপে ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে যায়—খটাক্…খটাক্…

লম্বা যুবকটির গলার স্কার্ফটা খুলে গেল—রঙীন স্কার্ফটা—তাতে গোলাপী ফুলের নক্সা…

লাল গোলাপ ফুল…আর রক্ত উইলীর ঠোঁট বেয়ে গলা অবধি গড়িয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্তেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়…আওয়াজ, ঘাম, গলির পচা গন্ধ…আর হাসি।

তখনই ও এসেছিলো…একটা বেঁটে লোক এতক্ষণ ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। ঘন ভ্রূর মাঝে অস্থির চোখ দুটো ওর চিকচিক করছিলো…ভ্রূর ঘন আর লম্বা চুল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন কুকুরের একটা মুখোস পরে আছে।

আস্তে আস্তে পা ফেলে ও উইলীর দিকে এগিয়ে যায়…

'কোথায় গেলো তোমার ডার্লিং?' বলে এক ঘুঁসিতে উইলীর থুতনীটা ওপরে উঠিয়ে দিলো।

'বল্, কোথায় গেছে?'

'কোথায় গেছে?' কথাটা যতবার জিজ্ঞেস করে ততবার উইলীর মাথাটা নিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে দেয়...আর প্রতিবারই উইলী মাতালের মত টলতে থাকে।

ওরা সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

'ব্যাশ হিম দেয়ার।' দ্বিতীয়জন নিজের...দিকে ইসারা করলো। আবার মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠোকার খট্ খট্ শব্দ। খট্ খট্, আমি তখন পাগলের মত ছটফট করতে থাকি। ঘামে আর রক্তে উইলীর কামিজ ভিজে গেছে, বিরামহীন খট্ খট্ শব্দ আর পৈশাচিক হাসি।...'বল্, কোথায় গেছে?...স্পীক! স্পীক! স্পীক! ইউ ফিলদি...হা-হা-হা...' খট্...খট্...খট্...

স্কার্ফে রঙীন গোলাপ ফুল ঝুলছে।...আমার আর কিছু মনে পড়ে না...সত্যি বলতে কি, আমি এও জানি না, আমি নিজে চেঁচিয়ে ছিলাম, না, বাইরের কোনো চীৎকার আমার কানে এসে পৌঁছেছিলো। সেই বীভৎস আওয়াজ যে আমার গলা থেকে বেরিয়েছিলো আজও আমার বিশ্বাস হয় না।

শুধু মনে আছে একটা অন্ধ চামচিকের মত আমার নিঃশ্বাস আমার বুকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রাণপণে ডানা ঝাপটাচ্ছিলো। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ওদের হাত থেকে গলাটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম —শুধু দু হাত, মাঝখানে অন্ধকার।

উইলীর দিকে এগিয়ে গেলাম। ওকে আমি যেন কিছু বলতে চেয়েছিলাম। ওকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম।

মধ্যের অন্ধকার—ঐ ঠাণ্ডা হাত আর তারপর সেই চীৎকার।

যে লোকটি মাঝপথে আমায় ধরেছিলো, তার থুতনীর সঙ্গে আমার মাথাটা জোরে ঠুকে গেলো। অন্য হাতে ও আমার মুখটা চেপে ধরেছিলো...মুখটা ওর জামার সঙ্গে ঘসে যায়। 'আই উইল

টীচ ইউ···হাউ টু রান···বাষ্টার্ড।' আমি মৃগী রুগীর মত হাওয়াতে আমার পা দুটো ছুঁড়তে থাকি—ভাবি, কিছুই হবে না···ও আমায় কিছুতেই ছাড়বে না···মনে হয় আর শ্বাস নিতে পারবো না। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকি এই আমার শেষ নিঃশ্বাস। একটা ভয়ঙ্কর খুসীর আমেজে মন ভরে ওঠে। মৃত্যু আসন্ন, মৃত্যুর শুভক্ষণের জন্যেই যেন বেঁচে ছিলাম। মনে আগেকার মত আর ভয় নেই···ভুলেই গেছিলাম যে আমি একা—শুধু এইটুকু জানতাম যে ওরা আমায় একলা ছাড়বে না, বাঁচতে আমি পারবো না। ঐ রাতেই আমার প্রথম মনে হয়েছিলো যে একলা থাকাটাই বড় কথা নয়, কেন না ওরা তো সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। শুধু জানতাম না যে ওরা আমায় একদিন ধরে ফেলবে—এখন ভুল ভেঙ্গে গেছে, ভয়ও ভেঙ্গে গেছে। আমরা দুজনে অন্ধকারে জানোয়ারের মত শ্বাস নিচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো শেষ পর্যন্ত আমি এইভাবেই হাওয়াতে পা ছুঁড়তে থাকবো—ও ডিয়ার, হাউ ফানি ইট ইজ্... হাউ ফানি! কেউ হাসছিলো—আমিই কি, হাসি, কোনো শব্দ নেই। ঘুঁসি, গালি...আবার ঐ হাসি।

ওরা আমাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে গলির মোড় অবধি নিয়ে গেলো। আমি ওঠার চেষ্টা করে আবার বসে পড়ি। রাস্তাতেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিলো। চোখ বুজলেই অনুভব করছি দেহের মধ্যে একটা কিছু ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে—পায়ে, বুকে, হাতের গাঁটে—উঠে আবার নেমে যাচ্ছে···এটা কী ব্যথা? আশ্চর্য লাগে, জীবনের এতগুলো বছর পার করে দিলাম কিন্তু এটার সঙ্গে আগে কেন পরিচয় ঘটেনি। মনে হয় আমার চেতনা ব্যথার একটা প্রান্ত যেন ধরে ফেলেছে আর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে···কখনও শুধু চেতনা থেকে যায়—ব্যথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—আমি যেন কিছু হারিয়ে ফেলেছি। বর্ষার সন্ধ্যে। আমি আবার নিজের সহরের রাস্তার এক মাথা থেকে অন্য মাথা অবধি ছুটে যাচ্ছি ···একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পেলাম, এক তীব্র আকাঙ্খা জাগলো

ঐ ঘরে লুকিয়ে পড়ার…ঐ ঘরে লুকিয়ে পড়লেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সব সহজ হয়ে যাবে…কিন্তু এটা ঘর নয়। এটা ব্যথা, আর একেবারে নতুন ধরণের ব্যথা—যেটা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, যাকে আমি আজ পর্যন্ত চিনতে পারিনি। হাউ ফানি ইট্ ইজ, হাউ ওয়াণ্ডারফুলি ফানি। মাঝে মাঝে চেতনার পর্দাটা খুলে যায়, আর আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এই আমি…আমার হঠাৎ বিশ্বাসও হয় না যে আমি বাইরে এসে গেছি…নিজেই বাইরে এসে গেছি, আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অন্ধকারের বাইরে—যেখানে ওরা আছে। অগাষ্ট মাসের গোড়ার দিকের এক রাত। গলিটার একটা নোংরা অথচ নিরিবিলি জায়গায় ওরা আমায় ফেলে দিয়ে যায়। কতক্ষণ ধরে যে ওখানে পড়েছিলাম, মনে নেই। মাঝে মাঝে চোখ খুলে, পাতলা স্বচ্ছ কুয়াসার মধ্যে দিয়ে লণ্ডনের আকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। আবার চোখ বুজে আসে আর…আমার মনে হয়, যেন এক কুয়াসা ছেড়ে অন্য কুয়াশায় জড়িয়ে গেছি।

অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। তারপর আমার হুঁস হয়। খুব আস্তে আস্তে একটা পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি ঢুলছিলাম, বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলাম। অনেকক্ষণ বুঝতে পারিনি, কে যেন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিলো…

'কি বড্ড বেশী লেগেছে ?'

'না, তেমন বেশী কিছু নয়,' চোখ মেলে চাইলাম। দেখি, জর্জ আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাগরের হাল্কা গন্ধ পাই। ঐ গন্ধের সঙ্গে একটা অন্য স্মৃতিও ভেসে ওঠে—মোসার্টের সেরিনেডের এক হুবহু পুরনো সুর—সুর ঠিক নয়, সুরের একটা আমেজ, যেটা কিছুক্ষণ আগে পাবেতে শুনে ধরতে পেরেছিলাম।

'তুমি এখানে ?'

'আমি জানতাম ওরা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি দেখছিলাম,' ও বললো।

'উইলী কোথায় ?'

'লেট হিম গো টু হেল…ও যদি না হোতো…তাহলে কিছুই হোতো না।'

'কি, কি হোতো না ?'

বড় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী চলে গেলো। আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই প্রথম আমার নিজের দিকে খেয়াল হোলো। —জামার কলারের ওপর দিকটা ছিঁড়ে গেছে। জামার পেটের কাছটায় ধুলোর নোংরা আর বীয়ারের ছোপ। ঘামে গেঞ্জিটা গায়েতে সেঁটে গেছে, একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

'তুমি ফিরে এলে কেন ?'

'আমি ভেতরে যেতে চেয়েছিলাম—তোমাদের কাছে, কিন্তু তুমি জানো…'

'ইট ইজ অল রাইট, জর্জ,' মাঝপথে আমি ওকে থামিয়ে দি। আমি যেন অনেক দিন জ্বরে ভুগে উঠেছি। পাশেই বৃত্তাকারে ল্যাম্প-পোষ্টের আলোর ছায়া। আমি তার মাঝামাঝি থুতু ফেললাম—একেবারে লাল, পানের পিকের মত। এ যে রক্ত… বড় অদ্ভুত লাগে। আমি আবার থুতু ফেলি। নিজের রক্তটা দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

'তোমার বেশী লাগে নি তো ?' জর্জ প্রশ্ন করে। ওর গলার স্বরে কুণ্ঠার ভাব। আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে।

আমি চুপ করে থাকি, তারপর উঠে দাঁড়াই। এক মুহূর্তের জন্যে গলির দেওয়ালে ঠেসান দি…।

খট্—খট্—খট্…

এখনও ঐ আওয়াজ আমার স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে ওঠে। আমরা চুপচাপ টিউবের দিকে চলতে সুরু করি। পকেটে দু'শিলিং পড়ে। মাঝে মাঝে কাঁপা কাঁপা আঙ্গুল দিয়ে সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখি।

বাইরে রাস্তায় অগাষ্ট মাসের ঝরাপাতা…লণ্ডনের ধোঁয়া রাতের শেষে নীচে নেমে আসে।

'তুমি আমায় বিশ্বাস কর না…তুমি মনে কর…' জর্জ জবরদস্তি আমার কাঁধটা চেপে ধরে।

'ইট ইজ অলরাইট,' কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললাম। এখন যদি ও আমার সঙ্গে না থাকতো তো ভালোই হোতো।

টিউব ষ্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নামতে লাগলাম। প্রায় জনমানবশূন্য প্ল্যাটফরম, বেঞ্চিতে এক আধজন বসে ঢুলছে। আমাদের ঠিক পাশেই থামের আড়ালে একটি জুটি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো…মেয়েটি নিজের মাথার চুলে বার বার হাত দিচ্ছিলো। ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি নীচু গলায় ফিসফিস করে কিছু বলছিলো। মেয়েটি অনবরত হাসছিলো, চমকে উঠে আশপাশ দেখে নিচ্ছিলো।

টিকিট কিনে পাশের খালি বেঞ্চিটায় এসে বসলাম। 'তুমি কি লণ্ডনেই থাকবে?'

ও চুপ করে থাকে। আলো ছাড়িয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে সুড়ঙ্গ পথের দিকে ও স্থিরদৃষ্টিতে দেখছিলো—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে…মনে হচ্ছিলো সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকার সহরের অন্ধকার থেকে আলাদা হয়ে গেছে…

'কে জানে উইলী কোথায় চলে গেছে?'

'উইলী…ওকে তো দেখিনি,' ও বললো।

'কিন্তু তুমি তো এই মাত্র বললে যে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

'আমি কিছুই দেখিনি।'

আবার আমরা চুপচাপ। চুপচাপ থাকলেও আমাদের মনে একটা উত্তেজনা ছিল। বারবার কি যেন একটা জিনিস আমাদের মাঝখানে এসে পড়ছিলো আর আমরা তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলাম।

'তুমি মনে কোরছ...আমি মিথ্যে বলছি?' ও বলে। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি।

'তুমি যা ইচ্ছে মনে করো না কেন, আমি কিছু গ্রাহ্য করি না,' ও বললো।

'ডোণ্ট বি সিলি,' আমি বলে উঠি।

'তুমি আমায় বিশ্বাস করো না,' বলে ও আমার দিকে তাকায়। তুমি ভাবছো আমি কেটে পড়েছিলাম...?' ওর ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

'ড্যাম ইট্, আই সে ড্যাম ইট্।'

'ওরা আমাকে ধরে রেখেছিলো...আর আমি তোমার কাছে...

'ইট ইজ অলরাইট, জর্জ।'

'ও নো...ইট ইজ নট্ অলরাইট...'. ও যেন চীৎকার করতে থাকে।

পাশের বেঞ্চিতে বসে যে লোকটি ঢুলছিলো সে উঠে বসে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলো।

'জর্জ, শোনো।' আমি ওর কাঁধে হাত রাখি। বেঞ্চির হাতলে রাখা দুটো হাতের মধ্যে ও মুখটা লুকোয়। বারবার সে কেঁপে উঠছিলো।

'আই ওয়াজ এ্যাফ্রেড, টেরিব্লি এ্যাফ্রেড।'

আমরা দুজনেই কাঁপছিলাম।

'এ্যাফ্রেড...'

আমি সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম...আণ্ডার গ্রাউণ্ডের অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে নড়ছিলো—একটা পর্দার মত, যেন এক্ষুনি পর্দাটা তোলা হবে। সেই মুহূর্তে জর্জকে ভয় করছিলো। নিজেকেও ভয় করছিলো। মনে হচ্ছিলো আর কোনোদিন ওর দিকে তাকাতে পারবো না। এই মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু একটা আমি করে ফেলবো। ওকে যেন আমি অনেক কিছু বলতে চাই, যা কিছু... কিন্তু এখন আমরা দুজনে একসঙ্গে হয়েও যেন মনে হচ্ছিলো একা। ও কাঁদছিলো, আমি কিছুই করতে পারছিলাম না...এর চেয়ে

ভয়ঙ্কর বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। ছ'জনে একসঙ্গে হয়েও অনুভব করে যে একে অন্যকে বাঁচাতে পারে না। অনুভব করে, ফেলে-আসা সময়ের একটি স্মৃতি, একটি মুহূর্তও ওদের বর্তমানের নিঃসঙ্গতাকে কাটাতে অক্ষম, তার ভাগীদার হতে অসমর্থ...

আমরা চমকে উঠি। ছু নম্বর প্ল্যাটফরমে ওয়ারেন ষ্ট্রীট যাবার টিউব এসে ঢুকছিলো। এই টিউবে জর্জের যাবার কথা। আমাদের আশেপাশের বেঞ্চিতে যারা ঢুলছিলো তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো। টিউবের হেডলাইটের জোরালো আলোয় নিউ এক্টনের পরের সুড়ঙ্গটার অন্ধকার দূরে সরে গেলো। যাতে ওয়ারেন ষ্ট্রীট যাবার শেষ টিউবটা ধরতে পারে তার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে কিছু লোক প্ল্যাটফরমে নেমে আসে।

জর্জ উঠে পড়ে। একবারও আমার দিকে তাকালো না। পর মুহূর্তে সেও ভিড়ের সঙ্গে টিউবের দিকে ছুটতে থাকে। টিউবের অটোম্যাটিক দরজা এক মুহূর্তের জন্যে খুলে যায়, ভিড়টাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে পরমুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যায়।

চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ক্রমে কমে আসে। আবার চারিদিকে আগেকার শান্তভাব। টিউবের হেডলাইটের আলো যে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো, সেই অন্ধকার আবার ফিরে এলো।

শুধু প্ল্যাটফর্মের শেডের বাইরে নিউ এক্টনের আলোর রশ্মি অন্ধকারে ঝলমল করতে থাকে।

থামের আড়ালে যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিলো সে বললো, 'পরের গাড়ীতে।' মেয়েটিকে চুম্বন করলো। মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

ও দেখলোও না...

আমার মনে হোলো যেন এক যুগ হোলো সিগারেট খাইনি।

খোসবাই

সুমেরার মনে হয় রিক্সাটা তার দেহের মতই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শোওয়া বসা সবেতেই রিক্সা। রিক্সা ছাড়া অবস্থাটা যে কী তা ভাবতেও পারে না। পায়ের মলের মত রিক্সার ঘন্টির ট্রিন্‌ন্‌ ট্রিন্‌ন্‌ আওয়াজ তার শিরায় শিরায় বাজে। গাড়ী চালাতে চালাতে কখনও বা প্যাডেল করা বন্ধ করে দেয়। পেছনের চাকার ছোট চাকতিতে প্যাডেল-এর চেনটা ঘসে গেলে কিরে কিরে শব্দ হয়, তার শিরা-উপশিরায় এই শব্দটা যেন করাতের মত কাটে। চালাবার সীটে বসলে তার আর কোন হুঁস থাকে না। এর জন্যে সুমেরার অস্বস্তিও কম নয়। এমন সব আজগুবি কথা ওর মনের কোণে ভীড় করে যে একটার সঙ্গে অন্যটার সে কোন সম্বন্ধই খুঁজে পায় না।

সুমেরা দু'জন সওয়ারীকে রিক্সায় বসালো। থেকে থেকে কেবলই তার সে কথা মনে পড়ে। কোনো ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। রিক্সার পা-দানিতে সাদা রুমালটা পড়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। কেন জানি মনে হয় ওটার প্রাণ আছে। বুড়ী মেমের হাতের মুঠোয় রুমালটা গোল করে পাকানো ছিলো। তুলে নিয়ে একবার ভাবলো ছুটে গিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু নিজের অজান্তেই হাতটা তার নাকের কাছে চলে গেলো। মনে পড়ে বুড়ী একটু আগে বুড়োর থুতু এতেই পুঁছছিলো—তার মনটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। ছিঃ ছিঃ! ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে ভাবে—না, নিজের কাছেই রাখবে, যদি কোন কাজে না লাগে তো গ্রীজ বা কালি মুছতে লাগবে। ঝুঁকে সীটের তলায় রুমালটা রাখতে যায়, মনে হয় রুমালে হাল্কা সেণ্টের গন্ধ।

সীটে বসবার আগে প্যাডেলে এক পা রেখে একটা বিড়ি দু'দিকে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে নেয়। এই ধরণের ঘটনা কবে ঘটেছিলো ভাবতে চেষ্টা করে। মনে পড়েও পড়ে না। কতদিন ধরেই তো কত শত

সওয়ারীকেই সে রিক্সায় বসিয়েছে...এই বারেই বা তার এরকম কেন মনে হচ্ছে। হার চুরির কথাটা মনে পড়ে গেলো। ভেবেছিলো চুরির ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই গেছে। তেরছা নজরে সওয়ারী দু'জনকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

বুড়ো লোকটি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুড়ী পেছন ফিরে ফটকটা বন্ধ করে দেয়। দু'জনের বয়সই ষাট পেরিয়ে সত্তরের কোঠায়। পরণে শ্লেট রঙের লাট-খাওয়া পুরণো কোট প্যান্ট, মাথায় শোলার টুপি,—কোঁচকানো, ভেজা। হাতের লাঠি মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে চলেছে...বুড়োকে পেছন থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা জাপানী পুতুল। বুড়ীর পরণে বড় লাল-সাদা ফুলের ছিটের ফ্রক, খালি পা ধনুকের মত বাঁকা। ফটকটা বন্ধ করে বুড়ী বুড়োর কাছে এগিয়ে যায়, দু'জনে হাত ধরাধরি করে হলদে রঙের ভাঙাচোরা বাড়ীটার দিকে এগোতে থাকে। সুমেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের হেলে-দুলে চলা আর তারই ছায়া দেখছিলো।

ঠোঁটের কোণে হাসি। মনের খুসী প্রকাশের আর কোন উপায় না দেখে সুমেরা রিক্সার ঘন্টিটা ট্রিন্-ট্রিন্ন্ করে বাজায়। হাত মাঝপথেই থেমে যায়। মনের কোণে হারের কথাটা হঠাৎ উঁকি মেরে ওঠে। কেন জানি মনে হয় রিক্সায় কেউ বসে আছে, ঘন্টির আওয়াজে তার কষ্ট হচ্ছে।

সওয়ারী দু'জন বসে আছে—অন্যমনস্কভাবে মোড়ে আসা পর্যন্ত সে এ কথাই ভাবতে থাকে যেন সে একটা বড় কাজ করে ফেলেছে। মনটা তাই খুশীতে ভরে ওঠে। কাকেই বা একথা বলবে। যে শুনবে সেই হাসবে। বলারই বা কি আছে। ওর বন্ধু বাবু শুনে হয়তো বলবে, 'একদিন না একদিন তুই শালা পাগল হয়ে যাবি।'

ব্যাঙ্কের সামনে ঐ বুড়োবুড়ি দু'জন দাঁড়িয়েছিলো। চাকার ওপর পা দিয়ে সে রিক্সার স্পীড কমিয়ে আনে: 'মেমসায়েব রিক্সা?'

'ক্যাণ্ট যেতে কত নেবে?' বুড়ী তার নড়নড়ে ঘাড়টা সোজা করার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করলো।

এক নজরেই সুমেরা আঁচ করে নেয় যে এরা হয় খ্রীষ্টান নয় তো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বিদেশী বা টুরিষ্ট নয়। নেবে পড়ে মাথার গামছাটা খুলে সুমেরা সওয়ারীকে আহ্বান জানানোর ভঙ্গিতে সীটটা মুছতে থাকে, 'মেমসায়েব, যা খুশী তাই দেবেন...নতুন লোক তো আর নন।'

বুড়ো এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। বুড়ীর চেহারায় এমন একটা কিছু ছিলো যা সুমেরাকে টানছিলো। সুমেরার কথাবার্তায় বুড়ী এটুকু বুঝতে পারে যে সুমেরা ঝগড়া করার লোক নয়। তবুও বলে, 'না হে, পরে হুজ্জোত হবে।'

ওখানে বোধহয় ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। বুড়োর হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে বুড়ি তাকে রিক্সার কাছে নিয়ে এলো।

'না মেমসায়েব, আমি ওদের মত নই। ওরা তো গ্রাম থেকে নতুন আসে, তাই সওয়ারীদের ভাড়া নিয়ে বিরক্ত করে।' সুমেরা ঠিক এই কথাটা বলে টুরিষ্টদের কাছ থেকে পাঁচ পাঁচটি টাকা বকশিস পেয়েছিলো। আজ যে সে রকম কোন প্রাপ্তিযোগ নেই সুমেরা আগেই তা বুঝতে পারে। বুড়োর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবে ব্যাপার কি, বুড়ো অন্ধ নয় তো?

ভাল করে দেখে নেয়। দু'জনেরই গায়ের রং কটা। বুড়ির মুখে ছোট ছোট কোঁচ। বুড়োর গালে, নাকের দু'পাশে, চোখের তলায় মায় ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত দু'টো মোটা মোটা মাংস ঝুলে পড়েছে। চশমার পুরু কাঁচ দেখে বুঝতে পারে অনেকদিন আগেই চোখে ছানি পড়েছে। কানে শোনার যন্ত্রের সুতোটা পুরণো কোটের ময়লা কলার বেয়ে সার্টের বুক পকেটে। ব্যাটারিটাও পকেটে। যে দিকেই নজর যায় বুড়ো বোকার মত সে দিকেই তাকিয়ে থাকে। হাতে ছড়ি, হাতটা সব সময়ই কাঁপছে। সুমেরা দেখে ভাবে বুড়োর আর বেশী দিন নেই, যাবার সময় হয়ে এসেছে। বেচারী বোধহয় ব্যাঙ্ক থেকে পেন্সন নিতে এসেছিলো। বুড়ির চেহারা দেখে সুমেরার চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়।

ছড়িতে ভর দিয়ে বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে দু'একবার রিক্সায় ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু অর্ধেকের বেশী পা ওঠে না। সুমেরা সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। বুড়োকে সুমেরা যাতে ছুঁয়ে না ফেলে, চোখেমুখে সেই রকম একটা ভাব করে বুড়ি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে বুড়োর হাতটা নিজের কাঁধের ওপর রাখে। কোমরে হাত দিয়ে খুব সন্তর্পণে রিক্সায় ওঠায়, যেন কাঁচের জিনিষ রাখছে। বুড়োকে রিক্সায় ঠিকমত ওঠাতে পারায়' বুড়ির মুখটা খুসীতে ভরে ওঠে। বুড়ো যেন দু'তিন বছরের কচি শিশু। সুমেরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুড়ি ক্ষমাসুলভ হাসি হাসে, যেন বলতে চায়, আহা বেচারা বুড়ো কি করবে, নিজে উঠতে পারে না। সুমেরা মুগ্ধ হয়ে তার এই মুখের ভাব লক্ষ্য করে। বুড়ির গলার সরু চেনটার দিকে নজর পড়তেই আবার তার সেই হারের কথা মনে পড়লো। সুমেরা এমনভাবে চমকে ওঠে যেন ওদের কিছু দামী জিনিষ ও চুরি করছে ; চুরি করার সময় ধরা পড়ে গেছে।

'বড্ড রোদ, হুড্‌টা তুলে দাও,' বলে বুড়ি ঘুরে এসে পাশের খালি সীটটায় বসে পড়ে।

সুমেরা একটু থমকে যায়। কেবলই মনে হয় পুরনো কোন এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। পেছন থেকে হুড্‌টা তুলতে তুলতে সে আবার ভাবে এইসব ঘটনা আগে সে আর কোথাও ঘটতে দেখেছে। বুড়োকে এমন ভাবে সামলে নিয়ে বুড়ি বসেছে যেন পুজোর মঙ্গল-ঘট আগলাচ্ছে। সুমেরার হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত খোলা। গামছা দিয়ে পা দু'টো ঝেড়ে নেয়। হাত দু'টো ছড়িটার ওপর রেখে বুড়ো চুপচাপ বসে। মনে হচ্ছে সত্যি যেন পুজোর মঙ্গল-ঘট। বিকেলে বাবুকে এসব কথা বলতে হবে। মেমসায়েবের অনুমতি চায়, 'গাড়ী চালাবো কি ?'

'হ্যাঁ। জোরে নয়, আস্তে।'

বুড়োর কোটটা চেপে গেছিলো। সেটা তলা থেকে টেনে বার করে নেয়। তারপর বুড়োর পিঠের দিকে সীটের ওপর হাতটা ছড়িয়ে দেয়।

আবার সেই···সুমেরা যেন এ সব কথা কোথাও শুনেছে। এসব ঘটনাও যেন কোথাও ঘটতে দেখেছে। বারবার রিক্সার স্পীড কমিয়ে দেয়, রিক্সা প্রায় থেমে যায়। পেছন ফিরে একবার ভাল করে ওদের দেখে নেয়। বারবার আকর্ষণ করার মত ওদের এমন কি আছে? পেছন ফিরে ওদের দেখবার কৌতূহল দমন করতে সুমেরা গুনগুন করে গান ধরে: 'টেসুরা রে টেসুরা···টেসুরা কী সাত বহুরিয়াঁ...নৌমণ পিসেঁ দশমণ খায়েঁ...বড়ে মল্লসে জুঝন জায়েঁ। অর্থাৎ মঙ্গল ঘটরে মঙ্গলঘট, মঙ্গলঘটের সাতটা বউ... ন'মণ পিসে দশমণ খায়...বড় পালোয়ানের সঙ্গে যুঝতে যায়। ছোটবেলার একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে জ্বালানো প্রদীপ হাতে নিয়ে মঙ্গলঘটের নানা গান গাইতো। আপন মনেই সে হেসে ওঠে। নিজের অজান্তে পেছন ফিরে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'মেমসায়েব, রোদ লাগছে না তো?'

বার্দ্ধক্যের ছাপ মুখের রেখায় ফুটে ওঠে। প্রতিটি রেখার বিনিময়ে জীবনে মানুষ কি পায়? কোনো বৃদ্ধকে দেখলে সুমেরার মনে এই প্রশ্ন জাগে। টাকা, পয়সা, বাড়ী, স্ত্রী, ধনদৌলত না ছেলেপুলে? না, সারাজীবন কেঁদেই কেটে যায়···রাতের পর রাত জেগে বিড়ি ফোঁকে···না, মদের নেশায় চূর হয়ে নর্দমায় পড়ে গড়াগড়ি খায়। বিশ বছর পরে যখন তারও গালের চামড়ায় এই রকম খাঁজ পড়বে তখনও কি সে এইভাবেই রিক্সা টেনে যাবে? তখনও কি সে ধীরার মাকে মাঝ রাতে ঘুম থেকে তুলে পিটবে? তখনও কি সে ভাববে যে তার কিছু চাওয়া বাকী···তার কোনও জিনিষের কি এখনও প্রয়োজন আছে···না, না, ততদিনে তো ধীরা বড় হয়ে যাবে। কিন্তু সে নিজেই বা তার বাপকে কি সুখ দিয়েছে? আজও তার বাবাকে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে খেতে হয়।

ছ'সাত দিন আগেকার কথা। চুঙ্গির কলের কাছে নাইছিলো।

জল ভরতে এসে বোধার বৌ বললে, 'লাল, তোমার তো হাড়-পাঁজরা সব বেরিয়ে গেছে।' সাবান লাগাতে লাগাতে হাতটা থেমে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে পাঁজরের হাড়গুলো অনুভব করতে থাকে। হঠাৎ খুব দুর্বল মনে হতে লাগলো। চেহারাটাও খুব শুকনো শুকনো মনে হোলো। কে জানে মুখের চামড়ায় হয়তো কোঁচ ধরেছে। তার মুখের খাঁজগুলো বুড়ির মত সরু সরু হবে, না বুড়োর মত মোটা? সঙ্গে সঙ্গে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখে নেবার একটা বাসনা জাগে। এক সময় তারই রিক্সার সামনে আয়না ছিলো, বেলুন উড়তো, চাকার সঙ্গে নানান রঙের ফুলও নাচতো, কিন্তু আজ সব কলকব্জাই তো বিকল। চলতে চলতে কখনও বল পিন্ বেরিয়ে আসছে, কখন বা ফ্রী হুইলটা ঘুরেই চলেছে, আবার কখনও চেনটা খুলে যাচ্ছে। সওয়ারীদের গালি খেতে খেতে মাঝপথে ইঁট কিম্বা পাথর দিয়ে বল পিন ঠোকা কিম্বা চেন লাগাতে গিয়ে হাতময় কালি-ঝুলি মাখা, কি বিশ্রী ব্যাপার। এক এক সময় ওর মনে হয় হোলীর আগুনে রিক্সাটা জ্বালিয়ে দিলেই ভাল হয়। হুডের কাপড় ফালা ফালা হয়ে পতাকার মত পতপতিয়ে উড়ছে, টাঙ্গার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর থেকেই ডান দিকের চাকাটা এঁকে বেঁকে নড়বড় করতে করতে চলে। এইসব সামলাবে না লচ্ছীকে টাকা দেবে। এও এক অদ্ভুত ব্যাপার···নিজের কথা যখনই সে ভাবে তখনই রিক্সার কথাটাও মনে আসে। একটার সঙ্গে অন্যটার যেন নাড়ীর টান···।

ট্রিন, ট্রিন···টাঙ্গার সঙ্গে ধাক্কা লাগার কথাটা মনে হতেই ঘন্টির দিকে হাতের আঙুল কটা আপনা হতেই চলে যায়। আর ঘন্টি বেজে ওঠে, বেজেই থেমে যায়। পেছন ফিরে সুমেরা একবার দেখে নেয়। সওয়ারীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? ঘন্টির আওয়াজটা কানে কত বিশ্রী শোনায় এই প্রথম সে অনুভব করে। বুড়ি খুব যত্নের সঙ্গে বুড়োর কোটের কলারটা ঠিক করছিলো। কানের পাশ দিয়ে যে সুতোটা ঝুলছিলো সেটা দেখে সুমেরার মনে

পড়লো, বুড়ো তো কালা—ঘন্টির আওয়াজ ও কি করে শুনবে? আচ্ছা, তাহলে এই বুড়ো যখন মরে যাবে তখন বুড়ী কি করবে? বেচারী বুড়ীর তো ভীষণ খারাপ লাগবে। বাড়ীতে ছেলেপুলে আছে নিশ্চয়ই? হরি, হরি, আজকাল আর মা-বাপের জন্যে কে ভাবে? সুমেরার নিজের বুড়ো বাপের কথা মনে পড়ে। অনেক-বারই তার মনে হয়েছে বাবার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়…যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও। এখন তুমি ভগবানের নাম জপ করো, আর আমি শ্রবণ কুমারের মতন তোমার সেবা করি।…কিন্তু যখনই তার বাপের প্রহারের কথা মনে পড়ে তখনই এই সব সুবুদ্ধি উবে যায়। কনকনে শীতের মাঝরাতে লাথি, ঘুষি আর গালিগালাজ তার কানে যেন এখনও তীরের মতন বেঁধে। 'শালা, হারামজাদা, ও তোর আসল মা না হতে পারে, তবু তো সে তোর মা। তোর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঘূণ ধরবে। যদি যৌবনের লালসা এত বেড়ে থাকে তবে বেশ্যাবাড়ী যা। খবরদার যদি আর এ বাড়ী মাড়িয়েছিস তো তোরই একদিন। টুকরো টুকরো করে কুকুরের মুখে দেবো।' সেই রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সুমেরা প্রথম যে ট্রেনটা ধরলো সেটা যাচ্ছিলো ছিন্দবাড়, আর ঐখানেই তো সেই হারের ঘটনা।

রিক্সা আস্তে আস্তে চলছে আর চেন থেকে 'কির্ কির্' করে আওয়াজ বেরুচ্ছে। বুড়ির গলার হারের কথা মনে পড়তেই আর একবার পেছন ফিরে দেখে নেয়। নিজের বাপের কথা চিন্তা করে এই বুড়ো-বুড়ির জন্যেও তার দয়া হয়। দু'জনেরই চেহারার মধ্যে কেমন সুন্দর একটা প্রশান্তি, তৃপ্তি আর কোমলতার ভাব, যেন তীর্থ করে ফিরছে। দেখেই মনে হয় এদের জীবনটা বেশ সুখেই কেটেছে। আর আমার বাপ এই বুড়ো বয়সে কাঠফাটা রোদ্দুরে কর্ণিক করে চূণ বালি দিয়ে ইঁট গাঁথছে…যদি মেরেই থাকে তাতেই বা কি? ওর নিজেরও তো দোষ ছিলো। নিজের অভ্যেসও তো ভালো ছিলো না। বয়সের দোষে একটা অন্যায় না হয় হোয়েই গেছে।

হ্যাঁ, হারের কথাটা নিশ্চয়ই…কে জানে এই দু'টো ভার তার বুকে আরো কতদিন বোঝা হয়ে থাকবে।

হঠাৎ চমকে উঠে রিক্সা থামিয়ে দিলো। এই বুড়ো-বুড়ি সেই মালবাবু আর তার স্ত্রী নয় তো? ফিরে দেখে, ধ্যেৎ, ওরা তো হিন্দু। ঝুঁকে পায়ের ডিম চুলকোতে থাকে। সত্যি বলতে কি, যেন মালবাবুর সঙ্গে হঠাৎ কোনদিন দেখা না হয়ে যায়, এই তার ভয়। চিনতে কি আর পারবেন?…না জানি কত স্টেশনে তিনি বদলী হয়েছেন আর কত কুলিই না তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

সহরের পাকা রাস্তার সঙ্গে কাঁচা রাস্তাটা যেখানে মিশে গেছে সেখানে অশ্বত্থ গাছের তলায় চূণকাম করা ঘুলঘুলিটির মধ্যে সিঁদূরে রঙের হনুমানজীর সামনে দিয়ে রোজ সে যখন যায় তখনই তার হারের কথা মনে পড়ে। মালবাবুর স্ত্রীর মুখে কাপড় গুঁজে তাঁকে ঘরে আটকে রাখা, হার ছিনিয়ে নিয়ে পালানো, দু'মাস সেটাকে পুঁতে রাখা আর তারপর মা মরার ছুতো করে এখানে এসে মঙ্গীর সঙ্গে রাত ভোর বসে সোনা গলানো…সবই এক নিমিষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যতদিন রিক্সাটা আছে ততদিন সে হারের কথাটা ভুলতে পারবে না। এ না হলে আজ সেও মঙ্গীর মতন কখনও রিক্সা ধার করে এনে চালাতো, কখনও বা চূণের বালতি আর কুঁচি নিয়ে চূণকাম করে ফিরতো। ওর মনে হয় রিক্সাটা যেন ওর নিজের নয়—ধার করা।

কখনো কখনো এক অদ্ভুত খেয়াল চাপে।…কিছু টাকা জমিয়ে ঠিক ঐ রকম একটা হার গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মালবাবুর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলবে, 'হুজুর, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম…'

'ঐ সামনের ফটকে দাঁড় করাও'—কথাটা হঠাৎ তার কানে গেলো।

ফটকের সামনে রিক্সাটাকে থামিয়ে সে পেছনে তাকালো। বুড়োর ঠোঁটের কোণ দু'টো রুমাল দিয়ে বুড়ী সযত্নে মুছে দিচ্ছিলো যেমন

শিশুকে দুধ খাইয়ে মা মুখ মুছিয়ে দেয়। বুড়ী ওর কতই না দেখাশোনা করে।

স্টেশনের পথে যেতে অনেকক্ষণ ধরে সে এই সওয়ারী দু'জনের কথাই ভাবছিলো। মার কথা ওর মনেই পড়ে না। সৎ মার জ্বলন্ত চেলা কাঠ দিয়ে পেটানোর কথা তার কখনো-সখনো মনে পড়ে, কিন্তু তিন নম্বর যাকে বাবা কিনে এনেছিলো তার সুরেলা কণ্ঠস্বর তাকে অনেকদিন পাগল করে রেখেছিলো। এতে তার কি দোষ? দোষ তো তার বাপেরই। কয়েকবার সে বাপের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছিলো। বুড়োর এক পা তো ঘাটের দিকে তবু কামনার যেন শেষ নেই! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আজ ও এমন কি দেখলো যার জন্যে ওর সব কথাই মনে পড়ছে? রিক্সায় সওয়ারী বসালো, পয়সা নিলো, কিন্তু কেন ওর মনে হয় যে এইমাত্র সে কিছু পুণ্য করেছে? ও যেন আজ এমন কিছু জানতে পেরেছে যার সঙ্গে ওর জীবনের কোনো যোগাযোগই নেই।

ঠিকেদারের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় সে ষ্ট্যাণ্ডের বাইরে গাছের তলায় রিক্সা একটু বেঁকিয়ে দাঁড় করায়। সীটের ওপর শুয়ে পড়ে গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। সওয়ারী তো এখানেও পাওয়া যাবে। ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালে এক আনা পয়সাও যাবে আবার লাইনেও দাঁড়াতে হবে। বাস চলা উচিত নয়—এই কারণে আজ ধর্মঘট। লোকেরা মিছিল বার করেছে। কিন্তু এই ঠিকেদার আর সিপাইদের ঘুস খাওয়াতে কেউ কিছুই বলে না। ওরা যেন লুঠছে। আজকাল তো আমাদের মন্ত্রী সায়েবও নেতা বনে গেছে! পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর জ্যাকেট চড়িয়ে ঘুরে বেড়ান। আগে তো সারা গায়ে চুণের ছিটে লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী চুণকাম করে বেড়াতো। দেখতে দেখতে লোকেরা কি তাড়াতাড়ি পালটে যায়। সিদ্ধি এই মন্ত্রীবাবুকেই বিনা জমানতে রিক্সা দিতে রাজী হয়নি। আচ্ছা নয় মেনেই নিলাম, সুমেরার সে বিয়ে দিয়েছে, রামদেই-এর বাপের সঙ্গে দেনাপাওনাও ঠিক করেছে, কিন্তু সুমেরাও তো তাকে গলানো

সোণার পুরো ভাগ দিয়েছে। ওর ভাগটা ও যদি মদ খেয়ে আর সিগারেট খেয়ে ওড়ায়, সিনেমা দেখে ফুঁকে দেয়, জুয়ো খেলে, দিনের পর দিন বাড়ী থেকে গায়েব থাকে তো সুমেরা কি করতে পারে। সুমেরা তো আর ভাঙ খেয়ে নেশা করেনি যে তোমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মেটাবে আর তোমার বদখেয়াল চোখ বুজে সহ্য করবে···

সুমেরার মেজাজ তেতো হয়ে যায়। নীচ কোথাকার ! যার খাবে, তারই দাড়ি ওপড়াবে। রিক্সায় শুয়ে শুয়ে হাতটাকে মুঠো করে দূরবীণের মতো চোখের ওপর লাগিয়ে সে গাছের পাতা আর আকাশ দেখে। ছোটবেলা থেকেই এই খেলাটায় তার খুব মজা।

এক বেলে পাথরের খেলনা তৈরীর কারখানায় সে কাজ করতো। সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে এই রকম হাত মুঠো করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের চাঁদ দেখতো। কখনও দেখতে পেতো চাঁদের ভেতর বসে বুড়ী চরকা কাটছে, কখনও হরিণ ছুটছে। এখনও হাওয়ায় কাঁপানো নিম পাতাগুলোর ভেতর দিয়ে ওপরের গাঢ় নীল আকাশ দেখতে পায়, টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে, যেন বক পাখী উড়ে চলেছে···

হুঁঃ, মঙ্গী সায়েব আবার রামদেই-এর জন্যে ঝুমকো এনেছিলো··· 'রেলের নিলামে ফেঁসে গেছিলাম, প্রথমে কিছু বকশিসের আশায় চড়া ডাক ডাকতে থাকি, এক ডাকেতে বেটারা আমার হাতে জিনিষটাই ধরিয়ে দিলো। এ নিয়ে আমি কি করবো বৌদি ?' কে জানে কবে থেকে এইসব ফন্দি আঁটা হচ্ছিলো আর সেদিন যদি আমি টিউব বদলাতে ফিরে না আসতাম তাহলে হয়তো এই ব্যাপারটা কোনদিন জানতেই পারতাম না। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখে সারাদিন সিনেমার গান গেয়ে বেড়ালে এ ছাড়া আর কি শিখবে··· ! রিক্সা এমন ভাবে চালাবে যেন সার্কাসের খেল দেখাচ্ছে, মনে হবে রিক্সাতো নয়, যেন হাওয়াই জাহাজ। এমন ভাবে মোড় ঘুরবে যেন মোটর গাড়ী। ভালোই হয়েছে, এ্যাক্সিডেণ্টে শুধু

মাথাটাই ফেটেছিলো। না হলে বাছাধনকে সোজা স্বর্গে যেতে হোতো। বাছাধনকে 'ঘর আয়া মেরা পরদেশী' গান আর গাইতে হোতো না। আর ঐ হারামজাদী রামদেই, লজ্জা ঘেন্নার বালাই নেই। ওর তো লজ্জায় ডুবে মরা উচিত ছিলো, কিন্তু তা না করে আবার রুখে উঠে জবাব দেয়, আগে নিজের দিকটা ভাবো, তারপর কথা বোলো।

সে তো তোমার মা, তাকে কিনেই আনো আর ভাগিয়েই আনো। এত মার খেলো কিন্তু বেটীর চোপা বন্ধ হোলো না। বাপের অহমিকাতেই গেলো। বাপ গাম পঞ্চায়েতের মোড়ল বলে নিজেকে কি না কি মনে করে। এই রকম সব বাপেদের শ্রেফ ঠেঙিয়ে মারতে হয়। শালা ঠগবাজ···হাতে কিছু গুঁজে দাও আর যে রকম ইচ্ছে সে রকম ফয়সলা করিয়ে নাও। পঞ্চায়েত তো নয় যেন লুটের কারবার! শোধ তুলবে আমাদের।...ভাগ্যিস ধীরা স্নেহ করতো, তা না হলে সারাজীবন ঐ বাপের কাছেই পড়ে থাকতে হোতো, না হয় আর কাউকে পাকড়াও করতো।

কী সব আজে বাজে কথা মনে হয়, খোস মেজাজটা একেবারে মাটি হয়ে গেলো। হ্যাক থুঃ, গলা থেকে গয়েরটা টেনে পেছন দিকে ফেলে দিলো। জামার হাতায় মুখটা মুছে নিয়ে আবার মেঘ দেখতে লাগলো। কেমন একের পর এক ভেসে আসছে, যেন নীল জলেতে সাদা রুমাল ভেসে যাচ্ছে।···ওহো, ও তো একটা রুমাল পেয়েছিলো? এইবার মনে পড়েছে। এই কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করছিলো। মার খেয়ে রামদেই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ওর বাপের কাছে চলে যায়। তার দু'এক দিনের পরের কথাই তো··· ।

সারাদিন মনটা খারাপ ছিলো। শুয়ে শুয়ে কাঠবেড়ালীর কুটুর কুটুর আওয়াজ, মুরগী আর বাচ্চাদের পাঁশ গাদা থেকে পা দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাবার খাওয়া দেখছিলো। দানা খুঁজে মুরগীটা চুকচুক করে আওয়াজ করছে আর বাচ্চাগুলো ছুটে এসে তার ঠোঁটের কাছে

ভীড় করছে। মাটিতে ঝুলে পড়া খাটে শুয়েছিলো। ময়লা, তেল-চিটে বালিশের তলা থেকে, 'তোতা-ময়নার গল্প' আর 'দিলবাহার' সিনেমার গানের বই বার করে খানিকক্ষণ পড়লো। কাঠ দিয়ে মুজের দড়ি ঠুকে ঠুকে চূণকামের কুঁচি তৈরী করলো। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিলো না। যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই এক কথা, রামদেইর কোনো দোষ নেই, দোষ সব তারই। বেটারা সব ধাপ্পাবাজ, নীচ আর মতলবী। আট-দশ ঘর লোকের মধ্যে নিজের বলতে রিক্সা ওর একারই, সবাই ভাবে না জানি ওর কাছে কত টাকাকড়ি আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঘসে ঘসে রিক্সাটা ধুতো। ধুয়ে-মুছে চকচকে করে ফেলতো। ভূরার বৌ একটা বাড়ী ছেড়ে বিসনের কাকীর সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে ঝগড়া করছিলো। 'ভাতারখেগো, তোর মনে কোনো ভয়ডর নেই। আগে ওকে বাড়ী ফিরতে দে, যদি না তোর বাপের কাছ থেকে চশমা আদায় করে ছাড়ি তো আমার নাম নেই। বেটী হারামজাদী, চোর, মিথ্যেবাদী কোথাকার।' কি বিশ্রী গলার আওয়াজ, মনে হয় গিয়ে গলাটা টিপে দি। বাচ্চাদের ছ'পয়সা দামের চশমাটা হয়তো ভেঙ্গে গেছে, তার জন্যেই সকাল থেকে এত চেঁচামেচি আর হুজ্জোত। দিনরাতই জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। এক মিনিটের জন্যেও সোয়াস্তি নেই। শালা, নীচ গেঁইয়া কোথাকার।

সেকেন্দ্রার সামনে গিয়ে রিক্সাটা দাঁড় করালো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রিক্সা থেকে নেমে এক পাশে দাঁড়িয়ে মুড়কি খাচ্ছিলো। শোঁ করে দু তিনটে গাড়ী ভেতরে গেলো, তারপর বেরিয়ে এলো। মাথায় রুমাল বেঁধে কটা চামড়ার মেয়েগুলো এমনভাবে গাড়ী চালায়, যেন মনে হয়, মায়ের পেট থেকেই গাড়ী চালানো শিখে এসেছে। গাড়ী বেঁকানো, স্টার্ট করা, ছুটে যাওয়া সব কিছুই সে মুগ্ধ হয়ে দেখে। ভাবে গাড়ী চালানো শিখলে এমনি ভাবেই সাঁই করে গাড়ী নিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারতো। আবাগী রামদেইকে একবার গাড়ীতে চড়াতে পারলে বুঝতো আমার কদর,

ভাবতো আমিও একজন কেউকেটা। তখনই নজরে পড়লো একজন লোক মাথায় বড় একটা পাগড়ী বেঁধে হাঁটু পর্যন্ত ধুতী তুলে হাঁ করে সেকেন্দ্রার গম্বুজগুলো দেখছে আর অন্য জনকে বলছে—'দেখ, মীনারগুলো আকাশ ছোঁয়া। কি অদ্ভুত, না।' তারপর সুমেরার দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, 'কি ভাই এটা কি আকবরের কবরখানা ?'

খাওয়া ভুলে গিয়ে সুমেরা হো হো করে হেসে ওঠে। লোকটাকে বেশ সদাসিধে মনে হয়। সুমেরা বললো, 'ঠাকুর সায়েব এটা সেকেন্দ্রা, এখানে আকবর বাদশাহকে গোর দেওয়া হয়েছিলো। কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?'

সুমেরা যে হাসছিলো ঠাকুর সায়েব তা দেখতে পায়নি। ঠাকুর সায়েব হাঁ করে সেইভাবেই দেখছিলো। 'কি সৌখিনই না ছিলেন আকবর বাদশাহ। মরার জন্যে কি সুন্দর জায়গাই না বেছে নিয়েছেন।' সুমেরার কথার জবাব দিতে দেরী হওয়ায় একটু বিব্রত হয়ে বললো, 'আমরা তো ভাই ভরতপুরের লোক। এরকম জিনিষ আর কোথায় দেখবো বলো ? শুধু 'ডীগ' এর কেল্লা দেখেছি। এদিকে কাজেতে এসেছিলাম, যাওয়ার পথে দেখে যাচ্ছি।'

ঠাকুর সায়েব চলে গেলে বুন্দন টাঙ্গাওলা বললে, 'আরে, এ বেচারা তো সবে গ্রাম থেকে এসেছে। আমি তো সহরের বড় বড় কেতাদোরস্ত লোককেও এমন বোকা বানিয়েছি যে তারা আজও নিশ্চয়ই মাথা চাপড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ইংরেজ বা আমেরিকান হলে পাঁচ দশ টাকা বকশিসও আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এ শালাদের কাছে কি আছে ? ঘণ্টাখানেক বকিয়ে মারবে তারপর অচল পয়সা ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়বে। তাই করতাম কি, স্টেশন থেকে সোজা নিয়ে এসে সেণ্ট জনস্ কলেজ বিল্ডিং-এর আশেপাশে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতাম। বলতাম দেখে নাও, এইটাই সেকেন্দ্রা, আজ বন্ধ···আরে হ্যাঁ, কোন শালা ঘোড়াকে তিক্ তিক্ করে এতদূর নিয়ে আসবে। সোজা পকেটে পাঁচ টাকা এসে গেলো। আল্লা আল্লা খৈর সল্লা অর্থাৎ ভগবান যা করেন তাই ভালো।

সারা পৃথিবীর লোক এখানে এসে ভেঙ্গে পড়ে। জানিনা, এই কবরগুলোতে তারা কি দেখতে পায়। দেখবার মত আমি তো কিছু খুঁজে পেলাম না। তবে হ্যাঁ, গাইডদের মুখে কাহিনী শুনে নিশ্চয় খুসী হয়, এমনি গল্পতো রোজ আমরাও তৈরী করে শোনাতে পারি।'

সত্যি বলতে কি এই কথাটাই সুমেরা আজ পর্যন্ত বুজে উঠতে পারেনি।

'রিক্সা, এই রিক্সা।'

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন্টি বেজে ওঠে ট্রিনন ট্রিনন। সুমেরা চমকে যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। সওয়ারী এসে গেছে। এগিয়ে গিয়ে ভাবে, খালি তার রিক্সাটাই সবচেয়ে নতুন আর ফ্যাসানেবল। সওয়ারী আর কোথাও যেতেই পারে না।

এক যুবক ও যুবতী দাঁড়িয়েছিলো। হাল্কা ছাই-রঙের বোতাম-না-আঁটা চেষ্টার, সামনে একটা বিনুনি ঝোলান, অন্যটা পেছনে ঢুলছে, রঙ ফরসা, লম্বাটে মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখ।...মেয়েটি চেষ্টারের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছেলেটিকে কিছু বুঝিয়ে বলছিলো। ছেলেটির পরণে একটা গরম জার্কিন ও প্যাণ্ট। রঙ বেশ কালো। অনবরত মাথার চুলগুলো ঠিক করছিলো—আসলে কিন্তু প্রত্যেকবারই চুলে হাত দেওয়ায় সেগুলো অগোছালে হয়ে পড়ছিল। ব্যাপারটা যে একটু গোলমেলে তা বুঝতে সুমেরার মোটেই দেরী হয় না। এই ব্যাপারে সুমেরার বুদ্ধি বেশ খোলতাই হয়ে গেছে। সুমেরা আঁচ করে এদের বাইরের এই নির্ভয় ও নিশ্চিন্ততার ভাবটা আসলে কিন্তু সত্যি নয়। এরা এইভাবে ভেতরের ধুকপুকুনি ঢাকা দেয়। সুমেরা জিজ্ঞেস করলো, 'তাজমহল সায়েব?' মনে ভাবে তাজগঞ্জের দিকে গেলে রামদেই শালীরও একটা খবরাখবর বাইরে থেকে নেওয়া যাবে। পাঁচ দিন তো হয়ে গেলো।

'দয়াল বাগ', ছেলেটি জবাব দেয়।

'যাবো সায়েব', বলে সুমেরা সীটের গদিটা চাপড়ালো।

'চলো, উঠে বসো', মেয়েটির কনুইয়ে হাত দিয়ে ছেলেটি বললো। ছেলেটি বড় গাছগুলো আর চা-ওলাকে একবার দেখে নেয়।

'হুডটা তুলে দাও', মেয়েটি বললো। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সুমেরার কেন যেন বেশ ভালো লাগে। হঠাৎ মেয়েটির গলা শুনতে পেয়ে সুমেরা চমকে উঠলো। মেয়েটি বলছিলো: 'এর সঙ্গে আগেই ভাড়াটা ঠিক করে নেওয়া উচিত ছিলো। না হলে পরে টুরিষ্ট ভেবে এরা সবাইকে বিরক্ত করে।' তারপর চেষ্টারটা গুটিয়ে মেয়েটি বসে পড়লো। উঠে বসবার সময় সুমেরা মেয়েটির পায়ের ডিমটা দেখতে পায়, তার মনে একটু সুড়সুড়ি লাগে। হুডটা খুলে দিতে দিতে ইচ্ছে হোলো জিজ্ঞেস করে, 'সামনের পর্দাটাও টাঙ্গিয়ে দেবো, মেমসায়েব?' একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভেবে সে বললে, 'যারা পয়সা নিয়ে ঝগড়া করে আমি তাদের দলে নই মেমসায়েব।'

দু'জনেই রিক্সায় উঠে বসলো। সুমেরা একটু ভালো করে দেখলো যে মেয়েটি ওর সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয় তার জন্যে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে আছে। মেয়েটি যে হাসছে তা পাশ থেকে তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। এই মুখ-ভঙ্গিমা ওর এত ভালো লাগলো যে ইচ্ছে হোলো আস্তে করে···ঘন্টির ওপর বুড়ো আঙ্গুলটার চাপ পড়লো, ট্রিনন ট্রিনন···। 'একটু সরে বসো না, পেছনে আমার হাতটা রাখি', ছেলেটি বললো।

রিক্সাটাকে ঠেলে ঠেলে পীচের রাস্তায় নিয়ে এলো। মনে মনে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, শুধু হাত কেন, পেছনে শুয়েই পড়না।' আর একবার শুধু শুধু ঘন্টি বাজালো, ট্রিনন ট্রিনন।

'আরে ভাই একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে', মিষ্টি গলায় মেয়েটি বলে।

এইবার বাড়ী ফেরার তাড়া পড়েছে, মা যে পিটবে। তখন থেকে ভেতরে বসে বসে বেশ মজা লুঠছিলে? সুমেরা উত্তর দিলো, 'এই দেখুন না উড়োজাহাজের মতন উড়িয়ে নিয়ে যাবো।' পীচের প্লেন

রাস্তায় রিক্সা চলতে সুরু করলো। সুমেরার মন বেশ খুশীতে ভরে ওঠে। দাঁত মুখ চেপে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রিক্সাটা চালানোর জন্যে তার মন নেচে উঠলো।

মঙ্গীকে একবার একটি মেয়েকে ইস্কুলে ছেড়ে আসার জন্যে সে মাস মাইনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। মেয়েটিকে রিক্সায় বসিয়েই মঙ্গী এমন জোরে রিক্সা চালাতো যে বেচারী তিন দিন যেতে না যেতেই ভয়ে তাকে আস্তে আস্তে রিক্সা চালাতে বলেছিলো। উত্তরে মঙ্গী বলেছিলো, 'গরুর গাড়ী করে যদি যাবার ইচ্ছা থাকে তবে সুমেরার গাড়ীতে গিয়ে বসুন। মঙ্গীর গাড়ী তুফান মেলের চেয়ে কম নয়।' 'এই-ই আমার গরুর গাড়ী। উল্লুকা পাঠ্ঠা।' সুমেরার কখনো কখনো বেপরোয়াভাবে রিক্সা ছোটাতে কেন ইচ্ছে হয় আজ বুঝতে পারে। ওদের দু'জনের কথাবার্তা শোনার জন্যে কান-খাড়া করে থাকে।

'যাই বলো না কেন রিক্সাটা বেশ ভালো', ছেলেটির গলা শোনা যায়।

'ভালো তো বটেই, এ রকম ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারা গেছে', মেয়েটি হাসলো।

সুমেরা ভাবতে থাকে, হাসার সময় মেয়েটির মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে। আরও শুনতে পায় : 'দেখ. হাতটা একটু সরিয়ে নাও, এটা বড় রাস্তা। রিক্সাওলাও তো···' বাকীটুকু খটোমটো ইংরিজিতে বললো।

রিক্সাওলার জন্যে এত ভাবনার কি আছে।

বাছাধনরা এখন অন্ধ। মজা লুটে নিতে দাও। মা বাপের চোখে ধুলো দেওয়া···এখানে কে কি করতে আসে সবই আমার জানা আছে। দিনে দু' তিন বার তো তোমাদের মতো সওয়ারী জোটে। সুমেরা মনে মনে ভাবে, মেয়েটিকে যেন কোথায় দেখেছে, ছেলেটিকে কিন্তু এখানকার বলে মনে হয় না। হয়তো একেও মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরুতে দেখে থাকবে।

'সত্যি খুব দেরী হয়ে গেছে', ছেলেটি বলে ওঠে। 'ওদিকে ফুট-পাথে এখনও একটু রোদ।'

'এখন মনে হচ্ছে দেরী হয়ে গেছে। আর আমি যে তখন থেকে বলছি, দেরী হয়ে গেছে, তা' বুঝি খেয়াল হয়নি? তখন তো বলছিলে, তাড়ার কি, হাতে এখনও অনেক সময়।' মেয়েটি চটে ওঠে।

'তা হবে বাবা, তোমার এই তাড়ার চোটে প্রাণ তো যাবার জোগাড়।'

'আস্তে বলো না! ও যে শুনে ফেলবে', মেয়েটি ছেলেটির হাতে চিমটি কাটে।

হুঁ, এখন জোরে চালাও…আস্তে বলো…তখন তো গল্পে মশগুল ছিলে। তখন রিক্সাওলার কথা খেয়াল হয়নি? আরে, রিক্সা তো রিক্সাই, মোটরগাড়ী তো আর নয়।…ভগবান করে, দিল্লী মুখো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্যে ফটক বন্ধ থাকে। শালাদের বাড়ী গিয়ে উত্তমমধ্যম হবে।

'না না, এমন আর কি তাড়া, আস্তে আস্তে হাওয়া খেতে খেতে চলো দোস্ত। অনেকটা পথ, হাঁফিয়ে পড়বে।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর আর তাড়া কিসের? তুই তো বেটা এখন হাতে স্বর্গ পেয়েছিস। বাড়ী ফিরে যা কিছু দক্ষিণে তাতো ওরই পাওনা। তুই তো…কার মেয়ে-বৌকে ফুসলে এনেছিস। মেয়েটির জন্যে সুমেরার একটু দয়া হয়। গাড়ীর স্পীড কিন্তু সে কমিয়ে দেয়।

পেছনে ঝটাপটি হচ্ছে মনে হোলো। ওর শরীরটা ঝিমঝিম করে ওঠে। ইচ্ছে হয় তক্ষুণি রিক্সা থামিয়ে ওদের নামিয়ে দেয়। কেবলই তার মনে হয় সে একটা গর্হিত কাজে সাহায্য করছে। বাধা দেওয়া উচিত। ছেলেটা নিশ্চয় পাজী, বদমাস। সত্যি বলতে কি মেয়েরা বড় সাদাসিধে। অল্প একটু ঢালু জায়গায় প্যাডেল বন্ধ করে ব্রেক কসে বীরের মতো বুক ফুলিয়ে সুমেরা খাড়া হয়ে বসে থাকে। ওদের যেন বলতে চায় যে ওদের সব চালাকি

সুমেরা বোঝে, সব বুঝেও চুপ করে আছে। শালারা কেমন করে বসে আছে তা দেখবার আগ্রহ সুমেরার প্রতিটি শিরা উপশিরায়। কান খাড়া করে ওদের প্রতিটি কথা শোনে। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায় ওরা কেমন করে বসে আছে আর কথা বলছে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। শুধু পেছনের চাকতি আর চেনের কিরর কিরর আওয়াজ শোনা যায়। সুমেরা এই আওয়াজ শোনায় অভ্যস্ত। গোড়ায় গোড়ায় কিন্তু এই আওয়াজে সে চমকে উঠতো। তার মনে হোতো বুঝি পেছন দিক থেকে আর একটা সাইকেল আসছে।

আরে, এরা দেখছি একেবারে চুপচাপ। ঝগড়া করে বসে আছে নাকি? সুমেরার ভাবনা হয়। ছেলেটা নিশ্চয়ই কিছু দুষ্টুমি করেছে। আজকালকার ছেলেরা সিনেমা দেখে দেখে বুদ্ধির মাথা খেয়েছে। এদের চাল-চলনের তো কোনো মাথা-মুণ্ডুই নেই। আরে বাবা মেয়ের মন কেনা কি এতই সোজা, আস্তে আস্তে এগোতে হয়।

সুমেরা দূর থেকেই দেখতে পায় রেলের ফটক বন্ধ। বেচারী মেয়েটির আরো দেরী হবে। মনের ভেতর নিশ্চয় খুব ধুকপুকুনি হচ্ছে। অথচ কেমন হেসে হেসে কথা বলছে।

এতক্ষণে নিস্তব্ধতা ভাঙে। ছেলেটি বলে 'এই যে ডান দিকে পাথরের ঘোড়াটা দেখছো, লোকে বলে এটা অমর সিং রাঠোরের। কেল্লার কাছে ঠিক এই রকমই আর একটা আছে। ঐখানে লাফিয়ে পড়েছিলো আর এইখানে এসে মরেছিলো। পেছনে ছিলো সৈন্যদল।...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে, ইতিহাস আমিও পড়েছি' মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

লে হালুয়া, আরো শোনো, প্রথমে মেয়েটাকে চটিয়েছে এখন অমর সিং রাঠোরের ঘোড়ার কথা শোনাচ্ছে।...অমর সিং রাঠোর তোর বাপ ছিলো নাকি, সব মজাটাই মাটি করে দিলো।

আসলে ঘোড়াটা কার ওর নিজেরও জানা ছিলো না। কেউ বলে ঘোড়াটা হুমায়ূঁর, কেউ বা বলে ওটা অমর সিং রাঠোরের।

চড়াইতে রিক্সাটা টানতে টানতে নিয়ে যাবার সময় মেয়েটির চটি পরা পায়ের সঙ্গে তাব পা প্রায় ঠেকবো ঠেকবো করছিলো। মেয়েটির পায়ের স্পর্শ পাবার প্রলোভনটা কি করে যে সুমেরা দমন করেছিলো তা শুধু সেই জানে। এই কালো কুৎসিত ছেলেটা এমন পরীর মত সুন্দর মেয়েটাকে কেমন ফাঁসিয়েছে। শাড়ীর পাড়টা আঙ্গুলের ওপর কি সুন্দরই না খেলছে।

'আমরা কি একটু নেবে যাবো রিক্সাওলা?' ছেলেটি সীটটা ধরে উঠতে চায়। 'না সায়েব, এতো সামান্য একটু চড়াই।'

সুমেরা দু'জনকে একটু দেখে নেয়। দু'জনেরই মন বেশ খিঁচড়ে আছে তা পরিষ্কার বোঝা গেলো। কিন্তু কেন?

'নাও, আজ তো মরেছি। ফটক যে কখন খুলবে তা ঈশ্বরই জানেন', ছেলেটা বিভ্রান্ত হয়ে বলে ওঠে। 'আজ সবই বিরূপ মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণ পরে ফটকটা নজরে পড়লো? নারাজ তো বটেই।

'দেখো উর্ম্মি, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। এখন তুমি যদি এইরকম করো...তাহলে বলো, আমরা কি যেতে যেতেও ঝগড়া কোরব? তোমার এই অভ্যেসটাই আমার ভালো লাগে না।'

'আর তোমার স্বভাব যেন খুব ভালো।' রিক্সাটাকে এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে যখন সুমেরা পেছনের চাকায় ইটের ঠেকনো দিচ্ছিলো তখন সে মেয়েটির কাঁদ কাঁদ গলা শুনতে পেলো, 'ও রিক্সাওলা, তুমি ভাই একটু জিজ্ঞেস করো না, গেট খুলতে আর কত দেরী। যদি খুব বেশী দেরী থাকে তাহলে ওধারে গিয়ে অন্য রিক্সা ধরে নি।'

মেয়েটির মুখে একটা নিরীহ ভাব দেখে সুমেরার করুণা হয়। সুমেরার মনে হয় যত দোষ তা ছেলেটির। সুমেরা প্রথমে ঠিক করেছিলো যে ঐখানে দাঁড়িয়ে ঘন্টিটা ঠিক করে নেবে। কিন্তু

মেয়েটির প্রশ্নে ঘন্টিটা আর ঠিক করা হোলে না, জবাব দিলো, 'এক্ষুনি এসে যাবে সায়েব, সিগন্যাল তো ডাউন-ই আছে।' বলেই সে ফটকওলার কাছে এগিয়ে যায়। একটা ট্রাক, দু'টো মোটর গাড়ী, একটা টাঙ্গা আর দু'একটা রিক্সা লাইন করে দাঁড়িয়েছিলো। পরণে নীল পোষাক আর বগলে লাল ও সবুজ দু'টো নিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে। ফটকওলার কাছে এগিয়ে সুমেরা বলে, 'পণ্ডিতজী, একটা বিড়ি দাও তো।'

এখান দিয়েই সুমেরাকে রোজ যাতায়াত করতে হয়। ফটকওলা তার দোস্ত। 'বিড়ি তোর বাপ রেখে গেছে না?' দু'চারটে ফষ্টিনষ্টি করার পর দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকে। বিড়িতে কষে এক টান দিয়ে সুমেরা তার ভেতরকার সমস্ত আবেগ চাপা দিতে চেষ্টা করে। সে যে একটা ঘটনার কথা জানে, সে কথা কাকে বলবে। আর সে নিজেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে। কথায় কথায় ফটকওলা জানতে চাইলো, 'সওয়ারী কোথাকার? দিব্যি খাসা তো।' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুমেরা হেসে উত্তর দিল: 'আরে, পণ্ডিতজী এই তো আমার কাজ। একি আর নতুন কথা? আমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুনিয়ার মজা দেখি।' তারপর একটু খাটো গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বলতো, সোজা এদের দু'জনকে থানায় নিয়ে যাই? এরা মিয়া-বিবি নয়।'

'বেটা টের পাবে, বাছাধন এমন জুতো পেটা খাবে যে মাথার চুল কগাছা সব উড়ে যাবে। সব ভুলে যাবে বাছাধন। আজকালকার মিয়া-বিবিদের তুমি তো চেনো না। শালা, ভাইবোনও এদের কাছে পাত্তা পায় না। তুমি বাছা রিক্সা টানো, আর দুনিয়াকে নিজের মতে চলতে দাও।' রেলের ঘড় ঘড় শব্দ এদের কথায় বাদ সাধে। ফটকের থামগুলোকে থরথর করে কাঁপিয়ে, 'কু ঝিক্ ঝিক্' করতে করতে ট্রেনটা চলে যায়।

ক্লান্ত পায়ে সুমেরা ফিরে আসে।

এরই মধ্যে ওদের বোধহয় ভাব হয়ে গেছে। মেয়েটিকে আবার

বেশ হাসিখুসী দেখাচ্ছে। সুমেরার খুব ভাল লাগে। মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে তার মন চায় না।

'ধরো যদি তোমার বাবা এই গাড়ীতে ফেরেন তাহলে?'

সুমেরা সবে হ্যাণ্ডেলটা ধরছে এমন সময় ছেলেটির দুষ্টুমি-ভরা গলা শুনতে পায়ঃ 'বাড়ীতে ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করলে শুনবে তাঁর মেয়ে উর্মি, মীনার বাড়ী গেছে।' বলে দেব, 'দেরী হয়ে গিয়েছিলো, তাই তার ভাই পৌঁছে দিতে এসেছিলো।'

'তার ভাই সেকেন্দ্রার দিকে থাকে তো? তাই না? এ তো আর জানেন না যে মীনার ভাই ওষুধের কোম্পানীর এজেণ্ট। বম্বেতে থাকে, দিল্লীতে এসেছে।' বলেই দু'জনে খিল খিল করে হেসে ওঠে। তখন সবে অন্ধকার হয়ে এসেছে।

'আমরা যখন রিক্সাতে চড়ছিলাম তখন রিক্সাওয়ালাটা আমার দিকে এমন বিশ্রীভাবে তাকিয়েছিলো, আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আমাকে চিনে তো...'

সুমেরা আবার দমে যায়। দ্যুৎ তোর, শালী মেয়েটিই দেখছি চালু। মঙ্গী আর রামদেই-এর কথা ওর মনে পড়ে যায়। দেখতেই এরা সদাসিধে। বোম্বাইয়ের এই ছেলেটা সাদাসিধে এই মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে ভেবে এতক্ষণ তার করুণা হচ্ছিলো। দেখতেও ছেলেটাকে বোম্বাইয়ের গুণ্ডার মতো। বোম্বাইয়ের কথা মনে পড়তেই সিনেমার অনেক দৃশ্যই তার চোখের সামনে এক নিমেষে ভেসে ওঠে। সিনেমার বদমাইসদের সর্দারের ভূমিকায় যে নামে সেই রামসিং-এর সঙ্গে ছেলেটির বেশ মিল আছে। ঢালু রাস্তায় রিক্সা চলতে থাকে, পেছনের চাকার চাকতির সঙ্গে চেনটা ঘষে আবার কির কির শব্দ হয়, সুমেরা একটা পা ফ্রেমের ওপর রেখে একটু আরাম করে নেয়।

শালী রামদেই।

পুচ্।

শব্দটা কানে যেতেই হঠাৎ অজান্তে ওর হাত দুটো গাড়ীর

ব্রেকটাকে চেপে ধরলো, গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। এটা রিক্সা না প্রেমালাপের জায়গা! সুমেরার দুঃখ হয়। মেয়েটা টেনে একটা চড় লাগালো না কেন?

'কি হে, কি হোলো?' রিক্সা থেমে যেতেই দু'জনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। মেয়েটির ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে কি রকম দেখতে হয়েছে সুমেরা তা অনুমান করে নেয়। মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কি বলবে ভেবে না পেয়ে প্যাডেলটা উল্টো দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে ফেললো, 'সামনেই পুলিশ ফাঁড়ি, রিক্সার আলোটা একটু জ্বালিয়ে নিচ্ছি সায়েব।'

পেছনের রিক্সাগুলো ও মোটরগাড়ী সব আগে বেরিয়ে যায়। আলো জ্বালাবার সময় এখনও হয়নি, একটা রিক্সাওলা খড়ড় খড়ড় করে খালি রিক্সা নিয়ে যাচ্ছিলো, তাকে থামিয়ে দেশলাইটা চেয়ে নিয়ে নিজের রিক্সার আলো জ্বালিয়ে নেয় সুমেরা। মনে মনে ভাবলো, যদি সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে রিক্সাটা দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে বাবু সায়েবের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

'আচ্ছা অনেক তো ঠাট্টা তামাসা হোলো। এখন আসল কথায় আসা যাক। ভেবেচিন্তে আমাদের একটা কিছু স্থির তো করতে হবে। সেইভাবে আমাদের কাজও করতে হবে', ছেলেটি বলে। রিক্সা চলার সঙ্গে সঙ্গে কথার ধাঁজ পালটে যায়। উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ছেলেটি আবার বলতে লাগলো, 'তোমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে চিঠি লিখো, এর মধ্যে আমিও জানতে পারবো আমি কোথায় থাকবো—বম্বে না দিল্লী। বাড়ী ঘরদোরের সব ব্যবস্থা করে রাখবো। বাবাকে তুমি এই কথা বোলো।'

'না, না, আমার সাহসে কুলোবে না। যা লেখার তুমিই বাবাকে লিখো।'

'ছাখো, বোকার মতন কথা বোলো না। আমি আমারটা কোরব, তুমি তোমার দিকটা সামলাবে।'

ছেলেটির কথার মধ্যে একটা আদেশের ভাব দেখে সুমেরার বেশ ভালো লাগলো। হ্যাঁ, একেই বলে মরদের কথা।

ছেলেটি প্রস্তাব করে· 'আমি বলি কি সব গুলি মারো। চুপচাপ সিভিল ম্যারেজ করে নিই, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আরে এতো দেখছি ডুবে ডুবে জল খায়। গির্জেতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবার কথা বলছে।

'না, তা হবে না', মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়। তারপর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। মনে হোলো মেয়েটি যেন ছেলেটির কাঁধে গাল ঘষতে ঘষতে আব্দারের সুরে বললো, 'তার তো এখনও অনেক দেরী। ততদিন কি করে কাটাবো? সত্যি বলতে কি আমার বড় ভয় হচ্ছে। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে। শোন...'

হায় হায় সব মাটি করে দিলো। এ কি মেয়ে না একটা মোমের পুতুল। এতক্ষণ তো খুব রোয়াব দেখাচ্ছিলো, এখন কেন মিউ মিউ।

'সত্যি সত্যি বলছি আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। যেদিন তোমার চিঠি পেয়েছি সেদিন থেকে কোনো কাজই করতে পারিনি। খালি মনে হোতো কখন বিকেল হবে, কখন চারটে বাজবে। ঘড়িটার ওপর এত রাগ হোত যে কি বলবো। সব কটা মেয়েই খুব ঠাট্টা করতো। সত্যি এত ক্ষতি হয় যে বলার নয়। আগেই বলে রাখছি পরীক্ষা আমি দোবনা। ফেল করে লোক হাসাতে আমি পারবো না।' সুমেরার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। মনটা ফুর্তিতে নেচে উঠলো। এই নাও, এতো দেখছি বম্বের টকি। ব্যাস, এখন শুধু একটা গান হলেই হয়।

'আরে একি পাগলামি করছো উর্ম্মি? রাস্তায় এভাবে কান্নাকাটি করে না। যদি কেউ দেখে ফেলে। দোহাই তোমার।'

ট্রিনন ট্রিনন করে ঘন্টি বেজে ওঠে। বাঁ দিকে হাত দেখিয়ে, পেছন দিক থেকে আর কোনো গাড়ী আসছে কিনা তা দেখবার বাহানা করে পেছন ফিরে সুমেরা আড়চোখে দেখলো যে সত্যিই

মেয়েটির মাথা ছেলেটির কাঁধে আর ছেলেটি রুমাল দিয়ে মেয়েটির চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। তাড়াতাড়িতে আর অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পেলো না। সব মাটি করে দিলো। আগে তো বেশ ভালোই চলছিলো। বাছাধন এইবার কি রকম ফাঁসা ফেঁসেছো। বুঝছো তো ইস্ত্রী চরিত্র কি রকম। কাল আবার দেখবি অন্য এক জনের পাশে বসেও ঠিক এমনিভাবেই কাঁদছে।...রামদেই-এর কথা মনে পড়তেই মনটা আবার তেতো হয়ে যায়। ছেলেটাও একটা আস্ত গোবর-গণেশ। সব কথাই ধ্রুব সত্য ভাবছে। আরে মার কসে দুই লাথি, তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। কি ঝঞ্ঝাটেই ফেঁসেছে বাছাধন!

রেল পুলের কাছ বরাবর এসে ছেলেটি বললো, 'গাড়ীটা এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলো।' যে দিক দিয়ে খুসী চল, আমি তো তোর কাছ থেকে আজ দু' টাকা আদায় করে নেবো।

'দ্যাখো উর্ম্মি, ঘাবড়িয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি যাবার আগেই যেন তোমার চিঠি পৌঁছে যায়। বুঝেছ?' আদর করে আস্তে আস্তে গালচাপড়ানোর শব্দ হয়। 'দ্যাখো, জঙ্গলে তোমার ঐ চিঠিই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, নাহলে এই ওষুধপত্তর...'

'তুমি তো চিঠি বড্ড দেরী করে দাও। দ্যাখো, আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, তুমি যদি চাও যে আমি পাশ করে যাই তাহলে চিঠির জবার ফেরত ডাকেই আসা চাই। পরে কিন্তু আমায় দোষ দিও না। আমাকে তো রোজ মীরার কাছে গিয়ে চিঠির খোঁজ নিতে হয়। চিঠি আসেনি শুনলে মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায়। ভাবি জীবনে আর চিঠি দেব না।'

আহা আমার সঙ্গে যদি কেউ এইরকম ভাবে কথা বলতো, সুমেরার বুকের ভেতরটা হাহা করে ওঠে। ওর মনে একটা ভাব আসে। ও যেন কিছু চায়...কিছু একটা চাই ওর। কিন্তু কী যে চায় তা সে নিজেই জানে না। মারে সঙ্গে প্রেম করার পাপ আর

হার চুরি করার অপরাধ শূলের মত তাকে বিঁধে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে…

'সামনের ঐ ফটকে দাঁড় করাও', বলেই মেয়েটি রিক্সা পুরোপুরি থামবার আগেই চটপট নেবে পড়ে। চেনের কির কির শব্দ বন্ধ হয়ে আসে।

'ছাখো, তুমি আর নেব না, ভেতর থেকে কেউ বাইরে এসে পড়তে পারে', মেয়েটির হু'টো হাত নিজের হাতের মধ্যে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে, প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত নিয়ে এসে ছেলেটি বললে, আচ্ছা।'

'চলো।'

যেতে যেতে মেয়েটি বারবার ফিরে ফিরে রিক্সার দিকে দেখছিলো। একবার সুমেরার সঙ্গে চোখাচোখি হোলো। মেয়েটির চোখে ভয় বা সঙ্কোচের বালাই ছিলো না। না জানি মেয়েটির চোখে কি ছিলো যা দেখে সুমেরার মনটা একটু ভার হয়ে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে ফটক পর্যন্ত যায়, আবার ফিরে তাকায়। ছেলেটিও পেছনের পর্দা তুলে দেখছিলো। অলসভাবে ফটকের আঁকড়াটা তুলতেই সেটা ফটকের অন্য পাল্লার ওপর গিয়ে পড়লো। রিক্সাও মোড় ফিরেছে। সুমেরার সারা মনে উদাস ভাব ছড়িয়ে পড়ে, যেন কাঁচে চিড় খেয়েছে।

পয়সার জন্যে সুমেরা কোনো হুজ্জোত করে না। বিড়ি কেনার জন্যে একটা দোকানের কাছে থামলো। রিক্সা থেকে নাবতেই ওর নজরে পড়লো পায়দানের ওপর একটা সাদা রুমাল, মুড়ে গিয়ে ঠিক পায়রার মতো দেখতে লাগছে। রিক্সাটাকে অন্ধকার জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নেয়। খুলে দেখে রুমালটা বেশ বড়, একটু ভেজাও। ভাবে রুমালটা ফেরত দিয়ে আসবে কিনা। অজান্তেই রুমালটা নাকের কাছে নিয়ে যায়, খুব হাল্কা একটা মিষ্টি সুগন্ধ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মে ভরা একটা পুকুরের মধ্যে সে তলিয়ে যাচ্ছে। খেয়াল নেই কখন তার চোখ জলে ভরে গেছে। মেয়েটির মুখ চোখের

সামনে ভেসে ওঠে। সুগন্ধের আমেজ তখনও কাটেনি। শূন্য মন নিয়ে সুমেরা ফিরে আসে। পেছনের চাকাটা কির কির শব্দ করে চলেছে, কেউ যেন শুধু একটা ইঁটের সঙ্গে আর একটা ইঁট আস্তে আস্তে ঘষে চলেছে।

চোখে মুঠির দূরবীণ দিয়ে আকাশে উড়ে যাওয়া মেঘ দেখতে থাকে, ঠিক যেন রুমালের মত। সুমেরার মনে দৃঢ় বিশ্বাস বুড়ির এই রুমালেও ঐ একই খোসবাই বেরুচ্ছে। রুমালটা সুমেরা রেখে দিয়েছিলো যত্ন করে। যদি কোনোদিন মেয়েটি আবার তার রিক্সায় চাপে তো সাহস করে তাকে ফিরিয়ে দেবে।...কিন্তু কিছুদিন পরে রুমালটা কোথায় হারিয়ে যায়। সুমেরাও সব কিছু ভুলে যায়। আজ অনেকদিন পরে সে আবার যেন সেই খোসবাই-র আঘ্রাণ পায়।

ঠিক এই সময় চেঁচামেচি শুনে সুমেরা ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো। দেখে একজন লোক হাতে একটা জুতো নিয়ে তার নাকের কাছে নাড়াচ্ছে, যেন মৃগী রোগীকে জুতো শোঁকাচ্ছে :

"আল তু...জলাল তু...
আই বলা কো টাল তু।"

অর্থাৎ আলাই ষাট, বালাই ষাট, বিপদ তোর কেটে যাক। ওকে উঠতে দেখে বললো, 'বেটা, আফিমখোরের মত উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবি, না মজুরী করবি। পাঞ্জাব মেল কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।' হাসির শব্দে চমকে উঠে দেখে সে আর কেউ নয় তার বন্ধু...বাবু রিক্সাওলা। সুমেরা উঠে আড়মোড়া খেয়ে আলিস্যি ভেঙ্গে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ ভাই, একটু চোখটা বুজিয়ে ছিলাম।'

সওয়ারী ভরা রিক্সা আর টাঙ্গা সারি বেঁধে ট্রিনন...ট্রিনন ও ভোঁ ভোঁ করতে করতে বন্যার মত এগিয়ে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হোলো যেন ও সত্য এই ট্রেন থেকে নেমেছে। সবই নতুন, কিছুই চেনে না।

সব কিছুই ওর কাছে আজ নতুন, এমন কি রিক্সাটাও অচেনা ঠেকে...

ওর রুটি

বালো জানে বাস আসতে এখনও অনেক দেরী। তবুও আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বার বার বাস আসার পথের দিকে তাকিয়ে দেখে। নকোদর রোডের এই জায়গাটার আশেপাশে কোনো গাছের ছায়া নেই। আশপাশের জমি সব উঁচুনীচু ও অনুর্বর, ক্ষেত সুরু হয়েছে তিরিশ চল্লিশ গজ দূর থেকে। ক্ষেতে কিছুই নেই। ফসল কাটার পর জমিগুলো শুধু কোপানো হয়েছে, চারিদিকে মাটি আর মাটি। মেটো রঙের একঘেয়েমি, তফাৎ শুধু নকোদর রোডের পীচ-গলা রাস্তার হাল্কা কালচে রঙ। বালো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো তার থেকে একটু দূরেই এক কাঠের ঘর। ঘরের মধ্যে দুটো মাটির জলের কলসী। তার পাশে বসে আধাবয়সী একটা লোক ঢুলছিলো। ঢুলতে ঢুলতে মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়ে। মাঝে মাঝে ঝটকা খেয়ে নিজেকে সামলে নেয়। চারিদিকে উদাস নয়নে তাকায়। গামছা দিয়ে গলার ঘাম মুছে আবার ঢুলতে সুরু করে। ঘরের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলো এক লম্বা দাড়িওয়ালা ভিখিরি। তার লোলুপদৃষ্টি বালোর হাতের দিকে। তার পাশে একটা কুকুরও চুপ করে বসেছিলো। তারও নজর বালোর হাতের দিকে।

হাতের রুটিটা ময়লা আঁচল দিয়ে মুড়ে এনেছিলো বালো। কারুর নজর যাতে না লাগে। রুটি সে নিয়ে এসেছিলো তার স্বামী সুচ্চা সিং ড্রাইভারের জন্যে, কিন্তু দেরী হওয়ায় সুচ্চা সিং-এর বাস বেরিয়ে গেছে, বালো তাই বাসটার ফেরার অপেক্ষায়। তার ভাবনা হয়, সময়মত পৌঁছতে না পারায় সুচ্চা সিং নিশ্চয়ই খুব রেগে গেছে।

এমনিতেই ওর বাস জলন্ধর থেকে ছেড়ে দুটো নাগাদ এখানে পৌঁছতো, নকোদর পৌঁছে রুটি খেতে খেতে তার প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে বেজে যেতো। রাত্তিরের রুটিও বালো তার সঙ্গে

দিয়ে দিতো। রাত্তিরে শেষ বাস নিয়ে নকোদরে ফিরে সুচ্চা সিং সেই রুটি খেতো। হপ্তায় সাত দিনের মধ্যে ছ' দিনের ডিউটি সুচ্চা সিং-এর। এই ভাবেই ছ' দিন বালো একটা, সোয়া একটা নাগাদ রুটি নিয়ে গাঁ থেকে রওনা দিতো। রোদে আধ ক্রোশ পথ হেঁটে ছুটো বাজার আগেই বড় রাস্তায় এসে পৌঁছে যেতো। যদি কোনোদিন বালো দু' চার মিনিট দেরী করে ফেলতো সুচ্চা সিং কোনো না কোনো বাহানায় বাসটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতো। বালোকে দেখেই রেগে বলে উঠতো, সে সরকারী চাকর, বালোর বাপের চাকর নয় যে তার অপেক্ষায় বাস দাঁড়িয়ে থাকবে। বালো চুপচাপ বকুনি খেয়ে তার হাতে রুটি দিয়ে দিতো।

আজ তার আসতে দু'চার মিনিট নয়, দু' আড়াই ঘণ্টা দেরী হয়। এত দেরীতে গিয়ে কোনো লাভ হবে না জেনেও সে স্থির থাকতে না পেরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে···মনে মনে ভাবে সে এতক্ষণ রাস্তার ধারে অপেক্ষা করেছে শুনে সুচ্চা সিং-এর রাগ পড়ে যাবে। এও সে ভালো করেই জানতো দুপুরে সুচ্চা সিং নকোদরের কোনো খাবার দোকানে তন্দুরের রুটি খেয়ে নেবে। রাত্তিরের খাবারটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যেও বটে আর কেন তার খাবার নিয়ে আসতে এতো দেরী সেই ঘটনাটা খুলে বলার জন্যেই তার আসা। সে ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করে মনে মনে, কি ভাবে সুচ্চা সিং-এর কাছে কথাটা পাড়া যায়। সব কথা খুলে বলা দরকার। আবার সুচ্চা সিং যাতে রেগে না যায় তাও দেখতে হবে। সে ভাল ভাবেই জানে সুচ্চা সিং ভীষণ রাগী মানুষ। আবার জঙ্গীকে উল্টোসোজা কিছু বললে সেও কুড়ুল হাতে নিয়ে তেড়ে আসবে।

জঙ্গীর নামে অনেক কথাই শোনা যায়। গত বছর সে পাশের গাঁয়ের একটি ঝিকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। কোথায় তাকে বেচে এসেছিলো তা কেউ জানে না। নকোদরের পণ্ডিত জীবারামের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়, তাকে সে খুন করালো। গাঁয়ের লোক ওর

থেকে দূরে দূরে থাকলেও সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। জঙ্গীর নামে এত কথা শোনার পরও বালো ভাবতে পারেনি যে জঙ্গী এত নীচ। চোদ্দ বছরের মেয়ে জিন্দাকে একলা পেয়ে তাকে বিব্রত করার চেষ্টা করবে। জিন্দার চেয়ে বয়সে তিন গুণ বড়। বছর খানেক আগেও জিন্দাকে মেয়ে বলে ডাকতো। আজ কিনা ওর এত সাহস। জিন্দা যখন ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আসছিলো তখন তার হাত চেপে ধরেছে।

বালো জিন্দাকে নন্তীর বাড়ী ঘুঁটে আনতে পাঠিয়েছিলো। এদের বাড়ী ক্ষেতের এক মাথায়, গাঁয়ের অন্য সব বাড়ী ক্ষেতের অন্য দিকে। আটা মেখে বালো অপেক্ষা করছিলো, জিন্দা ঘুঁটে আনলেই তাড়াতাড়ি রুটি ক'খানা সেঁকে নিয়ে বাসের সময় হবার আগেই রাস্তার ধারে গিয়ে হাজির হবে। জিন্দা খালি হাতে ফিরে এলো, মুখখানা তার একেবারে ফ্যাকাশে। জিন্দার দেরী দেখে বালোর খুব রাগ হয়েছিলো। কিন্তু এখন তাকে দেখে বালোর মন অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে।

একবার তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বালো প্রশ্ন করে, 'তোর কি হয়েছে রে? তোর চোখ মুখের এ অবস্থা কেন?'

জিন্দা কোনো উত্তর দেয় না। বালোর কাছে এসে নিজের হাতের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে থাকে।

'মুখপুড়ি বল্ না কি হয়েছে?' জিন্দা কিছুই বলে না। আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

জিন্দার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বালো জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে তোকে কেউ কিছু বলেছে?'

'তুই আমাকে ঘুঁটে আনতে আর পাঠাস নি', জিন্দা কাঁদতে কাঁদতে বলে। 'আজ থেকে আমি আর বাড়ীর বাইরে পা বাড়াবো না। মুখপোড়া জঙ্গী আজ আমায় বলছিলো...' গলা কান্নায় ধরে আসে। আর কিছু বলতে পারে না।

'জঙ্গী তোকে কি বলছিলো ?…বল্…শীগ্‌গির বল্…?' বালো আরোও চিন্তিত হয়ে বলে ওঠে—'মুখপুড়ি বলছিস্ না কেন ?'

'সে বলছিলো', জিন্দা ফুঁপিয়ে ওঠে আবার…'আয় জিন্দা, ভেতরে গিয়ে একটু সরবৎ খা। আজ তোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে…।'

'পাজী নীচ কোথাকার !' বালো হঠাৎ রেগে ওঠে। 'মিনসের নিজের মাকে সুন্দর লাগে না ? বেটার চোখে ছানি পড়ুক। ঘরে মেয়ে থাকলে এর চেয়ে বড়ই হোত। চোখখেকো কোথাকার… তারপর তুই কি বললি ?'

আমি বললাম, 'কাকা আমার তেষ্টা পায়নি।' এতক্ষণে জিন্দা একটু শান্ত হয়।

'তারপর ?'

তখন সে বললো, 'তাতে কি হয়েছে, এক চুমুক খেয়ে যা। কাকার সরবৎ একবার খেলে আর ভুলতে পারবি না।…বলেই আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো।'

'মুখপোড়া যমের বাড়ী যায় না কেন, বেটা সর্বস্বান্ত হোক, বেটার ঘরে আগুন লাগে না কেন। সুচ্চা সিংকে একবার আসতে দে, ওকে কেটে টুকরো টুকরো যদি না করাই তো আমার নাম নেই। পুড়ে মরে না মিনসে—হ্যাঁ তারপর ?'

'আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করায় সে আমাকে মিষ্টির লোভ দেখায়। আমার হাতের ঘুঁটে সেখানেই পড়ে যায়। আমি ঘুঁটে না তুলে হাত ছাড়িয়েই পালিয়ে এলাম।'

জিন্দার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে বালো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

'আর তো কিছু বলেনি তোকে ?'

'আমি খানিকদূর এগিয়ে আসার পর সে পেছন থেকে হি হি করে হেসে বললো, বেটী তুই কিছু মনে করলি না তো ? তোর ঘুঁটেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যা। আমি তো ঠাট্টা করছিলাম, এটুকুও

বুঝলি না? আয়, এধারে আয়। আসবি না? তাহলে আমি তোর বাড়ী গিয়ে তোর বোনকে নালিশ করবো, তুই ভীষণ পাজি হয়েছিস্, কথা শুনিস্ না।···কিন্তু আমি ওর কথার কোনো উত্তর দিইনি, ফিরেও তাকাইনি সোজা বাড়ী চলে এসেছি।'

'ভালো করেছিস্। আমি মড়ার হাড়গোড় এক করিয়ে ছাড়বো। আসতে দে সুচ্চা সিংকে। আমি এক্ষুনি সুচ্চা সিংকে সব কথা বলবো। বেটা জানে না যে জিন্দা সুচ্চা সিং ড্রাইভারের শালী। একটু বুঝেসুঝে এগুনো উচিত ছিল।' একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোকে ওখানে আর কেউ দেখেনি তো?'

'না, ক্ষেতের দিকে আমগাছতলায় রাধুকাকা বসেছিলো। আমায় দেখে বললো, এই ত্বপুর রোদে কোথা থেকে আসছিস্।...তা আমি বললাম, বোনের পেটে ব্যথা হয়েছিলা তাই হাকিমজীর কাছে চূরণ আনতে গেছিলাম।'

'ঠিক করেছিস্। বদমাইসটাতো একটা লম্পট। ওর সঙ্গে কেউ দেখে ফেললে আমাদেরই ইজ্জত যাবে। ও মুখ পোড়ার আর কি হবে? লোকেদের তো কথা বলার রসদ হলেই হোলো।'

এত সবের পর ঘুঁটে এনে রান্নাবান্না করতে তার বেশ দেরী হয়ে যায়। সে কৌটোতে আলুর তরকারী আর আমের আচার পুরে কৌটোটাকে রুটির ওপর বসিয়ে কাপড়ে বাঁধছিলো। সে অবশ্য জানতো ত্বটো অনেক আগেই বেজে গেছে—সুচ্চা সিংকে খাবার পৌঁছে দিতে আর পারবে না। তাই খাবার রেখে দিয়ে টুকিটাকি কাজ সারতে লাগলো। সব কাজ সারার পর সে আর বাড়ীতে বসে থাকতে পারে না, বাসের অনেক দেরী জেনেও বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলো।

'দিদি, তুই কতক্ষণে ফিরবি?' জিন্দা প্রশ্ন করলো।

'সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে আসবো।'

'তাড়াতাড়ি আসিস, আমার একলা ভয় করবে।'

'ভয়ের কি আছে?' ভরসা দিয়ে বালো বললে। 'তোর

দিকে চোখ তুলে তাকাবার কার এতো সাহস আছে? সুচ্চা সিং জানতে পারলে তাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে না?···আমার অবশ্য বেশী দেরী হবে না। সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ী ফিরে আসবো। তুই এক কাজ কর; ভেতর থেকে শেকল তুলে দে, বুঝলি? কেউ কড়া নাড়লে প্রথমে নাম জিজ্ঞেস করবি।' তারপর একটু গলাটা নীচু করে বললো, 'আর যদি জঙ্গী এসে আমার কথা জিজ্ঞেস করে, তো বলিস সুচ্চা সিংকে ডাকতে গেছি, বুঝলি?···না, থাক। ওকে তুই কিছু বলিস নি। ভেতর থেকে সাড়াই দিসনি।'

বালোর চৌকাঠ পেরোবার অগেই জিন্দা বলে উঠলো, 'দিদি, ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করছে।'

'তুই কি পাগল হলি?' বালো বকে ওঠে। 'গাঁয়ে এতো লোক রয়েছে, ভয় কিসের? তোর নিজেরও তো গায়ে বেশ জোর আছে। এতো ভয় পাচ্ছিস কেন?'

জিন্দাকে এত করে সাহস দেবার পরও নিজের মনে তার সোয়াস্তি ছিল না। রাস্তার ধারে পৌঁছে অবধি তার মনে হচ্ছিল বাসটা যদি তাড়াতাড়ি এসে যায় তাহলে সে রুটিটা দিয়েই চটপট জিন্দার কাছে ফিরে যেতে পারবে।

'ভাই, দুটোর বাসটা কতক্ষণ হোলো গেছে?' বালো ভিখিরিটিকে জিজ্ঞেস করে। ভিখিরির নজর তখনও বালোর হাতের রুটির দিকে। রোদের তেজ কমেনি, চালাঘরের ছায়াটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। কুকুরটা জল খেয়ে চালাঘরের তক্তার নীচে ঘুর ঘুর করছে।

ভিখিরিটা জবাব দেয়, 'জানি না বোন। কতো বাস আসছে, কতো যাচ্ছে। সময়ের হিসেব কে রাখে?'

বালো চুপ করে রইলো। একটা বাস কিছুক্ষণ আগেই নকোদরের দিকে গেছে। চারিদিকে বাসের ধুলোয় ধুলো। বালোর মনে হয় বাসটা যে পথে এলো, যে পথে গেলো—পথ যদিও একই, কিন্তু এ যেন দুটো আলাদা জগত। বাসগুলো এক জগত থেকে অন্য জগতে পাড়ি দিচ্ছে। কে জানে কি রকম সেই জগত, যেখানে বড় বড়

বাজার দোকান-পাট; যেখানে একটা ড্রাইভারের মাস-মাইনের তিন ভাগ টাকা খরচ হয়ে যায়। দেবী প্রায়ই বলে নকোদরে সুচ্চা সিং এর রক্ষিতা আছে। সেই স্ত্রীলোকটিকে বালোর দেখতে ইচ্ছে করে। একবার সুচ্চা সিংকে সে বলেছিলো, তাকে নকোদর দেখিয়ে আনতে। সুচ্চা সিং ধমকে বলেছিলো, 'কেন, তোরি কি ডানা গজিয়েছে? বাড়ীতে কি মন বসে না? সুচ্চা সিং তেমন পুরুষ নয় যে স্ত্রীর হাত ধরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। বেড়াবার যদি এতই সখ হয়ে থাকে তবে আর একটা বিয়ে কর। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

সেদিন থেকে বালো একথা আর কোনো দিন মুখে আনেনি। সুচ্চা সিং যেমনই হোক না কেন তার কাছে সেই সব। বালোকে গালাগালি দেয়, মারে, কিন্তু তবু তো তাকে ভালোবাসে। মাস গেলে কুড়িটা টাকা হাতে দেয় তো। হাজার গালাগালি করলেও তাকে নিজের স্ত্রী তো ভাবে। মুখটা খারাপ হলেও সুচ্চা সিং-এর মনটা ভালো। বালো জিন্দাকে নিজের কাছে রেখেছিলো বলে সুচ্চা সিং প্রায়ই বিরক্ত হোতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও গত মাসে জিন্দার জন্যে নিজেই কাঁচের চুড়ি আর আড়াই গজ মলমল কিনে এনেছিলো।

বালো দেখলো দূর থেকে একটা বাস ধুলো উড়িয়ে আসছে। সেটা সুচ্চা সিং-এর বাস নয় বুঝতে পারে। তবুও বাসটা কাছে না আসা পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসু নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠাণ্ডা জলের চালাঘরের কাছে এসে বাসটা থামলো। একটা লোক পেঁয়াজ আর শালগমের গাঁঠরী নিয়ে নামে। কণ্ডাকটার সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই বাসটা আবার চলতে থাকে। বাস থেকে যে লোকটা নেমেছিলো সে চালাঘরের কাছে গিয়ে জল খাওয়াবার লোকটাকে জাগিয়ে কোষ করে দু ঘটি জল খেয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে নিজের গাঁঠরীর কাছে এসে দাঁড়ালো।

বালো দু' পা এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই, নকোদর থেকে এর পরের বাস কতক্ষণ বাদে আসবে?'

'বাস তো এক এক ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে,' সে বললো। 'তুই কোথায় যাবি ?'

'কোথাও যাব না ভাই, বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি। সুচ্চা সিং ড্রাইভার আমার স্বামী। তাকে রুটি দিতে এসেছি।'

'ও সুচ্চা সিং,' লোকটি একটু মুচকে হাসলো।

'তুমি ওকে চেনো ?'

'নকোদরে ওকে কে না চেনে ?'

লোকটির কথা বলার ধরণ ধারণ বালোর ভালো লাগলো না। সে চুপ করে যায়। সুচ্চা সিং-এব সম্বন্ধে সব কথা বালো জানতো, পবের মুখে সে সব শুনতে তাব ভালো লাগে না। সে বুঝে উঠতে পারে না তার স্বামীর বিষয় এইভাবে কথা বলার অধিকার অন্যদের কে দিলো।

'সুচ্চা সিং বোধহয় পরেব বাসখানা নিয়ে আসবে', লোকটি আবার বললো।

'হ্যাঁ। এর পর তারই বাস আসবে।'

'সুচ্চা সিং-এর দেখছি কোনো দয়ামায়া নেই, তোকে এইভাবে অপেক্ষা করতে হয়।'

বিরক্ত হয়ে বালো বলে উঠলো, 'আচ্ছা ভাই, তুমি তোমার পথ দেখো। সে কেন অপেক্ষা কবাবে, আমারই রুটি আনতে দেরী হওয়ায় সে বাস নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে বেচারীর বোধহয় সকাল থেকে খিদেয় নাড়ী জ্বলছে।'

'খিদেয় ? কে সুচ্চা সিং ?' লোকটি দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠলো। বালো মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'ভগবান, তুমিই সত্যি,' বলে লোকটি গাঁঠরীটা মাথায় তুলে নিয়ে ক্ষেতের মেঠো পথে পা বাড়ালো। বালোর ডান পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিলো, সে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালো জনমানবহীন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে অন্য দিক থেকে একটি বাস আসছে দেখলো।

দাঁড়িয়ে থেকে তার গোড়ালি ব্যথা করছিলো। বাসটাকে দেখতে পেয়ে খাবারের পুঁটলিটা সে গুছিয়ে নেয়। আর একটু দেরী করে এলে রুটিগুলো রাত পর্যন্ত টাটকা থাকতো। এই কথা ভেবে মনে মনে বালোর আপশোষ হয়। সুচ্চা সিং গুরুর প্রসাদ হালুয়া খুব ভালবাসে…সময় মত খেয়াল হোলে একটু তৈরী করেও নিয়ে আসা যেতো। মনে মনে ভাবে, কাল গুরুপর্ব, কাল নিয়ে এলেই হবে…।

ধুলো উড়িয়ে বাসটা তার দিকেই এগিয়ে আসছিলো। বালো দূর থেকেই সুচ্চা সিং-এর চেহারা দেখে বুঝতে পারে সে খুব চটে আছে। বালোকে দেখেই রাগে সুচ্চা সিং-এর ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। ঠোঁট কামড়াতে থাকে। বালো ভয়ে ভয়ে রুটি শুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে দিলো। বাসটা তার কাছ বরাবর না থেমে চালাঘর ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ালো।

দু' একজন প্যাসেঞ্জার নামলো। বাসের ছাতে উঠে কণ্ডাকটার একটা সাইকেল নামাতে থাকে। বালো তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের সীটের দিকে এগিয়ে যায়।

হাত বাড়িয়ে রুটিটা জানলা দিয়ে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বালো বললো, 'সুচ্চা সিং রুটি নিয়ে নে।'

'চলে যা', সুচ্চা সিং তার হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়।

'সুচ্চা সিং, এক মিনিট নীচে নেমে আমার কথাগুলো শুনে নে। আজ একটা বিশেষ জরুরী কারণ ঘটেছিলো, তা না হলে আমি…।'

'বাজে বকিস নি, সরে যা এখান থেকে', বলে সুচ্চা সিং কণ্ডাকটারের কাছে জানতে চাইলো সব মালপত্তর নামানো হয়েছে কিনা।

'আর একটা বাক্স নামাতে বাকী', ছাতের ওপর থেকে কণ্ডাকটার উত্তর দেয়।

বালো মিনতি করে বলে, 'সুচ্চা সিং, আমি দু'ঘণ্টা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুই একবার নীচে নেমে আমার কথাগুলো শুনে নে।'

'বাক্স নেমেছে?' সুচ্চা সিং আবার কণ্ডাকটারকে হাঁক দেয়।

'হ্যাঁ, চলো,' বলে কণ্ডাকটার পেছন থেকে সাড়া দেয়।

'সুচ্চা সিং, তুই আমার ওপর রাগ করে থাকিস কর, কিন্তু রুটিটাতো নিয়ে নে। তুই মঙ্গলবার বাড়ী ফিরলে তোকে আমি সব কথা খুলে বলবো।' বালো হাতখানা আরো উঁচু করে দিলো।

'মঙ্গলবারে বাড়ী আসবে তোর…', বলে একটা বিশ্রী গালি দিয়ে সুচ্চা সিং বাস ছেড়ে দেয়।

সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রং বদলাতে থাকে। মাঝে মধ্যে এক আধটা পাখী আকাশে উড়ে যাচ্ছিলো। ক্ষেতের মধ্যে কোথাও কোথাও রঙীন পাগড়ী চোখে পড়ে। বালো চালাঘর থেকে জল খেয়ে, চোখে মুখে জল ছিটিয়ে নিয়ে মুখখানা আঁচল দিয়ে মুছে নেয়। তারপর চালাঘর থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে সুচ্চা সিং-এর বাস জলন্ধর থেকে রাত আটটা ন'টা নাগাদ ফিরবে। ভাবতে থাকে, ততক্ষণ কি অপেক্ষা করবে? সুচ্চা সিং অন্ততঃ একবার নেমে তার কথাটাতো শুনতে পারতো। বাড়ীতে জিন্দা একলা নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে। মুখপোড়া জঙ্গী যদি আবার কোনো অছিলায় আসে? সুচ্চা সিং রুটিটা নিয়ে নিলেই তো সে আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ফিরতে পারতো। রুটি না হয় সে কোথাও খেয়ে নেবে, কিন্তু রাগ কি করে পড়বে? আর রাগ তো হবারই কথা। সারাদিন পরিশ্রম করে, খিদেও তো পায়। আমি আর একটু সাধাসাধি করলেই হয়তো সুচ্চা সিং কথা শুনতো। কিন্তু এখন?

জল খাওয়াবার লোকটা চালাঘর বন্ধ করছিলো। ভিখিরিটাও কখন চলে গেছে। কুকুরটা এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যাস্তের আলোয় উড়ে-যাওয়া পাখীগুলোকে সোণালী বরণ দেখাচ্ছিলো। রাস্তার ওপর বালোর লম্বা ছায়া। নিজের ছায়া দেখে খুব অদ্ভুত লাগে। কাছের একটা খেতে একটি গ্রামের ছেলে গলা ছেড়ে 'মাহিয়া' গান ধরেছে:

'বোলণ দী চাঁ কোই নঁা।;
জিহড়া সানুঁ লা রে দিত্তা,
উস রোগ দা নঁা কোই না।'

অর্থাৎ আমার বলা-কওয়ার কিছু নেই, প্রাণে এক আকাঙ্খা জেগে উঠেছে কিন্তু এর নিবৃত্তির কোন উপায় নেই।

মাহিয়া গানের লয় বালোর অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। ছোট-বেলায় গরমকালের বিকেলে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝরণার তলায় নেচে নেচে সে চান করতো। তখনও মাহিয়া গানের লয় হাওয়ায় চারিদিকে যেন ভেসে বেড়াতো। এই লয়ের সঙ্গে সূর্যাস্তের যেন একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ক্রমে বালো যখন একটু একটু করে বড় হতে লাগলো, এই লয়ও যেন তার জীবনের সঙ্গে ওতো-প্রোতোভাবে মিশে গেলো। ওদের গ্রামের লালী বলে ছেলেটি খুব দরদ দিয়ে এই মাহিয়া গান গাইতো। বালো অনেকবার লালীকে নিজের গাঁয়ের বাইরে অশ্বত্থ গাছের তলায় কাণে হাত দিয়ে এই গানটা গাইতে শুনেছে। বালো তার দুই বান্ধবী পুষ্পা আর পারোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অশ্বত্থ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। এরপর এমন দিনও এলো যখন বালোর মা বালোকে বললেন যে সে বড় হয়ে গেছে, এখন আর এইভাবে অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকাটা তার শোভা পায় না। সেই সময়ই তার বিয়ের কথাও উঠলো। যেদিন সুচ্চা সিং-এর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকাপাকি হোলো, সেদিন মাঝরাত্তির অবধি পারো ঢোলক বাজিয়ে গান করেছিলো। গাইতে গাইতে তার গলা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। ঢোলক ছেড়ে বালোকে জড়িয়ে ধরে সে গান গেয়েছিলো:

'বীবী, চঁনণ দে ওহলে ওহলে কিঁউ খড়ী
নীঁ লাডো কিঁউ খড়ী?
মৈঁ তাঁ খড়ী সাঁ বাবল জী দে বার,
মৈঁ কঁনিয়া কঁবার,

বাবল বর লোড়িএ।
নীঁ জাইএ, কিহো জিহা বর লোড়িএ?
জিউ তারিআঁ বিচোঁ চঁদ,
চঁদাঁ বিচোঁ নঁদ,
নঁদাঁ বিচোঁ কানৃহ—কনৃহৈয়া বর লোড়িএ।

অর্থাৎ সই চাঁদের আলোর শেষ সীমানায় তুই চুপচাপ কেন দাঁড়িয়ে। ও প্রিয় সই, তুই কেন দাঁড়িয়ে? আমি কুমারী মেয়ে বাপের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু বাবা আমার জন্যে বর ঠিক করে ফেলেছে। কি ধরণের বর ঠিক করেছেন? তারার মাঝখানে চাঁদ, তার মাঝখানে যে ছায়া সেই ছায়ার মাঝখানে যে কেষ্ট-ঠাকুর, তার মতো বর ঠিক করেছেন।

বালো জানতো না কে তার বর, কি রকম তাকে দেখতে, কিন্তু তার মন বলতো যে তার বরকেও দেখতে হবে ঠিক তেমনি যা' গানের কথায় তার মনে হয়। ফুলশয্যার রাত্তিরে সুচ্চা সিং ওর ঘোমটা খুলে দিলো। সুচ্চা সিংকে দেখে বালোর মনে হোলো যেন সে ঠিক কানৃহা কনৃহৈয়ার মত বর পেয়েছে। সুচ্চা সিং যখন ওর মুখটা তুলে ধরলো তখন বালোর সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তার মনে হোলো যেন জীবনটা না জানি এই রকম কতশত শিহরণে ভরা। যার আস্বাদন সে রোজই পাবে, আর সে স্মৃতিপটে তা ধরে রেখে দেবে।

'তুই একটা হীরের টুকরো, তুই সত্যিই একটা হীরের টুকরো', আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে সুচ্চা সিং।

শুনে বালো ভেবেছিলো বলবে এই হীরের টুকরো সুচ্চা সিং-এর পায়ের ধুলোর সমানও নয়, কিন্তু লজ্জায় বলা হয়নি।

'শোন মা, এখন ঘরে যাও, আঁধার হয়ে আসছে, এখানে

দাঁড়িয়ে কেন ?' জল দিচ্ছিলো যে লোকটা, যাবার পথে দাঁড়িয়ে বালোকে বললো।

বালো করুণস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই, ঐ বাস রাত আটটা ন'টার মধ্যে জলন্ধর থেকে তো ফিরে আসবে ?'

'কে জানে কখন আসবে। তুই ততক্ষণ এখানে থাকবি ?'

'ভাই, ওর রুটিটা তো দিতে হবে।'

'ওর রুটি নেবার হোলে কি নিতো না। ওর মেজাজ সব সময়ই তো সপ্তমে চড়ে আছে।'

'ভাই, পুরুষরা তো মাঝে মধ্যে রেগে যায়, আর এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'তবে দাঁড়িয়েই থাক, তোর যা ইচ্ছে। বাস নটার আগে কি আর আসবে।'

'ঠিক আছে, যখনই আসুক।'

জলওয়ালার সঙ্গে কথা বলার পর আপনা থেকেই ঠিক হয়ে গেলো জলন্ধর থেকে বাস না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। এতক্ষণ ধরে সে এটাই ঠিক করতে পারছিলো না। জিন্দার একটু ভয় করবে বই তো নয়।

জঙ্গীর ওকে আর কিছু বলার সাহস হবে না। গাঁয়ের পঞ্চায়েত তো আছে। পরের মেয়ে-বৌয়ের ওপর নজর দেওয়া কি সাধারণ ব্যাপার। সুচ্চা সিং জানতে পেলে চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সারা গাঁ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে না। সুচ্চা সিংকে এ কথাটা না বললেই বোধ হয় ভালো হবে। কে জানে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আবার না মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায়। সুচ্চা সিং ঘরের সামান্য ঝামেলাতেই ঘাবড়ে যায়। তাই এসব ঝামেলায় আর ওকে টেনে আনা ঠিক হবে না। ভালোই হয়েছে সুচ্চা সিং সে সময় তার কথা শোনে নি। ও তো আবার বলছিলো যে মঙ্গলবার বাড়ী আসবে না। সত্যি সত্যিই যদি না আসে ? আর রেগেমেগে যদি একেবারেই বাড়ী আসা বন্ধ

করে দেয়? না, ওর চিন্তা বেড়ে যায় এমন কথা আমি বলবো না। সুচ্চা সিং সুখী হলেই তার সব, ঘরের ঝামেলা সে নিজে সামলে নিতে পারবে।

হঠাৎ শিউরে উঠলো বালো। গাঁয়ের লোটু সিং তার বৌকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। বৌটা স্বামীর জন্যে কি রকমই না হেদোতো। শেষে পাতকুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো। জলে ফুলে কি ভয়ানকই না দেখতে হয়েছিলো তাকে।

ক্লান্ত হয়ে বালো জলওয়ালার বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। সন্ধ্যে হয়ে আসায় ক্ষেতখামারে সোরগোলও কমে আসে। মাহিয়া গানের বদলে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। একটা বাস জলন্ধরের দিকে আর একটা বাস নকোদরের দিকে গেলো। সুচ্চা সিং জলন্ধর থেকে শেষ বাসটা নিয়ে আসতো। বালো আগের বাস ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছে জলন্ধর থেকে আর একটা বাসই আসতে বাকী। এখন যে বাসের আলো দেখা যাবে সেটা সুচ্চা সিং-এরই বাস। বারবার বহুদূরে চোখ ফেড়ে ফেড়ে বালো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। একটু আওয়াজেই মনে হয় ঐ বুঝি বাস আসছে। তাই একটু সজাগ হয়ে যায়। বাসের আলো না দেখতে পেয়ে আবার এলিয়ে পড়ে। চোখ বুজে কয়েক বারই তার মনে হোলো যেন বাসের আলো তার চোখে পড়েছে, অমনি সে চমকে ওঠে।...আসলে কিন্তু বাস আসেনি। একবার তার মনে হোলো সে যেন বাড়ীতে, জোরে জোরে কে কড়া নাড়ছে। জিন্দা ভেতরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে। ওর চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছে। পাতকুয়ো থেকে জল টেনে তোলার বলদেরা সমানে ঘুরে ঘুরে জল তুলছে। অশ্বথ গাছের নীচে বসে একটা ছেলে কানে হাত রেখে ওদের গলার ঘন্টির তালে তাল দিয়ে মাহিয়া গান গাইছে। খুব জোর আঁধি উঠেছে, সব কিছু ধুলোয় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বালো রুটির পুঁটলিটা সামলাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই সামলাতে

পারছে না। ঘরের ভেতর জলের ঘড়াগুলো শুকিয়ে খটখট করছে, ছিটে ফোঁটাও জল নেই তাতে। বালো বারবার ঘটি ডুবিয়ে জল নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারেই নিরাশ হতে হয় তাকে।··· পায়ের গোড়ালি ফেটেছে, পায়ে তেল লাগাতে ব্যস্ত। কিন্তু লাগাতে না লাগাতে তেল শুকিয়ে যায়। এলোচুলে জিন্দা হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে কাঁদছে। কেঁদে বলছে, আমাকে ছেড়ে তুমি কেন চলে গেছিলে ? কেন গিয়েছিলে আমায় ছেড়ে ? হায়রে কপাল আমার, আমার চুলের গুছি কে নিলো, কোথায় গেলো ?

হঠাৎ চমকে উঠলো, মনে হোলো কে যেন তার কাঁধে হাত রেখেছে।

'সুচ্চা সিং', বালো তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে বলে ওঠে।

'তুই এখনও বাড়ী যাসনি ?' বলে সুচ্চা সিং তক্তার ওপরে তার পাশে বসে পড়ে। বাসটা জল খাওয়ানোর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। একটাও প্যাসেঞ্জার ছিলো না। কণ্ডাক্টার পেছনের সীটে বসে ঘুমচ্ছিলো।

'আমি ভাবলাম রুটিটা দিয়েই যাবো। বসে বসে ঢুলুনি এসে গেছিলো। তুই কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিস।'

'নারে, এই মাত্তর বাস এনে দাঁড় করিয়েছি। আমি অনেকদূর থেকেই তোকে দেখতে পেয়েছি। তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস, তখন থেকে রুটি নিয়ে বসে আছিস ?'

'কি আর কোরব। তুই যে বলে গেলি আর বাড়ী আসবি না', কথাগুলো বলে বালো মাথা নীচু করে চোখের জল সামলে নিলো।

'আচ্ছা রুটি দিয়ে ঘরে ফিরে যা। বাড়ীতে জিন্দার একলা নিশ্চয়ই ভয় করছে', বলে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে সুচ্চা সিং উঠে পড়লো।

রুটির কৌটটা হাতে নিয়ে বালোর পিঠে হাতটা রেখে সুচ্চা

সিং বাস অবধি এলো। তারপর লাফিয়ে নিজের সীটে বসে পড়ে। সুচ্চা সিং বাসে ষ্টার্ট দিলে বালো ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মঙ্গলবার তুই বাড়ী আসছিস তো?'

'হ্যাঁ আসবো, শহর থেকে কিছু আনার থাকলে, বল।'

'না, আমার কিছু দরকার নেই।'

বাসটা ঘড় ঘড় শব্দ করাতে বালো দু' পা পিছিয়ে এলো। সুচ্চা সিং দাড়ি গোঁফে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে জোরে একটা ঢেঁকুর তুললো। বালোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তখন যেন কি বলতে চেয়েছিলি?'

'না তেমন কিছু নয়, তুই তো মঙ্গলবার বাড়ী আসবিই....'

'আচ্ছা, আর দেরী করিস না, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যা, এক মাইল পথ তো।'

'সুচ্চা সিং, কাল গুরুপর্ব। কাল তোর জন্যে হালুয়া প্রসাদ নিয়ে আসবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

ধুলো উড়িয়ে বাস চলে গেলো। ধুলো একটু কমলে বালো আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নেয়। তারপর যতক্ষণ বাসের লালবাতি দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের দিন

চুঙ্গী আদায়ের অফিস বেশ রঙচঙে। গেটেতে ধনুকের আকারে বোর্ড। পেণ্টার সৈয়দ আলীর পাকা হাতের কাজ। দেখতে দেখতে সহরের চারিধারে অনেক দোকান খুলে গেলো, সবার দোকানেই সাইনবোর্ড। এগুলো দোকানের ইজ্জৎ বাড়িয়েছে। অনেক দিনের কথা। দীনানাথ ময়রার দোকানে প্রথম সাইনবোর্ড লাগার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের দুধ-খাবার খদ্দেরের সংখ্যা বেড়ে যায়। সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর যখন খুব ধুমধাম পড়ে গেলো তখন নানান ধরণের লতাপাতা আঁকা নতুন সাইনবোর্ড লাগানো সুরু হোলো। 'ওঁ,' 'জয়হিন্দ' কথা থেকে সুরু করে 'একবার পরীক্ষা করে দেখুন', 'ভেজাল প্রমাণে ১০০৲ টাকা পুরস্কার' ইত্যাদি নানান ধরণের শ্লোগান দেখা যেতে লাগলো।

চুঙ্গী অফিসের নাম তিন রকম ভাষায় লেখা। চেয়ারম্যান সাহেব খুব বুদ্ধিমান লোক। ওঁর সুনাম চারিধারেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রত্যেকটি সাইনবোর্ডই লেখা হয হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজিতে। অনেক দূর দূর থেকে নেতারা বক্তৃতা দিতে আসেন, দেশবিদেশ থেকে যাত্রীরা আগ্রার তাজমহল দেখে পুর্ব ভারত পরিভ্রমণে যান এরই ওপর দিয়ে...তাঁদের মনেও এইসব সাইনবোর্ড রেখাপাত করে। সাইনবোর্ডের রং ফেরে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—মেলাটেলার সময় ময়রার দোকানের, জুলাই-আগষ্ট মাসে বইখাতার, বিয়ের মাসে কাপড়ের দোকানের আর অসুখবিসুখের মরশুম দেখা দিলে হাকিম-বৈদ্যের। সস্তায় কাজ সারে দেশী ঘিয়ের দোকানদাররা। খোলার চালের ঘরেতেই গেরুয়া কিংবা লাল মাটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। এ সব বাদ দিলে চলে না। মুরুব্বী চালে বৈদ্যজী বললেন, 'আজকালকার দিনে পোষ্টার বিনা সিনেমা-ওয়ালারাও কল্কে পায় না। বড় বড় সহরে কেরাসিন তেলের

দোকানেও দেখবে সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ড না হলে এতটুকুও চলে না। এতে ছেলেপুলেদেরও নাম লেখা হয়, আর তা' না হলে নাম রাখার দরকারই বা কি। সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে সুখদেববাবু কম্পাউণ্ডার থেকে একেবারে ডাক্তার হয়ে গেলেন, এখন হাতে ব্যাগ নিয়ে চলেন !'

পাশের রামচরণ আর এক মজার খবর দিলো। 'কাল সুখদেব ডাক্তার বুধই-এর একাগাড়ীটা নাকি কিনেছেন…'

'চালাবে কে ?' টিনের চেয়ারে পা-মুড়ে বাবু হ'য়ে বসে পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'এ সব পকেট কাটার কায়দা', বৈদ্যজীর মনে তখনও একাগাড়ীর কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। 'বড় বড় ডাক্তারদের মত আমাদের এই ডাক্তারও রোগীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করবে আর সহিসকে বক্‌শিস পাইয়ে দেবে। এই জন্যেই ডাক্তারদের এতো বদনাম। ভ্যালা জিজ্ঞেস করো দিকিনি, ও ডাক্তারী করবে না নিজের ডাঁট দেখাবে। ইংরেজিতে 'ডাক্তার' লিখেই তো রুগীদের প্রায় আধমরা করে ফেলে। আয়ুর্বেদে নাড়ী দেখার কথা তো বাদই দিলাম, শুধু রুগীদের চেহারা দেখেই রোগের কথা বলে দেওয়া যায়। এতে একাগাড়ী কি করবে। কিছুদিন পরেই দেখবে, ওর সহিস কম্পাউণ্ডার বনে গেছে।' এই কথা বলে বৈদ্যজী খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন। একটু থেমে আবার বললেন, 'কে কি বলবে বলো ? ডাক্তারী তো এখন ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উকিল মোক্তারের ছেলেরাও ডাক্তার হচ্ছে। যার কাজ তারেই সাজে, এই তো জানি। বৈদ্যর ছেলে বৈদ্য হবে, বাপের নাম-যশ পাবে। বৈদ্যর ছেলে ছোটবেলাতেই শেকড়-বাকড় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অর্ধেক ডাক্তারী শিখে ফেলে.। তোলা, মাষা, আর রত্তির এমন টনটনে জ্ঞান হয়ে যায় যে ওষুধ কিছুতেই ভুল হতে পারে না। ওষুধের কাজ ওর তৈরী করার পদ্ধতিতেই…ধন্বন্তরি…' বৈদ্যজী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু একজনকে দোকানের দিকে

এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলেন। যারা মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলো তাদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সবাই তাঁর রুগী।

লোকটি দোকানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৈদ্যজী ব্যাপারটা কী তা আঁচ করে নিলেন। লোকটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোন রকম উৎসাহ দেখালেন না। কিন্তু লোক-দেখানো ভদ্রতা তো কিছু আছে। বলা তো যায় না আজ বাদে কাল এই লোকটা কিংবা ওর বাড়ীর কোন লোক তো রুগী হয়ে আসতে পারে। নিজের ব্যবহার আর নিজের পেশার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, ভালো তো?' মাথা থেকে একটা ক্যানেস্তারা বৈদ্যজীর সামনে নামিয়ে রেখে লোকটি বলে, 'ঠাকুর সাহেব এখানে এটাকে রাখতে বলেছেন, একটা দেড়টা নাগাদ হাট থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন।'

'ও সময় দোকান বন্ধ থাকে', ফালতু এইসব ঝঞ্ঝাটে একটু বিরক্ত হয়ে বৈদ্যজী জবাব দিলেন। 'হাকিম বৈদ্যের দোকান সারাদিন খোলা থাকে না, এটাতো আর বেনের দোকান নয়।' ভবিষ্যতে লোকটা কাজে আসতে পারে ভেবে জবাব দিলেন, 'যাক গে, ওঁর কোনো অসুবিধে হবে না, যদি ঐ সময় আমি দোকান বন্ধ করে চলে যাই তো পাশের দোকানে রেখে দিয়ে বলে যাবো।'

লোকটা চলে যেতেই বৈদ্যজী বলে ওঠেন, 'মদখেতে মানা করলে কি হবে? যেদিন থেকে এই আইন চালু হয়েছে, সেদিন থেকেই ঘরে ঘরে তাড়িখানা তৈরী হয়েছে। এখন খেজুর রস ঘিয়ের দামে বিক্রী হয়। আর এই ডাক্তারদের কি বলবো, যেন মচ্ছোব লেগে গেছে। লাইসেন্স পেয়েছে ওষুধ বলে, কিন্তু ঠেলে জিঞ্জার বিক্রী করছে সবায়ের নাকের ডগায়। ধরাও পড়ে না। আমরা যদি গাঁজা আফিম এক পুরিয়া রাখতে চাই তো তার হিসেব পত্তরের সাতশো ল্যাটা।'

'আরে এসব তো দায়িত্বের ব্যাপার', পণ্ডিতজী জবাব দেন।

'এখন শুধু দায়িত্বশীল বৈদ্যরাই আছে। এদের সবায়ের রেজিষ্ট্রিও হয়ে গেছে। আজেবাজে যারা ঢুকে পড়েছিলো, তাদের সবার কাটছাঁট হয়ে গেছে। যে বৈদ্য রেজিষ্টার্ড সেই শুধু চিকিৎসা করতে পারে। যারা চূরণ বিক্রী করে রাতারাতি বৈদ্য হয়ে উঠেছিলো··· এখন সব খতম। লক্ষ্মৌতে সরকারী অনুসন্ধান হবার পর সব ঠিক হয়ে...'

বৈদ্যজীর এইসব নীরস কথাবার্তায় পণ্ডিতজী উঠে পড়লেন। বৈদ্যজীও ভেতরে যাবার জন্যে উঠলেন। চন্দর তাঁর ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ডটা লিখছিলো, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সাদা রংটা বড্ড গাঢ়, একটু টারপিন তেল মিশিয়ে নাও।' বলেই একটা বোতল উঠিয়ে নিয়ে এলেন, বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে 'অশোকারিষ্ট'।

এইরকম ওষুধের নামে বোতলে কি জিনিষ যে ভরা আছে তা বলা মুশকিল। সামনের আলমারীটাতে বড় বড় বোতল ঠাসা। বোতলের গায়ে লেবেল আটকানো। লেবেলে হয় কোন না কোন অরিষ্টের নাম নয়তো কোন না কোন মাদক-দ্রব্যের নাম লেখা। তাকের প্রথম সারিতে বোতলগুলো সাজানো। পেছনের সারিতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ। সামনের টেবিলে একসারি সাদা শিশি, কোনটাতে মুখরোচক হজমী কিংবা লবণ ভাস্কর ইত্যাদি। বাকীগুলোতে কি যে ভরা আছে তা' শুধু বৈদ্যজীই জানেন।

টারপিন তেল মিশিয়ে চন্দর লিখে যেতে লাগলো—'প্রোঃ কবিরাজ নিত্যানন্দ তেওয়ারী।' ওপরের লাইন 'শ্রীধন্বন্তরি ঔষধালয়' বৈদ্যজী নিজেই লিখেছেন। সাদা অক্ষরগুলো মনে হচ্ছিলো যেন তুলো দিয়ে লেখা হয়েছে। তারও ওপরে বেশ খানিকটা জায়গা খালি দেখে বৈদ্যজী বললেন, 'ওহে বাবু, ওপরে জয়হিন্দ লিখে দাও···আর এই জায়গাটায় একটা দ্রাক্ষাসারের বোতলের ছবি আর ঐ জায়গায় একটা খল-নুড়ি এঁকে দাও···ড্রইং আমিও আট ক্লাস অবধি করেছি, কিন্তু এখন আর অভ্যেস নেই।'

চন্দর মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিলো। ভাবছিলো, শুধু শুধু এ এক ঝুট ঝামেলা। হাতের লেখা ভালো হওয়ার খেসারত। বললো, 'কোনো পেণ্টারকে দিয়ে নয় করাতেন…খুব সুন্দর করে লিখে দিতো, অত সুন্দর কিন্তু আমাকে দিয়ে হবে না।' ঘাম মুছতে মুছতে হাতেব তুলিটা মাটিতে বেখে দিলো।

'পেণ্টার দু'লাইন লিখতে পাঁচ টাকা হেঁকেছিলো। নিজেরা মেহনত করে দশ বাবো আনাতে সেবে দেওয়া গেলো। রংটা তো রুগী দিয়ে গেছে। ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর পেণ্টার বদহজমে ভুগছিলো। দু পুরিয়া ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়াতে সে দু তিন বকমের বংও কিছুটা ভার্নিস দিয়ে গেছে। দু'টো বাক্স রং হয়েছে, এই বোর্ডটাও তৈরী হলো। আবও এক আধটা চেয়ারও রং করা যাবে…তুমি শুধু এইটুকুই লিখে দাও, লালরঙেব শেড আমি চড়িয়ে নেবো…মার্জিনে একটা ফ্ল্যাগ এঁকে দেবে নাকি? দিয়েই দাও।'

চন্দর গরমে অস্থিব। দুপুব যত গড়াচ্ছে বাস্তার ধুলো ও 'লু'-এর জোরও তত বাড়ছে। চক্ষুলজ্জার খাতিবে চন্দর এই অনুরোধ এড়াতে পারলো না। পাখার ডাঁটি দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বৈদ্যজী ঠিকে গোমস্তাদের বড় বড় রেজিষ্টার টেনে নিয়ে ছড়াতে লাগলেন।

বোদে পোড়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দোকানের একটা পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে বৈদ্যজী খালি বেজিষ্টাবগুলোতে খতিয়ান ও পরচার নকল তুলতে লাগলেন। এঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে চন্দর জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কি বৈদ্যজী?'

বৈদ্যজী মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললেন, 'শুধু শুধু বসে থেকে কি করবো, তাই কিছু কাজ করছি। নতুন যারা সব খাতা লেখে, তারা কাজ-কর্ম কিছুই তো বোঝে না, রোজই নায়েব আর কানুনগোর কাছে বকুনি খায়…ওরা ঠিকে কাজ না করিয়ে যাবেই বা কোথায়, পুরণো ঘাগী গোমস্তা আর ক'জনই বা আছে, সবকিছুই

যাদের নখদর্পণে। নতুন এই সব গোমস্তাদের জন্যে পুরণোদের ভাত মারা যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি; কাজ এখনও পুরণোরাই তুলছে। এইভাবেই নতুন গোমস্তাদের টাকা সব নয়ছয় হচ্ছে। পেটের জ্বালা এদেরও আছে। চাষাদের ধাপ্পা দিয়ে কাজটা নিয়ে আসে। না নিয়ে এলে খাবেই বা কি? দু' চারজন এই রকম গোমস্তার কাছ থেকে আমিও কিছু কাজ মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকি। নকল করতে হবে, তাই রেজিষ্টারগুলো ভরছি।'

রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমশঃ কমে আসছে। অফিসবাবুরা সব চলে গেছে। সামনে চুঙ্গী অফিসের খসখসে জল দেওয়া শুরু হয়েছে। দূর থেকে 'লু' এর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছেব পাতাব খস খস শব্দ ভেসে আসে। ঠিক এই সময় একটা লোক ওঁব দোকানে উঁকি মারলো। বৈদ্যজী দুঃখেব কাহিনী বলে চলেছিলেন। লোকটিকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। লোকটিকে চট্ করে চিনতে পেবে একটু সাবধান হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পালটে নিযে বললেন, 'একটা সাইনবোর্ড আগ্রাতে করতে দিয়েছি, যতদিন না তৈরী হয়ে আসে, ততদিন এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এ সবের পেছনে মাথা ঘামাবার সময় কোথায...' খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, লোকটিকে প্রশ্ন করেন, 'কি খবর হে, কেমন আছো?'

'ডাক্তাবের সার্টিফিকেট চাই, কোসমা স্টেশনে খালাসীর চাকরি করবো', নীল পোষাক-পরা খালাসীটা জবাব দেয়।

ওর কি ধরণের সার্টিফিকেট লাগবে সেটা আঁচ করে বৈদ্যজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে থেকে কোন তারিখ অবধি তোমার সার্টিফিকেট চাই?'

'পনেরো দিন আগে এসেছিলুম, বৈদ্যজী। আরও সাত দিনের চাই।'

মনে মনে একটু খতিয়ে নিয়ে বৈদ্যজী বললেন, 'দেখো, সার্টিফিকেট ঠিক মত দিয়ে দেবো, সঙ্গে সরকারের দেওয়া রেজিষ্ট্রী নম্বরও দেবো, কিন্তু বাপু নগদ চারটে টাকা লাগবে।' বলে ফেলে

বৈদ্যজী ভাবলেন লোকটা চার টাকা শুনে ভেগে না যায়। তাই একটু হাতে রেখে বললেন, 'আগের জন্যে সার্টিফিকেট দিতে না হলে দু' টাকাতেই হয়ে যাবে…'

শুনে খালাসী বেশ একটু দমে গেলো, বৈদ্যজীর ঘাম শপশপে. মুখে আরও বেশী হতাশার রেখা ফুটে উঠলো। 'বৈদ্যজী, সোবরন সিং আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে,' খালাসী সব আশা ছেড়ে দিয়ে বললো। ভাবখানা এই যে কাজটা সোবরন সিং-এর, তার নয়। বৈদ্যজীর ধড়ে প্রাণ এলো। বললেন, 'সে আমি আগেই বুঝেছি। আরে, জানাশোনা না থাকলে সার্টিফিকেট আমি দিইও না, মান-ইজ্জতের ব্যাপার। আমি কি করেই বা জানবো তুমি কোথায় থাকতে, কি করতে? এটাও তো ভাবতে হবে, শেষে বিশ্বাস করে কি প্রাণটা হারাবো। পনেরো দিন আগের তারিখ দিয়ে তোমার নাম রেজিষ্টারেতে চড়াতে হবে, রোগের নাম লিখতে হবে, তারপরের সব ক'দিনই রেজিষ্টারে তোমার নাম লিখতে হবে। এ সব কি মামার বাড়ীর আব্দার…' বলতে বলতে চন্দরের দিকে তাকালেন তার সম্মতি পাবার আশায়। চন্দরও সায় দিয়ে বললো, 'বৈদ্যজী বা কি করে হাত গুনবেন যে তুমি সত্যিই অসুস্থ ছিলে না ডাকাতী করে বেড়িয়েছো। বাবা, সরকারী মামলা…'

'পাঁচ টাকার কমে ভূ-ভারতে কেউই তোমায় সার্টিফিকেট দেবে না…' এই কথা বলতে বলতে বৈদ্যজী খতিয়ান রেজিষ্টারটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'বলে, নিঃশ্বাস ফেলাব ফুরসৎ নেই। এই দেখো এই নামগুলো, দেখতে পাচ্ছো না। রোগীর কথা নয় বাদই দিলাম, সরকারকে দেখানোর জন্যেও রুগীদের পুরো রোজনামচা এই রেজিষ্টারে ওঠাতে হয়। প্রত্যেকটি রুগীর নাম, ধাম, আয় আর রোগের নাম এই খাতায় লিখতে হয়। তোমার নামও এতে চড়াতে হবে। এখন বলো দেখি, রুগী দেখা বিশেষ জরুরী না এই দু'চার টাকার জন্যে সার্টিফিকেট দিয়ে সরকারী ঝামেলায় ফাঁসা।' এই কথা বলে কালেক্টারীর খাতাটা বন্ধ করে সামনে থেকে সরিয়ে

দিলেন। উপকার করতে যাচ্ছেন এই রকম একটা ভাব করে কলম দিয়ে কাণ খুঁটতে লাগলেন।

রেলের খালাসী মিনিটখানেক বসে কি যেন ভাবলো। বৈদ্যজীকে মাথা হেঁট করে নিজের কাজে মশগুল দেখে আস্তে আস্তে দোকান থেকে নেমে পড়লো। বৈদ্যজী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ভাবলেন কথাটা খুব বেফাঁস বলা হয়ে গেছে। এর আর কোনও চারা নেই। কি যে করা উচিত তা' বুঝতে না পেরে বৈদ্যজী ডাক দিলেন, 'আরে শুনে যা, ঠাকুর সোবরন সিংকে আমার নমস্কার দিস···ওর ছেলেপুলে সব ভালো তো ?'

'হ্যাঁ, খবর সব ভালোই,' একটু থেমে গিয়ে খালাসী বললো।

খালাসীর যাতে কানে যায় সেইজন্যে একটু উঁচু গলায় বৈদ্যজী চন্দরকে বলেন, 'দশ গাঁ ঠেঙ্গিয়ে ঠাকুর সোবরন সিং আমার কাছে চিকিৎসা করাতে আসে। আর আমিও ওর জন্যে হামেহাল হাজির...' চন্দর বোর্ডের শেষ অক্ষরটা শেষ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, 'কি, চলে গেলো ?'

'ঘুরে ফিরে আবার ঠিক আসবে···' এই বলে বৈদ্যজী নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন আর মনে মনে ভাবেন বাছাধনকে ফিরতেই হবে। সাধে কি বলে, গাঁয়ে বৈদ্যও যা উকিলও তা। সোবরন সিং যদি ওর কাছে আমার নাম করে থাকে তবে ওকে আসতেই হবে···গাঁয়ের লোকের ট্যাঁক থেকে সহজে কিছু গলতে চায় না। একটু বসে ভেবেচিন্তে তারপর আসবে···

'যদি আর কোথা থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় করে নেয়', চন্দরের কথা শেষ না হতেই বৈদ্যজী বলে ওঠেন, 'না, না, তা' হতে পারে না।' বলে উঠেই সাইনবোর্ডে একবার চোখ বুলিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। 'বাহবা, বেশ সুন্দর হয়েছে, এতেই বেশ কাজ চলে যাবে। এর জন্যে পাঁচ টাকা পেণ্টারকে দিতে হলে, রুগীর ঘাড় ভাঙ্গতে হতো। ঐ এক্কাগাড়ী রাখার মতন। দুই-ই এক। ঘুরিয়ে নাক দেখানো আর কি। সৈয়দ

আলীর আঁকা বোর্ড তো আর রুগীকে সারাবে না। এতো বোঝবার কথা।' বলে একটু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। নিজের কথাতেই নিজে হাসলেন কিনা বোঝা গেলো না।

এই সময় আর একজন লোক দোকানে ঢুকলো। মনে হলো খালাসীটাই ফিরে এলো। কিন্তু আসলে তা নয়, একটা হ্যাবা রুগী। বৈদ্যজী যে খুব খুসী হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেলো। ভেতরে গেলেন। একটা মাদুলী নিয়ে এসে রোগীকে বললেন, 'এইবার এর খেল দেখো। কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে তোমার রোগ পালাতে পথ পাবে না।' রোগীর হাতে মাদুলীটা বেঁধে দিয়ে পকেটে পয়সা পুরে বৈদ্যজী আবার গম্ভীর হয়ে বসে পড়লেন। রুগী চলে যাবার পর বললেন, 'এই বিদ্যেটা আমার বাবা খুব ভালো জানতেন। বাবার লেখা অনেক বই পড়েছি··· অনেক সময় ভাবি যে তাঁর সব বিদ্যে আবার কাজে লাগাই ···। অনেক বুঝে সুঝেই তিনি লিখে গেছেন।··· এ সব বিশ্বাসের কথা। এক কণা ধুলোতে লোক চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হোমিও-প্যাথিই বা কি বলো? একটা ছোট্ট চিনির গুলি ছাড়া তো কিছু নয়। একবার বিশ্বাস জন্মানো নিয়েই কথা।'

চন্দর যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বললো, 'দাওয়াইখানা বন্ধ করার তো সময় হয়ে এলো, খেতে যাবেন না?'

'তুমি এগোও, আমি দু'চার মিনিট পরে যাবো', বলেই বৈদ্যজী আবার সেই কালেক্টরীর খাতাগুলো টেনে নিয়ে কাজে বসলেন। দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন। বাইরে রোদের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

পাশের দোকানদার বচ্চনলাল দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাচ্ছিলো। বৈদ্যজীর দরজা হাট করে খোলা দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, আপনি এখনও খেতে গেলেন না?'

'একটা জরুরী কাজ এসে পড়েছে। এই আর খানিকটা বাদেই যাবো,' বলেই বৈদ্যজী একটা মাদুর পেতে কাগজ,

রেজিষ্টার, কালি ইত্যাদি সব টেবিল থেকে নামিয়ে নিলেন। কিন্তু যা' গরম, দর দর করে ঘাম গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে হাত পাখা দিয়ে ঘাম শুকিয়ে নিয়ে নকল করতে লাগলেন। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কিছুক্ষণ কাজ করলেন। কিন্তু একটু পরেই হাঁপিয়ে উঠলেন। লেখা ছেড়ে ধুলোপড়া শিশিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। শিশিগুলো পর পর সাজালেন। কিন্তু গ্রীষ্মের দুপুর যেন আর কাটতে চায় না। দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে একবার রাস্তার দিকে তাকালেন। পথে এক আধজনই নজরে পড়লো। রাস্তায় লোকজনের চলাচল দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন। ভেতরে গিয়ে সাইনবোর্ডের তারটা ঠিক করে বোর্ডটা বাইরে টাঙ্গালেন। ধন্বন্তরী ঔষধালয়ের বোর্ডটা মাদুলীর মতন দোকানের গলায় দুলতে লাগলো।

আরও খানিকটা সময় কেটে যায়। শেষে বেশ এক ঘটি জল খেয়ে উরুর ওপর কাপড় তুলে তোড়জোড় করে আবার কাজে বসে গেলেন। বাইরে একটা আওয়াজ হতেই একটু চিন্তান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'আজ এখনও বাড়ী যাননি বৈদ্যজী?' জানাশোনা একজন দোকানদার বাড়ী যাবার পথে বৈদ্যজীকে শুধালো।

'যাবো যাবো করছিলাম, কিন্তু কিছু কাজ বাকী থাকায় ভাবলাম কাজটা সেরেই যাই...' বলে বৈদ্যজী দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসলেন। গায়ের জামা খুলে একপাশে রেখে দিলেন। বৈদ্যজীর দোকানটা একতলা ঘরে। ঘরের ছাদ রোদে যেন পুড়ে ঝামা হ'য়ে যাচ্ছে। চোখে তাঁর ঘুম জড়িয়ে এসেছে। ঢুলতে ঢুলতে একটু ঘুমিয়েও নিলেন, খানিকটা সময়ও কেটে গেলো। যখন আর বসে থাকতে পারলেন না তখন রেজিষ্টারগুলোকে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ার পর কিন্তু ঘুম ছেড়ে গেলো। কেবলই উসখুস করতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠেন। উঠে বসলেন। বচ্চনলাল সারা দুপুরটা বাড়ীতে কাটিয়ে দোকানে ফিরেছে।

'কি ব্যাপার, আপনি আজ এখনও এখানে, বাড়ী যাননি?...' বচ্চন সিং জিজ্ঞেস করলো।

বৈদ্যজী জোরে জোরে হাত পাখাটা নাড়াতে লাগলেন। বচ্চনলাল ওঁর দোকান থেকে নেমে যেতে যেতে বললো, 'আপনি কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'হ্যাঁ, একটা রুগী আসার কথা আছে... এখনও পর্যন্ত এলো...' বচ্চনলালকে চলে যেতে দেখে বৈদ্যজীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, শেষ আর হোলো না, চুপ করে ঘাম মুছতে লাগলেন।

মাত্র একটা খাট রাখবার জায়গা। ছোট্ট ঘরের বাইরে এসে সিপাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করলো, 'এর কি কোনো দাবিদার আছে?' কেউ জবাব দিলো না। সিপাই নিজের মনেই বলে, এর একটা হিল্লে তো করতেই হবে।

হিন্দু ছিল না মুসলমান?

সাইকেলের সীটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে অল্প বয়সের একটি ছেলে। বললো, বেশ্যা।

—জানি। কনস্টেবল ছেলেটিকে দাবড়ানি দিয়ে বলে ওঠে।

—সিপাইজী, কোনো সেবাব্রতী সংস্থার হাতে লাশ দিয়ে দিন। বিড়ির বাণ্ডিলটা সিপাই-এর দিকে এগিয়ে একজন বললো।

—গতকাল থেকে লাশ রাখা আছে, জান কি? বেশী দেরী করলে পচে যাবে। কনস্টেবল সাহেব, যত তাড়াতাড়ি হয় এর একটা বিলি ব্যবস্থা করো।

নাক দিয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে কনেস্টবল বললো, আগে জানা দরকার এর কোনো দাবিদার আছে কিনা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-ভাইপো। রিপোর্ট যদি না লেখাই, থানায় বোমা ফাটবে।

হারামজাদারা তো আমাকেই বলবে। একটা কিছু তো জানা দরকার। বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছেড়ে সিপাহী মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়লো। কিছু লোক সিপাই-এর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কয়েকজন দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো।

আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ি, দোচালা ও ছোট ছোট কুঁড়েঘর। কাঁচা রাস্তা। সুরকি ফেলায় রাস্তাটাকে রঙিন দেখাচ্ছে। সারাটা দিন ধরে সমানে হাওয়া বইছে। লাল সুরকির ধুলো উড়ছে। বস্তিটাকে কি রকম যেন নির্জন লাগে।

এই বস্তি পাড়ায় ইমরতী হলো শেষ মেয়েছেলে। এখানে দু' তিন

বছর ধরে পড়ে আছে, কত ঝগড়া বিবাদ সত্ত্বেও এখান থেকে নড়েনি। বস্তির লোকও এখন ওকে স্বীকার করে নিয়েছে। ওরা জানে এর সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবে না। বড় জোর কথাবার্তা বন্ধ রাখতে পারে। ইমরতী যখন সেজেগুজে পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতো সেই সময়টুকু ছাড়া কথা বলার সুযোগই বা ছিলো কোথায়?

দি সিন্ধু হিন্দু হোটেল, সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ওখানে ফিল্মের গান বেজে চলে।

বিকেলবেলা ইমরতী যখন নিজের জন্যে মাংসের ঝোল নিতে আসতো তখনও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতো না। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে হয়তো বুঝে নিয়েছিলো এখানে যারা বসে থাকে, তারা সব কিছু মুফতে সারতে চায়। আর মুফতে যারা কাজ সারতে চায় তাদের ওপরে ওর জন্মাবধি রাগ।

একটি ছেলেকে পয়সা দিয়ে ইমরতী রঙিন চক দিয়ে সুডৌল ও সুন্দর হস্তাক্ষরে নিজের ঘরের দেওয়ালের ওপর লিখে রেখেছিলো, 'ধার করা ভালবাসার কাঁচি।'

ইমরতীবাঈ ছুনিয়ার অন্য বেশ্যার থেকে একেবারে আলাদা। পান কিনে চলে যাবার সময় পানওয়ালা এ কথাই বলতো। ইমরতীর বেশী কথা বলার অভ্যাস ছিলো না।

ওর কাছে খদ্দেরও কম যেতো। শেষের দিকে খদ্দের কমতে কমতে একটি ছু'টিতে ঠেকেছিলো। ওর কাছে কেই-বা যাবে? পানওয়ালা বলতো, ও না করে গান, না পাছা ছুলিয়ে চলে। শুধু শরীরের চাহিদা মেটাতেই কি লোকেরা যায়?

এটা তো সময়ের ব্যাপার।

পানওয়ালার এই কথা শুনে কেউ কেউ বলতো, লোকতো ওর কাছে নাচ-গান শুনতে যায় না, যায় ওর শরীরের গন্ধে। শুনে পানওয়ালা বলতো, কিন্তু শরীরের তো জলুস থাকা দরকার। ওর কাছে সেটুকুও আদায় করা যায় না। ইমরতীবাঈ সত্যিই বেশ্যা।

পানওয়ালা পান বানাতে বানাতে এখনও নিজের 'কথাই বলে যাচ্ছিলো। বলছিলো, আমি জানতাম ওর এই দশাই হবে। আমি ওকে বলেওছিলাম, ইমরতীবাঈ চিকিৎসা করাও। এখনও বেঁচে যাবে। কিন্তু অভাগী, জীবনে শুধু সারা দুনিয়ায় রোগ ছড়িয়েই বেড়ালো। এখন মরেছে কিন্তু ওকে ওঠাবার পর্যন্ত লোক নেই। যাই বলো, ইমরতীবাঈ সত্যি সত্যি বেশ্যা। ওর কথা সবই আমি জানি।

পানওয়ালা ওখানে বসে পানের ওপর খয়েরেব প্রলেপ দিতে দিতে বললো—সিপাইজী লাশ তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নাও। খারাপ রোগে মরেছে। সিপাই কাঁচের গ্লাসে গবম চায়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চুমুক দিচ্ছিলো। পানওয়ালার কথা শুনে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই সময় দেখতে পেলো মিউনিসি-প্যালিটির ময়লা ফেলার মোষেব গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকছে। এক চুমুকে চা-টা শেষ করে গেলাসটা হোটেলের ছোকরার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাড়ীটার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো—এই বেটা তোর নাম কিরে?

গাড়ী থেকে নেমে গাড়োয়ান জবাব দিলো— বংশীলাল।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—ডিউটিতে। রুক্ষ জবাব। সিপাহিকেও ভয় পায় না। ভিড় না থাকলে হয়তো ও গাড়ীই থামাতো না। গান গেয়ে গেয়ে এ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতো। ইমরতীবাঈ বাইরে আসুক বা না আসুক, এদিক দিয়ে ডিউটিতে যাবার সময় বংশীলাল একবার এ গলি ছুঁয়ে গান গেয়ে যাবেই।

—এই বেটা বংশীলাল। সিপাই তাকে চোখ রাঙিয়ে বললো। ডিউটি কেনসেল করে দে। শ্মশানে যেতে হবে।

—কে মরেছে? চাবুক গাড়ীতে রেখে বংশীলাল জিজ্ঞেস করলো।

—ইমরতীবাঈ।—ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে।

—কি বললে ? ওর যেন বিশ্বাস হোলো না, তাই আবার জিজ্ঞেস করে—কি বললে ?

এখান থেকে তাড়াতাড়ি লাশ ওঠাবার ব্যবস্থা কর, বুঝলি ? আমি থানায় যাচ্ছি। রিপোর্ট লেখাতে হবে। সিপাই বংশী-লালের পিঠটা চাপড়ে দেয়। পকেট থেকে ময়লা, তেলচিটে একটা নোটবুক বের করে পেনসিল দিয়ে কি সব লিখতে লিখতে বেরিয়ে যায়।

বংশীলাল রাস্তার একধারে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো। দেখি তো, এই কথা বলে ছোট্ট ঘরের ভেতরে পা বাড়ালো। ওখানে যারা দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো, তাদের মধ্যে কেউ-ই ভেতরে যায়নি। বংশীলালকে যেতে দেখে দু'একজন তার পিছু পিছু ভেতরে গেলো। চারপাই-এর ওপর মৃতদেহ শোয়ানো। কেউ চাদর দিয়ে পর্যন্ত ঢেকে দেয়নি।

এই প্রথম বংশী এই ছোট্ট ঘরে এলো। আর ঘরে ঢুকেই ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

ইমরতী বাঈকে সে অনেকবার দেখেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো একদিন না একদিন ওর কাছে যাবেই। ঐ টুকটুকে সুন্দর মুখ আর ঐ ফর্সা গোলাপী দেহ, এত ধকলের পরেও কেমন আঁট-সাঁট দেখাতো।

কিন্তু বংশীলাল কখনই যেতে পারেনি। পয়সাও ছিলো না। সে জানতো ইমরতী বাঈ-এর কাছে খদ্দের কম এলে কি হবে ওর দর খুব বেশী। আর তাছাড়া ওর দর ও কিছুতেই কমাবে না। দর যদি কমাতে রাজীও হয় বংশীলালকে পছন্দ করবে কেন ? নিজের চেহারা সম্বন্ধে ও খুবই সচেতন। দেখতে যে ওঁকে মোটেই ভালো নয়, সেটা সে ভালো ভাবেই জানে। আর দেখতে শুনতে খাটো বলে ও অন্যের হাসির পাত্র, তাও জানে। লোকেদের এই বিদ্রূপ, এই টিটকিরিতে ওর রাগ হয় ; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে রাখে।

ডিউটির পর বিকেল বেলা বংশীলাল ফর্সা পাঞ্জাবী ও মিহি ধুতি পরে সিনেমা হল পর্যন্ত বেড়াতে যেতো। বাঁশীতে ফিল্মের গান বাজিয়ে ছোক্রাদের জড়ো করতো। বাঁশী বাজিয়েই ও জমাট আসরের কেন্দ্রমণি হয়ে উঠেছিলো।

ইমরতী বাঈ-এর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো খোলা, বুকের কাপড় অবিন্যস্ত। হাঁটুর ওপরে কাপড়টা উঠে আছে। অবস্থা দেখে বংশীলালের দুঃখ হয়। দেরী করা চলবে না ভেবে এগিয়ে গিয়ে শাড়ীটা দিয়ে শরীরটা ঢেকে দেয়।

আপন মনেই বলে ওঠে, চারপাই বাইরে নেবার দরকার নেই। লাশের পায়ের দিকটা দু'হাত দিয়ে উঠিয়ে বললো, একটু সাহায্য করুন তো। একজন ধরলো ঘাড় ও অন্য জন পিঠ। এইভাবে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা হোলো। অন্য যারা লাস বয়ে নিয়ে আসছিলো তাদের একটু দাঁড়াতে বলে বংশী চটপট বলে ফেললো— গাড়ীটা একটু ধুয়ে নেওয়া যাক। মড়া টেনে নিয়ে যাবার অভ্যাস ওর আছে। কিন্তু এই প্রথমবার ও অনুভব করলো এই রকম নোংরা গাড়ীতে ইমরতীকে নিয়া যাওয়া চলে না।

মোষের পিঠে চাবুকের ঘা মেরে ও গাড়ীটাকে কলের কাছে নিয়ে যায়। কলটা জোরে খুলে দিয়ে খুব ভাল করে গাড়ীটা ধুতে থাকে। হাতে জল নিয়ে গাড়ীর বাইরে ও ভেতরে জল ছিটিয়ে দেয়। একটা ময়লা কাপড় দিয়ে ভাল করে রগড়িয়ে রগড়িয়ে গাড়ীটা সাফ করে। লাফ দিয়ে মোষের পিঠে চড়ে বসে নিজের পরিষ্কার গাড়ীটার দিকে খুসী মনে তাকায়। তারপর নিজের মনেই বলে, আর একটু ধুয়ে নেওয়া যাক। এই বলে নীচে নেমে কাজে লেগে যায়।

মৃতদেহের আশেপাশে প্রায় জন কুড়ি লোক জড়ো হয়েছিলো। গাড়ীটা হাঁকিয়ে বংশী সেখানে গেলো।

একটু সরে যান তো। একটু জায়গা দিন তো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে গাড়ী থেকে নামে। নিজেকে অনেকটা সংযত করে

আওয়াজ দিলো—একটু সাহায্য করুন। হাত লাগান তো, লাশ ওঠাই।

লোকেরা এগিয়ে এলো। মৃতদেহটা এদের সাহায্যে গাড়ীতে ওঠানো হোলো। বংশী আবার বললো—একটু সামলে।

বংশী গাড়ীর ওপর উঠে যায়। লাশ রাখবার জায়গা তৈরী ছিলো। মৃতদেহকে পুরোপুরি শুইয়ে রাখার মত জায়গা গাড়ীতে ছিলো না বলে সে বেশ একটু অসুবিধেয় পড়লো। মিউনিসিপ্যালিটির ওপর রাগ হয়। এতো ছোট গাড়ী যে শিশুর মৃতদেহ নেওয়াই মুশকিলের ব্যাপার।

এ ভাবে নয়, ও ভাবে। আরও দু'জন লোকের সাহায্যে বংশী মৃতদেহ গাড়ীতে কোন মতে শুইয়ে দেয়। নিজের কাঁধের গামছা নিয়ে বালিশের মতো তৈরী করে শবের মাথায় দিয়ে দিলো। এত সবের পর সে একটু সোয়াস্তি পায়।

গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে বংশী একবার সবার দিকে নজর বুলিয়ে নেয়। তার মনে হয় সে এদের চেয়ে অনেক ভালো। কেউ কিছু বলার আগেই ও গাড়ী হাঁকালো। নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে গিয়ে বসলো।

কিছু দূরে গিয়ে বংশী পেছন ফিরে তাকায়। দেখে ভীড় ভেঙ্গে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। একজন এগিয়ে গিয়ে ইমরতী বাঈয়ের দরজার শেকল লাগিয়ে দিচ্ছিলো।

বংশীলাল গাড়ী আরও জোরে হাঁকায়। ঠিক মোড়ে এসে গাড়ী থামিয়ে নামলো। শবের দিকে তাকিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়। লাশ সেরকমই অর্ধশায়িত। নড়াচড়ায় শাড়ী সরে গিয়ে মৃতদেহ প্রায় নগ্ন হয়ে গিয়েছে। একবার নগ্ন শরীরের দিকে নজর পড়ায় লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ী দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দিলো। পানওয়ালার দোকানের দিকে এগিয়ে যায়।

পকেটে সাতটা টাকা ছিলো। মাইনে থেকে বাঁচানো। যে সব জিনিষ নিতে হবে তার একটা ফর্দ ক'দিন ধরেই ওর মাথায়

ঘুরছে। পকেট থেকে টাকা বার করে দোকানের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললো, খুচরো দাও তো।

পানওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বলে, এত খুচরো নেই।

কিন্তু বংশী শুনতে না পাওয়ার ভাব দেখিয়ে বললো—একটু তাড়াতাড়ি। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দেখলো পানওয়ালা একটা কাপড়ের থলি থেকে একরাশ রেজগারী বার করে গুনছে।

থলিটা হাতে নিয়ে বংশীর সাহস বেড়ে যায়। একলাফে গাড়ীতে চড়ে বসলো।

গাড়ী চালাতে গিয়ে দেখে পানওয়ালা ও আরও দু'তিনজন লোক ওর দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসছে। পানওয়ালা খয়েরের ডাণ্ডিটা নাড়াতে নাড়াতে ওর দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করছিলো।

বংশী মনে মনে তাদের গালি দিয়ে মোষের পিঠে কষে ডাণ্ডার বাড়ি মারলো।

মহল্লার বাইরে এসে ও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। প্রখর রোদে এত পরিশ্রমে ওর গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। রাস্তা দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করছে। প্রায় সব দোকানই খোলা।

মৃতদেহ কি ভাবে আছে বংশী একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নেয়। সব ঠিক আছে। শুধু মাথার বালিশ নীচের দিকে একটু সরে গেছে। গাড়ী থামিয়ে বংশী বালিশটা আবার ঠিক করে দিলো।

গাড়ীর দোলা লেগে লাশ হঠাৎ একটু কেঁপে উঠে। জীবিত শরীর ছুঁয়েছে ভেবে সে নিজেও একবার শিউরে ওঠে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে বংশী ভাবতে লাগলো চমৎকার একটা শাড়ী দিয়ে যদি এই শরীর ঢাকা থাকতো কত ভালো হতো। কতদিন রঙ-বে-রঙের শাড়ী পরে ইমরতী বাঈকে ও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। রাণী রূপবতী ছিলো যেন।

প্রত্যেকবারই তার মনে হোতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার যেন প্রতীক্ষা করছে সে। গলির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠতো। দরজার সামনে এসে তো বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে যেতো। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্বেও কিছুতেই ওর চোখে চোখ রাখতে পারতো না। লজ্জায় মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতো। অনেক দূরে গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নিতো। দেখতে পেতো সে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। রাণী রূপবতী। ওখানে ওর দাঁড়িয়ে থাকা আর বংশীর ওদিক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। বংশী সেই কথাই ভাবতো। একদিন না একদিন ওর কাছে ও নিশ্চয়ই যাবে।

কোলে পড়ে-থাকা থলিটায় হাত ঢুকিয়ে পয়সাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে, হাত বুলিয়ে তাদের আদর করলো। একমুঠো খুচরো পয়সা বার করে এদিক ওদিক দেখে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। দোকানে যারা বসেছিলো আর পথ দিয়ে যারা চলছিলো, পয়সার বৃষ্টি ও তার ঝনঝন শব্দ শুনে অল্পক্ষণের জন্যে থ হয়ে গেলো। ছোট ছোট ছেলেরা ও ভিখিরির দল পয়সা কুড়োবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো। বংশী গাড়ী থামিয়ে দেখতে থাকে, লোকগুলো কি ভাবে পয়সাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওদের মধ্যে কি রকম কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। সারা রাস্তায় ছড়ানো পয়সাগুলো যখন সব সাফ হয়ে গেছে, তখন সে থলির মধ্যে হাত দিয়ে আবার একমুঠো পয়সা বার করে ওপরের দিকে ছোঁড়ে। রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—রাম নাম সত্য হ্যায়। পয়সার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই যন্ত্রচালিতের মত বলে ওঠে, সবকী রহী গত্য হ্যায়। খুশী হয়ে মোষের পিঠে দমাদম দশ বিশ ঘা পাচন বাড়ি মেরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলো। গাড়ী ছুটতে থাকে আর তার পেছনে পেছনে পয়সা কুড়োনীর ভীড়।

সামনের মোড়ে গিয়ে বংশী ছুটে-চলা গাড়ীটার রাশ টেনে ধরে। চিৎকার করে বলে ওঠে, রাম নাম সত্য হ্যায়।

সবকী য়হী গত্য হ্যায়।

গাড়ীর আগে ও পেছনে বেশ ভিড় জমে গেছে। কিছু লোক গাড়ীটাকে ধরে আছে। গাড়ীটাকে মড়া বয়ে নিয়ে যাবার খাট মনে হচ্ছিলো। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একজন ভিখিরি আসছিলো। রামনামের হট্টগোলের মধ্যে ফিসফিস করে বললো—শেঠজী, বাজনাওয়ালা ভাড়া করবে নাকি ?

বংশীর মনের ভেতরটা তখন আবেগে উচ্ছল, বিহ্বলতায় চোখ হু'টি প্রায় বন্ধ। ভিখিরি আবার বললো—নিয়ে আসবো শেঠজী ?

—নিয়ে আয়। একমুঠো পয়সা নিয়ে এবারও রাস্তার বাঁ দিকে ছুঁড়লো। জল যেমন গড়িয়ে যায়, লোকের ভীড়ও তেমনি পয়সার দিকে ছোটে।

ইতিমধ্যে আর একটা ভিখিরি একগাদা ফুল ও ফুলের মালা নিয়ে হাজির। বংশী গাড়ী থামায়। নীচে নেমে ফুল ও মালা মৃতদেহের ওপর ছড়িয়ে দিলো। কে মারা গেছে ? বংশীলাল কয়েকজন লোককে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে শুনলো।

'ইমরতী বাঈ', মালা ছড়িয়ে দিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে ওঠে।

'ইমরতী বাঈ কে ?'

'বেশ্যা।' বংশী রেগে কটমটিয়ে তাদের দিকে তাকায়।

'নামকরা বেশ্যা'। বংশী এবার একটু গর্বের সঙ্গে তাকালো।

এতক্ষণে বাজনাওয়ালা এসে গেছে।

'বাজাতে বোলবো শেঠজী ?'

'বাজাও'।

লাফিয়ে সে গাড়ীতে উঠে বসে, বাজনা সুরু হয়। বাজনায় ভীড় আরো বাড়লো। থলি থেকে পয়সা বার করে সে আবার ছুঁড়লো।

রামনাম সত্য হ্যায়।
সবকী য়হী গত্য হ্যায়।

এত ভিড় কী করে সামলাবে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, সে সামলাতে পারবে। একবার ইচ্ছে হয় শবযাত্রার মোড়

ঘুরিয়ে ইমরতী বাঈয়ের দরজার কাছে যদি নিয়ে যাওয়া যায়। মন খুসীতে ভরে ওঠে। নিজের এ খুসীর ভাব চেপে রেখে বংশী গাড়ীটাকে জোরে চালিয়ে দেয়। রোদ্দুরের তেজ তখন খুব বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সব কাজ সারতে হবে। সব কিছুই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। বংশী ভাবে, অনন্তকাল ধরে যদি এই শব-যাত্রা চলতো।

ওপর দিকে তাকায়। দেখে, বৃদ্ধা ও অল্পবয়স্ক মেয়েদের দল বাড়ীর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। ভিড় আব বাজনার চেয়ে তার ওপরেই বেশী নজর।

বংশী নির্ভয়ে এদেব দিকে তাকিয়ে দেখে আর শোনার চেষ্টা করে ওরা কি বলাবলি করছে।

বাজনার আওয়াজের ভেতরেই দু-একটা কথা কানে এলো: 'আরে কিছু নয়, বংশী মেথব।'

'মেথর' কথাটা শুনেই বংশীর সব সুখ মাটি হয়ে যায়। ছাদে আর সদর দরজায় যে সব মেয়ে ও বাচ্চা দাঁড়িয়েছিলো তাদের দিকে সরোষে তাকায়।

কেউ ওকে মেথর বললে ও মোটেই তা সহ্য করতে পারতো না।

অন্যের চেয়ে সে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। নিজের জাতের সব ছেলেদের বলে রেখেছিলে, কেউ যদি তোদের মেথর বলে তো ময়লা পরিষ্কার করবি না।

ওকে মেথর বলে ডাকছে শুনে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। ওর পাশে পাশে যে ভিখিরিটা যাচ্ছিলো তাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো—জোরে বাজনা বাজা। থলি হাঁতড়িয়ে দেখলো পয়সা আর বেশী নেই। ভাবে, এখন বুঝে-শুনে খরচ করতে হবে। পয়সা ছোঁড়া বন্ধ করে এবার গাড়ীর টিনের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে বললো—রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়।

সহরের বাইরে নদী। নদীর অন্য পারে শ্মশান। দূর থেকে সেতু দেখা যায়।

কিছু পয়সা নিয়ে খুব জোড়ে দূরে ছুঁড়লো। দূরে পয়সা ছড়াতে, ভিড়টা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে, দেখে বংশী খুসী হয়।

সেতুর কাছে এসে গাড়ীটাকে দাঁড় করায়। ভিখিরির হাতে পয়সা আর থলিটা দিয়ে বললো—ফিরে যা। বাজনা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা ও ভিখিরিরা ফিরে যায়। শুধু তিনচার জন পথিক ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে একজনকে সে বলতে শোনে—আমি বলছি ও নড়ে উঠেছে।

—কি নড়ে উঠেছে? ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে জিজ্ঞেস করে।

—তোমার লাশ।

সত্যিই নড়ে উঠেছে নাকি? মরা মানুষ বেঁচে ওঠার কাহিনী বংশী শুনেছে। আরও শুনেছে কখনও কখনও চিতার ওপরে মৃতদেহ উঠে বসে। মরা মানুষের প্রাণ আবার ফিরে আসে। এটা কি করে হয় তা অবশ্য বংশী জানে না। কিন্তু ডাক্তাররা পর্যন্ত একথা বলেন যে, দাহ করবাব আগে মড়াকে একবার ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

তাড়াতাড়ি শবের দিকে ঝুঁকে দেখলো, মৃতদেহ সত্যি কিছুটা সরে গেছে। খুসী আর অবিশ্বাসের দোটানায় বংশীর হাত কাঁপতে থাকে। চাদরের ভেতর থেকে মৃতদেহের হাত টেনে বাইরে বের করে। নাড়ী টিপে দেখে।

হ্যাঁ, সত্যিই তো চলছে। বেশ জোরে জোরেই চলছে, কিন্তু শরীর যে ঠাণ্ডা। তাড়াতাড়ি হাতটা নাকের কাছে নিয়ে দেখে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেই। তাহলে নাড়ী আর কি করে চলবে?

নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখলো বুকের ভেতরটা হৃদরোগীর মত ভীষণ জোরে ধড়ফড় করছে; বেশ জোরে জোরে। বংশী গাড়ীটা

হাঁকিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে চলতে লাগলো। সেতুর ছু'পাশে জল বয়ে যাচ্ছে। কিনারায় রাশিকৃত বালি। রোদ্দুর পড়ে চিকচিক করছে। ভিড় থেকে ছাড়া পেয়ে বংশী একেবারে একা হয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই, শুধু তার গাড়ীর চাকার শব্দ।

সেতু পার হয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে এলো। শ্মশানে ঢোকবার সময় কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে।

একধারে একটা মড়া পুড়ছিলো। ওব নাকে তুর্গন্ধ ভেসে আসে।

শ্মশানের চৌকিদারের ঘরের ঠিক সামনে এসে গাড়ীটা থামালো, খুব আস্তে খুব সাবধানে।

—কে? চৌকিদার নিজের রেজিষ্টার খুলে বললো। জ্বালানো হবে নাকি?

গোর দিতে হবে।

নাম কি?

ইমরতী বাঈ।

কত বয়স?

বত্রিশ। বংশী নিঃসঙ্কোচে বললো।

স্বামীর নাম? চৌকিদার রেজিষ্টার থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

বংশী একটু চুপ করে থাকে, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। কেউ শুনছে না তো? তাবপর আস্তে করে বলে—বংশীলাল বাল্মীকি। হাত বাড়িয়ে নিজেব নাম দস্তখত করে।

বাইরে এসে সন্তর্পনে বংশী লাশ নামালো। শাড়ীটা দিয়ে দেহটা ভাল করে ঢেকে দিলো। তারপর কোদাল নিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগলো।

মধ্যাহ্ন-ভোজন

রান্নাবান্না শেষ করে সিদ্ধেশ্বরী উনুনটা নিভিয়ে দেয়। হাঁটুর মধ্যে মাথাটা রেখে নিজের পায়ের আঙুলগুলো কিংবা মাটিতে চলমান পিঁপড়েগুলো দেখছিলো। হঠাৎ মনে হোলো অনেকক্ষণ থেকেই তার বিষম তেষ্টা পেয়েছে। টলতে টলতে উঠে গিয়ে কলসী থেকে এক ঘটি জল নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে। খালি পেটে জল খেতে গিয়ে বুকে আটকে যায়। 'হায় রাম' বলে সিদ্ধেশ্বরী মাটিতে শুয়ে পড়লো।

প্রায় আধঘণ্টা ও ভাবেই পড়ে থাকার পর সিদ্ধেশ্বরী আবার যেন বল ফিরে পায়। উঠে বসে চোখ দুটো রগড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়। সামনের বারান্দায় ভাঙাচোরা একটা খাটে শুয়ে তার ছ' বছরের ছেলে প্রমোদ। সিদ্ধেশ্বরীর চোখ পডলো ছেলেটার ওপর। ছেলেটা উলঙ্গ, গলা ও বুকের হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। নেতিয়ে-পড়া কাঁকুড়ের মত ওর হাত-পা শুকনো ও প্রাণহীন: পেট যেন হাঁড়ির মত ফুলে আছে। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, মুখের চারপাশে মাছি ভিন্‌ভিন্‌ করছে।

সিদ্ধেশ্বরী উঠে এসে নিজের একটা ছেঁড়া, ময়লা জামা দিয়ে ছেলের মুখটা ঢেকে দেয়। এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। বাইরের দরজার কাছে গিয়ে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে গলির দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন দুপুর বারোটা। রোদ্দুরের বিষম ঝাঁজ। মাঝে মধ্যে দু' একজন লোক মাথায় তোয়ালে বা গামছা জড়িয়ে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলেছে।

সিদ্ধেশ্বরী দশ-পনেরো মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারায় একটা ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। আকাশের কাঠ ফাটা রোদ্দুরের দিকে দুঃশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে দেখে কয়েক মুহূর্ত।

ভেতর থেকে আরও অনেকটা মুখ বাড়িয়ে গলির মোড়ে দেখলো ওর বড় ছেলে রামচন্দ্র আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে আসছে।

সিদ্ধেশ্বরী তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এনে বারান্দার এক পাশে খাটের কাছে রেখে দেয়। জায়গাটায় জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে রাখে। দরজার দিকে নজর পড়তেই দেখলো রামচন্দ্র বাড়ীর ভেতরে ঢুকছে।

রামচন্দ্র এসেই খাটের ওপর শুয়ে পড়ে, যেন শরীরে কোনো প্রাণ নেই। রোদে পুড়ে মুখ লাল হয়ে গেছে। চুল উস্ক-খুস্ক। ছেঁড়া পুরনো জুতোয় একরাশ ধুলো।

ছেলের কাছে যেতে প্রথমে সাহস হোলো না সিদ্ধেশ্বরীর। ভীত-ত্রস্ত হরিণীর মত মাথা উঁচু করে ঘুরে বসে আগ্রহের সঙ্গে ছেলেকে দেখতে থাকে। দশ মিনিট পরেও যখন রামচন্দ্র উঠলো না তখন সিদ্ধেশ্বরী ঘাবড়ে গেলো। কাছে গিয়ে ডাকলো: 'বড়কু, বড়কু।' কিন্তু বড়কুর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভয় পেয়ে যায়। ছেলের নাকের কাছে হাত রাখলো। নিঃশ্বাস ঠিকই পড়ছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখলো জ্বর নেই। হাতের স্পর্শে রামচন্দ্র চোখ মেলে চাইলো। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে মাকে দেখে চট করে উঠে পড়লো। জুতো খুলে ঘটির জলে মুখ হাত-পা ধুয়ে যন্ত্র-চালিতের মত চৌকির ওপর বসে পড়ে। সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে ভয়ে বলে, 'খাবার তৈরী। এখানে নিয়ে আসবো?'

রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলো, 'বাবা খেয়েছেন?'

সিদ্ধেশ্বরী রান্না ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে যেতে উত্তর দেয়—'এই এলেন বলে।'

রামচন্দ্র সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। বয়স প্রায় একুশ বছর, লম্বা, রোগা, ফর্সা, চোখ দুটো বড় বড়, ঠোঁট শুকিয়ে ঝুর ঝুরে হয়ে গেছে। এক স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসে নিজের আগ্রহেই প্রুফরিডিং-এর কাজ শিখতে যায়। গত বছর ও ইণ্টার পাশ করেছে।

সিদ্ধেশ্বরী খাবার থালা সামনে রেখে দিয়ে পাশে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। দার্শনিকের মত রামচন্দ্র খাবার থালাটাকে দেখলো। মোটে তুটো রুটি, একবাটি জলের মত ডাল আর সামান্য একটু ছোলার তরকারী।

রামচন্দ্র প্রথম গরস গিলে ফেলে জিজ্ঞেস করলো, 'মোহন কোথায়? বাইরে ভীষণ রোদ।'

মোহন সিদ্ধেশ্বরীর মেজ ছেলে। বয়স আঠারো। এ বছর প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে হাই স্কুলের পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কে জানে কখন ঘর থেকে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে সিদ্ধেশ্বরী কিছুই জানে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে মন চাইলো না। তাই মিথ্যে কথা বললো, 'একটা ছেলের বাড়ীতে পড়তে গেছে। এই এলো বলে। ওর খুব মাথা। চব্বিশ ঘণ্টা পড়াশুনো নিয়েই আছে। সব সময় পড়াশুনার কথাই বলে।'

রামচন্দ্র কিছুই বললো না। আর এক টুকরো রুটি মুখে পুরে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে আবার খেতে লাগলো। রুটির ছোট ছোট গরস করে ধীরে ধীরে চিবোতে থাকে।

ভয় ও আতঙ্কে সিদ্ধেশ্বরী নিজের ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে কিছু হোলো নাকি?' রামচন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করে মার দিকে তাকায়। মাথা নীচু করে কেমন যেন বাধ বাধ স্বরে বলে—'ভালো সময় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করে রইলো। রোদের তেজ আরও বেড়ে যায়। ছোট্ট আঙিনার ওপরে আকাশে তু'এক টুকরো মেঘ, যেন পাল-তোলা নৌকোর মত ভাসছে। বাইরে খরখর আওয়াজ করতে করতে একটা এক্কা বেরিয়ে গেলো। খাটের ওপর ঘুমন্ত ছেলেটার নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো : 'প্রমোদ খেয়েছে?'

সিদ্ধেশ্বরী প্রমোদের দিকে একবার তাকিয়ে উদারস্বরে বলে, 'হ্যাঁ, খেয়েছে।'

'কাঁদেনি তো?'

সিদ্ধেশ্বরী মিথ্যে কথা বলে, 'আজ সত্যিই কাঁদেনি। আজকাল ও বুঝতে শিখেছে। বলছিলো, বড় ভাই-এর ওখানে যাবো। এ রকম ছেলে…', কিন্তু আর কিছু বলতে পারলো না; যেন গলায় কিছু আটকে গেছে। গতকাল প্রমোদ রাবড়ী খাবে বলে জেদ ধরে। দেড় ঘণ্টা ধরে কান্নাকাটির পর ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

রামচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে মাকে একবার দেখলো তারপর মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলো। রামচন্দ্রের থালায় এক টুকরো রুটি পড়েছিলো। সিদ্ধেশ্বরী উঠতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো— 'আর একটা রুটি নিয়ে আসি?'

রামচন্দ্র হাত নেড়ে বারণ করে। তাড়াতাড়ি বলে উঠে—'না না। একটুও না। আমার পেট আগেই ভরে গেছে। এই রুটির টুকরোটাই তো থালায় ফেলে যাচ্ছিলাম—ব্যস। আর না।'

সিদ্ধেশ্বরী জেদ ধরে—'আচ্ছা আধখানা নে।'

রামচন্দ্র রেগে ওঠে—'বেশী খাইয়ে অসুখ করলে বুঝি ভাল হবে, না! তোমরা একটু ভেবে দেখো না। খালি নিজের জেদ। খিদে থাকলে কি রুটি নিতাম না?'

সিদ্ধেশ্বরী নড়লো না, সেখানেই বসে রইলো। রামচন্দ্র পাতে পড়ে-থাকা রুটির টুকরো থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ছোটটার দিকে তাকিয়ে বললো—'মা, জল দাও।'

সিদ্ধেশ্বরী ঘটি নিয়ে জল আনতে গেলো। রামচন্দ্র আঙুল বুলিয়ে বাটিটা দেখে নিয়ে হাতটা থালায় রাখলো। কিছুক্ষণ পরে রুটির টুকরোটা আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো, শেষে এদিক-ওদিক দেখে আস্তে করে রুটির টুকরোটা মুখে পুরে দিলো, যেন ওটা খাবার জিনিষ নয়, পানের খিলি।

মেজ ছেলে মোহন এসেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে পিঁড়িতে বসে পড়লো।

গায়ের রং শ্যামলা, ছোট ছোট চোখ। মুখে বসন্তের দাগ। ওর দাদার মত ছিপছিপে কিন্তু অতটা লম্বা নয়। বয়সের তুলনায় ওকে বেশ একটু গম্ভীর ও উদাস দেখায়।

সিদ্ধেশ্বরী ওর সামনে খাবার থালা রেখে প্রশ্ন করলো : 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে? দাদা তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো।'

মোহন রুটির একটা বড় গ্রাস গেলার চেষ্টা করতে করতে জবাব দিলো—'কোথাও যাইনি তো। এখানেই তো ছিলাম।'

সিদ্ধেশ্বরী ওখানে বসে হাওয়া করতে করতে এমনভাবে কথা বললো যেন ঘুমের ঘোরে কেউ বকবক করছে—'বড় ভাই তোমার খুব তারিফ করছিলো। বলছিলো, মোহন বড় বুদ্ধিমান : চব্বিশ ঘণ্টা পড়াশুনা নিয়েই আছে।' কথা কটা বলে সিদ্ধেশ্বরী তার মেজ ছেলের দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সিদ্ধেশ্বরী কিছু চুরি করেছে।

মোহন মার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে আবার খাওয়ার দিকে মন দেয়। দু'টো রুটি ওকে দেওয়া হয়েছিলো, একটা রুটি দিয়েই ও বাটির তিন ভাগ ডাল ও বেশীর ভাগ তরকারী সাফ করে ফেলেছে।

কি যে করবে, সিদ্ধেশ্বরী বুঝে উঠতে পারছিলো না। এই দু'জন ছেলেকেই সিদ্ধেশ্বরী ভয় করে চলে। হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে, সিদ্ধেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফেরায়। কিছুক্ষণ পরে মোহনের দিকে তাকায়। মোহন তার রুটি প্রায় শেষ করে ফেলেছে। সিদ্ধেশ্বরী সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আর একটা রুটি দেবো?'

মোহন জিজ্ঞাসুনয়নে রান্না ঘরের দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহে বলে ওঠে, 'না, থাক।'

সিদ্ধেশ্বরী আমতা আমতা করে বলে 'না, বাবা। আমার দিব্যি, অল্প একটু নে। তোর দাদাতো রুটি নিয়েছিলো।'

মোহন মার দিকে চেয়ে দেখলো। শিক্ষক যেমন নিজের

শিশুকে বোঝায় তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে উত্তর দিলো, 'না, ব্যস। প্রথম কথা ক্ষিদে নেই। তারপর, যা রুটি তৈরী করেছিস, খাওয়াই যায় না। কোন স্বাদই নেই। যদি দিতেই চাস তো বাটিতে একটু ডাল দিতে পারিস। ডালটা বড় ভালো হয়েছে।'

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কথা সরে না। বাটিটা ডালে ভরে দেয়।

মোহন চুমুক দিয়ে সুড়ুত সুড়ুত করে ডাল খেতে থাকে। ঠিক সেই সময় মুন্সী চন্দ্রিকাপ্রসাদের জুতোর খসখস আওয়াজ শোনা গেলো। তিনি রামের নাম স্মরণ করে চৌকিতে বসে পড়লেন। সিদ্ধেশ্বরী মাথায় ঘোমটা টেনে দিলো। মোহন ডালের বাটিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে জলের ঘটি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলো।

দু'টো রুটি, একবাটি ডাল আর ছোলার তরকারী। মুন্সী চন্দ্রিকাপ্রসাদ পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে রুটির গরস চিবোতে লাগলেন। মনে হয় যেন বুড়ী গাই জাবর কাটছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখতে লাগে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে, টাক মাথাটা আয়নার মত ঝকঝক করছে। ময়লা ধুতির ওপরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা গেঞ্জি, তাও শতছিন্ন। মুন্সীজী বাটিটা হাতে নিয়ে ডালে চুমুক দিয়ে বললেন— 'বড় ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি না যে।'

সিদ্ধেশ্বরীর আজ কি যে হয়েছে তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। একটা কিছু ওকে যেন বিঁধছে। সিদ্ধেশ্বরী পাখাটা আরো জোরে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো—'এই এক্ষুনি খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে। বলছিলো, কয়েক দিনের মধ্যেই চাকরীতে লেগে যেতে পারবে। সব সময় মুখে বাবা, বাবা, লেগে আছে। বলছিলো, বাবা আমাদের দেবতার সমান।'

মুন্সীজী বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সলজ্জভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁ্যা, কি বললে? বলছিলো বুঝি বাবা দেবতার সমান? ও একটা পাগল!'

সিদ্ধেশ্বরীকে যেন নেশায় ধরেছে। উন্মাদ রোগিনীর মত বিড়বিড় করে বললো, 'পাগল না, খুব বুদ্ধিমান। যেন কোন মহাত্মা। মোহন তো ওকে খুব শ্রদ্ধা করে। আজই বলছিলো যে, দাদার সহরে খুব সম্ভ্রম, বিদ্বান লোকেদের মধ্যে খুব কদর। আর ছোট ভাইদের জন্যে তো প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দুনিয়ায় সব কিছু সইতে পারে কিন্তু প্রমোদের কিছু হলে ও সইতে পারে না।'

মুন্সীজী হাতে লেগে যাওয়া ডালটা চেটে যাচ্ছিলেন। তিনি সামনের তাকের দিকে চেয়ে হেসে বললেন— 'বড়ব মাথাটা খুব পরিষ্কার। ছোটবেলায় বড় দুষ্টু ছিলো। সব সময় খেলাধুলো নিয়ে থাকতো। তবে এটাও ঠিক, যে পড়াটা তৈরী করতে দিতাম, সেটা ও মুখস্থ করে রাখতো। আসলে আমার তিন ছেলেই খুব বুদ্ধিমান। প্রমোদকে কিছু কম মনে করো নাকি ?' কথাটি বলে হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন। মুন্সীজী দেড়খানা রুটি খেয়ে একটা গরস নিয়ে খুবই বেকায়দায় পড়লেন। খেতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে এক গেলাস জল খেয়ে ফেললেন। খক্ খক্ করে কেশে তিনি আবার খেতে লাগলেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। দূরে আটা-কলের চাকীর পুক পুক আওয়াজ ভেসে আসছে। পাশের নিমগাছে বসে একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। এবার কি বলবে সিদ্ধেশ্বরী ভেবে পাচ্ছিলো না। সব কিছু ঠিক করে জিজ্ঞেস করে নেয় এটাই ও চাইছিলো। সব কিছু ঠিক মত জেনে নিয়ে দুনিয়ার প্রত্যেক বিষয়ে আগের মত নিঃসঙ্কোচে কথা বলে যায় এটাই তার ইচ্ছে। কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছিলো না। সিদ্ধেশ্বরীর মন এক অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে যায়। মুন্সীজী চুপচাপ খাচ্ছিলেন। যেন গত দু'দিন ধরে তিনি মৌনব্রত পালন করছেন। আজ বিকেলে সেই মৌনব্রত ভাঙবার কথা।

সিদ্ধেশ্বরী আর নীরব থাকতে পারলো না। বললো, 'এখন আর বৃষ্টি হবে না মনে হচ্ছে।'

কয়েক মুহূর্ত মুন্সীজী এদিক ওদিক দেখলেন। তারপর নির্বিকার হয়ে বললেন, 'বড় মাছি হয়েছে।'

সিদ্ধেশ্বরী ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো—'পিসেমশাই অসুস্থ ছিলেন, কিছু খবর পেয়েছো ?'

মুন্সীজী ছোলার দানাগুলি এমন মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন যেন ওদের সঙ্গেই কথা বলবেন। তারপর একটা খবর দিলেন—'গঙ্গাসরণ বাবুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছেলে এম, এ, পাশ।'

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ চুপ করে গেলো। মুন্সীজীও আর কথা বাড়ালেন না। মুন্সীজীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। থালায় দু'একটা ছোলার দানা পড়েছিল, তিনি বাঁদরের মতো সেগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী ছেলেদের মাথার দিব্যি দিয়ে বললো, 'আর একটা রুটি নাও। অনেক রুটি আছে।'

মুন্সীজী অপরাধীর মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আড়-চোখে একবার রান্নাঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে মুরুব্বির মত বললেন, 'রুটি রেখে দাও, পেট ভরে গেছে। ডাল ভাত আর নোনতা জিনিষে অরুচি ধরে গেছে। তুমি শুধু শুধু দিব্যি খেলে। যাক যখন দিব্যি গেলেছো, একটু গুড় দাও। গুড় আছে তো ?'

'হাঁড়িতে সামান্য একটু গুড় পড়ে আছে,' সিদ্ধেশ্বরী বললো।

তিনি সিদ্ধেশ্বরীকে বললেন, 'গুড়ের ঠাণ্ডা রস তৈরী করো, খাবো। তোমার দিব্যিও বজায় থাকবে, মুখের স্বাদও পালটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হজমের গণ্ডগোলটাও ঠিক হয়ে যাবে। রুটি খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে,' বলে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

মুন্সীজী খেয়ে উঠে গেলে সিদ্ধেশ্বরী ওঁর এঁটো থালাটা নিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে খেতে বসলো। ডালের হাঁড়িটা উলটিয়ে বাটিতে ঢেলে নিলো, কিন্তু বাটিটা পুরো ভরলো না। কড়ায় একটু তরকারী পড়েছিলো, সেটা নিজের কাছে টেনে নিলো।

রুটির থালাটাও টেনে নেয়। একটা পোড়া ও মোটা রুটি পড়েছিলো। তুলে এঁটো থালায় রাখতে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ তার নজর পড়লো বারান্দায় প্রমোদের দিকে। অপলকদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো। রুটিটা ছিঁড়ে সমান দু' টুকরো করে। এক টুকরো আলাদা রেখে দিয়ে অন্য টুকরোটা এঁটো থালায় রাখলো। তারপর এক ঘটি জল নিয়ে খেতে বসলো। টুকরো রুটি মুখে পুরে কেন জানি সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে।

সারা বাড়ী মাছিতে ভিন্‌ভিন্ করছে। আঙ্গিনায় ঝুলোনো দড়ির এক কোণে একটা তালিমারা ময়লা শাড়ী মেলা ছিলো। বড় দুই ছেলের কোনো পাত্তা নেই। বাইরের ঘরে মুন্সীজী মুখ ঢেকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছিলেন যেন প্রধান ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কেরাণীর পদ থেকে ওঁকে দেড় মাস আগে ছাটাই করা হয়নি আর বিকেলে ওঁকে কাজের খোঁজে কোথাও যেতে হবে না।...

বেড়ার এপার-ওপার

আমাদের প্রতিবেশী মুখার্জিরা আর এখানে থাকেন না। বদলি হয়ে গেছেন। নতুন যাঁরা এসেছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই। দেখে মনে হয় পাঞ্জাবী, নাও হতে পারে। ওঁদের ব্যাপার-ট্যাপার বোঝা দায়। আসার পর থেকেই ওঁদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল। কোনো বিষয় মাথা না ঘামিয়ে আমি থাকতে পারি না কেন, তা জানি না। দেশ বেড়াতে বেরিয়েও অতি সহজেই লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিই—এটাই হয়তো আমার স্বভাব। আমার বাড়ীর লোকেরও ওঁদের সম্বন্ধে কিছু কম কৌতূহল নেই। পাড়ায় আমাদের মানসম্ভ্রম তো আছে। মেয়ে-বৌ নিয়ে ঘর করতে গেলে একটু বুঝেসুঝে চলতে হয়। তাই ওঁদের চালচলন ও হাবভাব সব সময় আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। নতুন প্রতিবেশীর চালচলন ও হাবভাবের সঠিক ছাপ মনে আঁকারও চেষ্টা করি। সপরিবারে ওঁদের আমাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। ওঁদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতেও মন চায়। ওঁদের সম্বন্ধে আমার এতো জল্পনাকল্পনা বোধহয় ওঁদের চিন্তার বাইরে। জীবনধারা ওঁদের খুব সাদাসিধে বলে মনে হয় না। দিনের বেলা বেশ খানিকটা সময় ওঁরা বারান্দার সামনে মাঠে চেয়ারে বসে কাটান। চেয়ারগুলো সব সময়ই ঐখানে পড়ে থাকে। এমন কি রাতেও। এ ব্যাপারে ওঁরা বেশ বেপরোয়া, কিন্তু কপাল গুণে চেয়ারগুলো চুরিও হয় না।

আমাদের বাড়ীর আর এক পাশে সরকারী দপ্তর; ইটের উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ীর পেছন দিকে দোতলা ফ্ল্যাটগুলোর খিড়কী দরজা, সামনের দিকে সদর রাস্তা। বাড়ীর আশপাশটা এই ধরণের বলে আমার পরিবারের লোকেরা অন্য কোনও পরিবারের সঙ্গে সব সময় মেলামেশার সুযোগ পায় না। একের সঙ্গে অন্যের

যোগাযোগ না রাখাটাই বড় সহরের সভ্যতা। নতুন প্রতিবেশীদের দেখেশুনে মনে হয় তাঁরাও যেন এই সংস্কারে বিশ্বাসী। আমাদের এই সহর, বলতে কি পাড়াটাও, খুব শান্ত। এখানকার জীবনযাত্রা ঝিমে তেতালায় বয়ে চলে। লোকেরা ঘরোয়া ভাবেই মেলেমেশে। এই প্রতিবেশীরাই শুধু যা একটু অদ্ভুত।

সকাল নটা নাগাদ যখন বাইরে বেরোই, দেখি ওঁরা চা-জল খাবার খাচ্ছেন। স্বামী, স্ত্রী আর একটি মেয়ে, মেয়েটি ওঁদেরই মনে হয়। সব সময় একসঙ্গে তিনজনকেই চোখে পড়ে। এ ছাড়া আর কেউ নেই বলেই মনে হয়। মেয়েটি দেখতে সাধারণ, তবে সভ্যভব্য। ভালোভাবে একটু সাজগোজ করলে হয়তো বেশ সুন্দরীই দেখাবে। মেয়েটিকে প্রায়ই খুব হাসতে দেখি। মা বাপও সব সময় বেশ হাসিখুসী। ছোট্ট সুখী পরিবার। কে জানে সব সময় কথা বলার মতন অতো কি কথা আছে! এত হাসিই বা কিসের, সুখী বলেই কি দিনরাত হাসতে হবে? বোধহয় জীবনে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি ওঁরা হননি। অবাক হয়ে নিজের সংসারের সঙ্গে তুলনা করি।

হঠাৎ ওঁদের দমকা হাসির শব্দে চমকে উঠি। আমি তখন গোলাপের কেয়ারি নিয়ে ব্যস্ত। খুরপি চালানো থেমে যায়, কিন্তু ওঁদের হাসি থামে না। মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। চা ছলকে পড়ার ভয়ে পেয়ালাটা মার হাতে ধরিয়ে দেয়। হাসির চোটে মেয়েটি সোজা দাঁড়াতে পারছিলো না, নুয়ে পড়েছিলো। নিশ্চয়ই কোনো হাসির কথা হবে, না হলে এত হাসির হররা কেন? দেখে মনে হয় মেয়েটি কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। হুঁসও নেই যে গায়ের ওড়নাটা বুকের ওপর থেকে সরে গিয়ে শুধু কাঁধের ওপর ঝুলছে। অনেক আদিখ্যেতা হয়েছে। মা বাপের একটু ধমকে ওকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। জানি না, এ আবার কেমন তরো—লজ্জা ঘেন্নার বালাই নেই। আমি ছাড়া আর কেউ বোধহয় এটা লক্ষ্যই করেনি।

যত দিন যাচ্ছে ততই আমি হতাশ হয়ে পড়ছি। ওঁদের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব মনে দানা বাঁধতে থাকে। শুধু আমি নই, পপ্পিকেও যখন তখন মেয়েটির জামাকাপড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখি। রান্নাঘর থেকে বৌদিও প্রায়ই ওদের বাড়ীতে উঁকি ঝুঁকি মারেন। ঠাকুমার তো সব নখদর্পণে, কখন ওঁদের উনুনে আগুন পড়ে, কবে লাউ, কুমড়ো, পানিফল কেনা হয়। ওঁদের সম্বন্ধে আমাদের এতো উৎসাহ, কিন্তু ওঁরা আমাদের সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার।

মেয়েটি আমাদের দিকে তাকাতো না; মা বাপ তো নয়ই। ইচ্ছে করে যে তাকায় না, তাও নয়, কথাবার্তা বলা তো দূরের কথা। নিজেদের নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত, আমাদের কথা মনে করার অবকাশ কোথায়? হতে পারে আমাদের নীচু স্তরের মানুষ মনে করেন, নয়তো বা মনে কবেন আস্কারা দিলে আমরা হয়তো ওঁদের শান্তি ভঙ্গ করবো। কোনটা যে ঠিক, বলা মুস্কিল। বাড়ীর পাশে এমন একটি সমর্থ জোয়ান ছেলেকে দেখে ওঁদের কোনো আতঙ্ক হয় বলে তো মনে হয় না। অথচ আমার বন্ধুবান্ধবদের দেখে আমার বাবার পপ্পির জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

ওঁদের বাড়ী রেডিও চলে না, আমাদের বাড়ী হামেশাই জোরে চলে। ওঁদের বাড়ীর সামনে শুকনো খটখটে মাঠ, ঘাসের নাম গন্ধ নেই। আমাদের বাড়ীর সামনে লন্, পাশে সব্জির বাগান, নানারকম সুগন্ধি ফুলের কেয়ারি। মেয়েটি কেন যে আমার বোন আর বৌদির সঙ্গে সই পাতায় না, তাই ভাবি। ওর মা-বাবাই বা কেন আমার মা-বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন না? ওঁদের চেয়ে সুন্দর কাপে যখন আমরা চা খাই, ওঁরা কেন আমাদের দিকে তাকান না? ওঁরা কেন ওঁদের পরিচিতদের মধ্যে আমাদের গণ্য করেন না? আমাদের সঙ্গে সব সময় ওঁরা যোগাযোগ রাখেন নাই বা কেন? বেড়ার পাশে আমাদের ভাগের একটা বড় তেঁতুল গাছে বেশ বড় বড় তেঁতুল হয়েছে। মেয়েরা তো তেঁতুলের নামে পাগল,

প্রতিবেশীর মেয়েটি কেন তেঁতুলের দিকে ফিরেও তাকায় না? ও তেঁতুল পাড়তে এলে আমাদের তো বেশ ভালো লাগতো। একটা অলীক সম্ভাবনার কথা আমি মনে মনে না ভেবে পারি না—যদি কোনো দিন ওঁদের কোনো বিপদ-আপদ ঘটে আর ওঁরা আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসেন!

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে সবায়েরই কিছু না কিছু চিন্তা থাকে, কিন্তু ওঁদের দেখে মনে হয় ভাবনা চিন্তার কোনো বালাই নেই। মেয়েটির বাবাকে কখনও চিন্তা করতে দেখেছি বলে মনে হয় না। মেয়েটির মা কখনও কখনও হয়তো একটু আধটু চটে যান কিন্তু দূরত্বের জন্যে কিছু শোনা যায় না, দেখাতো যায়ই না। মনে হয় মেয়েটিরও নিজস্ব একটা আলাদা জগত আছে যা নিয়ে সেও মশগুল। মেয়েটির নিজের কোনো সমস্যা, কোনো দোটানা ভাব আছে কি নেই তাও দেখে বোঝবার উপায় নেই।

রাত্রিতে প্রায়ই এঁদের মাঝের ঘরের আলোটা জ্বলে। ঐ ঘরেই মুখার্জিমশাই সপরিবারে শুতেন। এঁরা হয়তো সবাই ঘরে বসে গল্পগুজব করেন। ওঁদের কথাবার্তার যেন শেষ নেই, অনর্গল কথাই বলেন, আর ওই কথা বলার মধ্যেই যেন ওঁদের পরম তৃপ্তি। নিজের অজ্ঞান্তে আপনা হতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমাদের বাড়ীতে সাধারণতঃ এই ধরণের কথাবার্তা হয়— হয় আবহাওয়া নিয়ে, না হয় মশামাছির উপদ্রব, কিংবা কার ছেলে হোলো বা না হোলো তা নিয়ে। রান্নাবান্না কিংবা পাড়াপড়শীর বৌকে নিয়েও পরনিন্দা পরচর্চা চলে। কখনো বা অতীতের গৌরব নিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ। আবার কখনো বর্তমানের মুণ্ডুপাত করে মহা খুসী।

ওঁদের আর আমাদের বাড়ীর মাঝখানে যে বেড়া সেটা নামে মাত্র। থাকা বা না থাকা দুই সমান। বেড়া বলতে যা বোঝায় তা হোলো মাত্র এক ফুট উঁচু একটা দেয়াল। তেতো করমচা আর কাঁটাগাছের শুষ্ক ডাল দেয়ালের গায়ে জড়িয়ে আছে। নাম-না-জানা গাছের কিছু ঝোপঝাড়, গোড়ায় সব সময়ই উই লেগে। ঝোপঝাড়ের

পাতার রং বেশ গাঢ় সবুজ। দেয়ালটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরী করে দিয়েছে। এই পথ দিয়ে কলওলা, সজীওলা, জমাদারণী, খবরের কাগজের হকার, সবাই যাওয়া আসা করে। বছরের পর বছর গোয়ালা আর পোষ্টম্যান এই পথ দিয়েই আসে যায়। এই পথ দিয়ে কুকুর বেড়ালও অবাধে চলাফেরা করে। ঘাসপাতা, ফুলের চারা খাবার জন্যে জন্তুজানোয়ারও এই পথে আসে। মুখার্জির মেয়েরাও এই পথে বই দেওয়া-নেওয়ার জন্যে আসা যাওয়া করতো। এই বেড়ার ভাঙ্গাচোরা জায়গাগুলো দিয়ে সাইকেল নিয়ে খেলাচ্ছলে বেশ ঘুরে ফিরে বেড়ানো যায়। আগে সাইকেল নিয়ে যেতামও, কিন্তু এখন আর যাই না। কেন না, আমাদের নতুন পড়শীর কাছে বেড়া মানেই তা অলঙ্ঘনীয়।

প্রায় তিন মাস হোলো এঁরা এসেছেন।

পড়াশুনার জন্যে প্রায়ই আমার ডেস্কটা বাইরে নিতাম। বেশ ফুরফুরে হাওয়া—গরমের দিনে তৃষ্ণার্ত হয়ে ঠাণ্ডা জলপান করার মতো। কিন্তু বাইরে পড়ায় মন বসানোই মুস্কিল— বেড়া টপকে নজর ওধারে চলে যায়। মনটাও ঐ বাড়ীতেই ঘুরঘুর করে। অবিবাহিতা তরুণী মেয়ে, খোসমেজাজী মা-বাপ। ভাবি, আমি কেন ওদের ঘরে জন্মালাম না। ওদের নিয়েই যত সব এলোমেলো কল্পনা।

কখনো কখনো মেয়েটি একলাই বসে থাকে। কখনো কোনো কাজ নিয়ে, কখনো বা শুধু হাতে। ঘুরতে ঘুরতে কখনো বা বাড়ীর আর এককোণে চলে যায়। দেয়ালে কনুই ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার ফিরে আসে। অন্য পাড়ার বাউণ্ডুলে ছেলেরাও আমাদের পাড়ায় এসে ভীড় করে। আমাদের পাড়াতেও বাউণ্ডুলে ছেলের অভাব নেই। মেয়েটি কিন্তু ওদের সম্বন্ধে নির্বিকার ও নির্লিপ্ত।

আমার বৌদি ঠিক এর বিপরীত, পুজোর ফুল তুলে আনার সময়ও আমার ছোট বোন পম্পিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। বাইরেও ভয়, বাড়ীতেও তাঁর ভয়। ওঁকে সব সময় ভয়ের মধ্যেই রাখা হোতো।

পিঙ্কির ওপরও বাড়ীর লোকের কড়া নজর। একবার এই পড়শী মেয়েটির বাবা তাঁর স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছিলেন। সেই না দেখে কোনো একটা অছিলায় পিঙ্কিকে বাড়ীর ভেতর ডেকে নেওয়া হয়েছিলো। সেই ব্যাপার নিয়ে আমাদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিলো। মন্তব্য হয়েছিলো, কি বেহায়া রে বাবা। ক্রমশঃ এদের চালচলনে বেহায়াপনা দেখে বাড়ীর সবাই ভয় পেতে লাগলো।

দিন কেটে যাচ্ছিলো। এদের নিয়ে এতো মাথা ব্যাথার কোনো দরকারই ছিলো না। কিন্তু আমার বাড়ীর লোকেরা এঁদের হাবভাব, চালচলন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো, আর নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। এই প্রতিবেশীরা ক্রমশঃ আমার বাড়ীর লোকের কাছে দুনিয়ার যা কিছু খারাপ তার জীবন্ত রেফারেন্স হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের চোখ দরকারে অদরকারে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার বেড়ার ওধারে যায়। হাজার কাজের মধ্যে এটা একটা নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। নানান চিন্তা ভাবনার মধ্যে এ আর এক নতুন উপসর্গ। এঁদের নিয়ে আমিও অনেক মাথা ঘামাতাম, সময় নষ্ট করতাম। কিন্তু ওঁরা কোনো দিন এদিকে ফিরেও তাকাতেন না।

কাছে কোথাও 'আউটার' (সিগন্যাল) না পেয়ে ডিজেল ইঞ্জিন গর্জন করে চলেছে। হঠাৎ এই আওয়াজ শুনে পিলে চমকে যাবার জোগাড়। ডিজেল ইঞ্জিন নিয়েই আমরা খানিকক্ষণ মেতে রইলাম।

আজ দুপুর থেকে পড়শীর কাউকেই বাড়ীতে দেখছি না। ওঁদের বাড়ীতে সম্ভবতঃ দু চারজন অতিথি এসেছেন। কোনো সোরগোল নেই। রোজের মতন সবই নিঃশব্দে হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠে বাড়ীর ভেতরে গেলাম। দেখি বৌদি রোদে পিঠ দিয়ে চুল শুকোচ্ছেন। জানি না কেন হঠাৎ পাড়ার মেয়েটিকে নিয়ে বৌদি চুপি চুপি আমার ঠাট্টা করলেন। মনে মনে খুব হাসি পেলো, বাইরে এলাম। দেখি, পাড়ার মেয়েটি ও তার মা বাজার থেকে ফিরছেন, সঙ্গে প্যাক করা অনেক জিনিষপত্তর। বাবা বোধহয় পেছনে রয়ে গেছেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় আর পরের দিন সকালে এঁদের বাড়ীতে সমানে লোকজন যাতায়াতের ধুম, লোকের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয়। ওঁদের বাড়ীতে ছোটখাটো কোনো উৎসব বলেই মনে হয়। দুধ-ওলার মুখে যখন জানা গেলো যে গতকাল রাত্রে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, তখন সবাই আমরা অবাক। ছেলেটি নাকি মিলিটারীতে কাজ করে। বিয়ে হয়েছে আর্য সমাজ মতে। বৌদি আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখে হাসি পেলো—আমরা কত অবান্তর জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাই—এই ভেবে হঠাৎ জোরে হেসে ফেললাম।

ওঁদের বাড়ীতে দু একজন লোক এখনও যাওয়া আসা করছেন। অভ্যাগতরা বাড়ীর ভেতরে কিছুক্ষণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। বেশীর ভাগ লোকেরা গম্ভীর ও কেতাদুরস্ত। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে হৈ হৈ ও ছুটোছুটি করছে। এছাড়া আর বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ নেই। সব কিছুই বেশ সুশৃঙ্খলে হয়ে যাচ্ছিলো। বোঝাই দায় যে কি করে কি হচ্ছে। আমাদের বাড়ীর লোকেরা কিন্তু বড়ই অস্বস্তির মধ্যে কাটাচ্ছিলো। বেশ খানিকক্ষণ পরেই মেয়েটি বাইরে এলো। মেয়েটিকে এই প্রথম শাড়ী পড়তে দেখলাম। হাতে একটা নারকোল নিয়ে শাড়ী সামলাতে সামলাতে বারান্দা দিয়ে চলে গেলো। বোঝা গেলো নিজের বিষয়ে বেশ সচেতন। আজ সেই রকম সহজ ও স্বাভাবিক চলাফেরা আর নেই। শাড়ী সামলে চলার মধ্যেও একটা জড়তা এসে গেছে। প্রতি-পদক্ষেপেই মনে হচ্ছিলো মেয়েটি তার আসন্ন অনাগত দিনের স্বপ্নে বিভোর। নববধূ বেশে কারুর উপরই ভর দিয়ে চলছিলো না? স্বামীর পাশাপাশি চলছিলো। বেশ স্বাভাবিক, নববধূসুলভ কোনো সঙ্কোচ বা লজ্জা নেই। ওর স্বামীর চেহারার সঙ্গে আমার এক বন্ধুর চেহারার বেশ মিল আছে। কাউকেই কান্না-কাটি করতে দেখলাম না। মা মেয়েকে আদর করে কয়েকবার

চুমু খেলেন। বাবা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মেয়েটির চোখ ছলছল করে ওঠে। তার মুখে নতুন জীবনের নব নব আশা ও আনন্দের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বেড়ার ওপর কাঠবিড়ালীরা এধার থেকে ওধার ছুটে বেড়ায়। মেয়েটিকে কান্নাকাটি করতে না দেখে আমার মা বেশ অবাক হয়েছেন বুঝলাম। মার মতে লেখাপড়া শিখে মেয়েটির মন খুব শক্ত হয়ে গেছে। মা বাপের জন্যে তার কোনো মায়ামমতা নেই। 'আজকাল সবাই এই রকমই হয়··· সর্বস্ব দিয়ে যাদের মানুষ কর, তাদের চোখে দু' ফোঁটা জলও নেই।'

এ সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছিলো না। আমি বুঝতে পারছিলাম যে মার রোদ পোয়াতে বেশ ভালো লাগছিলো। রোদ যেমন যেমন সরছিলো মাও তেমনি তেমনি সরে বসছিলেন। আমার বাবা হঠাৎ বলতে সুরু করলেন, 'আগেকার দিনে মেয়েরা প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় গ্রামের শেষ প্রান্ত অবধি কাঁদতে কাঁদতে যেতো। যার কান্না আসতো না, তাকে মেরে কাঁদানো হোতো। কেন না, লোকেদের বিশ্বাস ছিল তা না হলে মেয়ের জীবন শ্বশুরবাড়ীতে সুখে কাটবে না।'

আজকের দিনে সে রকম কোনো রেওয়াজ না-থাকায় বাবার মনে বেশ কষ্ট বুঝলাম। পুরনো নিয়মকানুন সব যেতে বসেছে, মানুষ মেশিন হয়ে যাচ্ছে—এই সব বলে আক্ষেপ করতে করতে বাবার গলার স্বর বেশ চড়ে গেলো, মনে হোলো বাবা চোখের সামনে আজকের দিনের সর্বনাশী রূপ দেখতে পাচ্ছেন।

আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘের টুকরো ভেসে যায়। সদ্য বিবাহিতা মেয়েকে বিদায় দিতে তার মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা বাড়ীর গেটে এসে দাঁড়ায়। বর পক্ষ নববধূকে নেবার জন্যে 'হেরাল্ড' গাড়ী নিয়ে এসেছেন। গাড়ীটাকে সাজানোর দরুন একটা রঙীন ঘরের মতন দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে গাড়ীটা চলতে থাকে। ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়।

পড়শীর এই বিয়ে দেখে সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছেন আমার ঠাকুমা। এদের এই বিয়ের ধরন-ধারন তিনি মোটেই বুঝতে পারলেন না। না আছে আলোর বাহার, না কোনো ধুমধাম, না আছে চব্যচোষ্য লেহ্যপেয়র ব্যবস্থা। এতো কিপটেমিই বা কেন? আর এই ধরণের শুভ কাজে পড়শীদের না-ডাকাই বা কি ধরণের ভদ্রতা? ঠাকুমা বুঝতে পারেন না—ছ্যা, ছ্যা করেন।

মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে তার বাড়ীর সবাই ফিরে এলেন। এক একটা চেয়ার টেনে সবাই বাইরেই বসে পড়লেন। মেয়েটি চলে যাবার পর মাকে একটু মনমরা দেখলাম। কয়েকজন মিলে তাঁর মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেন। আমার বন্ধু রাধু বাজী ফেলে বলেছিলো যে মেয়েটি বেশ চালু। একটা বড় কিছু হারানোর ব্যথা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই আমার তখন ছিলো না। কেন জানি, সবই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মেয়েটি সম্বন্ধে রাধুর অযাচিত এই উক্তি বা মেয়েটির ব্যাপারে আগে কোনোদিন আগ্রহ না দেখানোর আক্ষেপ, কোনটা যে ঠিক মনে ভাবান্তর ঘটিয়েছে তা বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটির স্বভাব ভালো ছিলো না ভেবে মনকে প্রবোধ দিলাম। কিন্তু এ ভাবনাও কম পীড়াদায়ক নয়। আমার বাড়ীর লোকেরা এদের সহ্য করতে পারতো না, সেইরকম একটা আশঙ্কা বোধহয় আমার মনেও লুকিয়ে ছিলো।

ক্রমশঃ রাত বাড়লো। বেড়ার ওধারে টেবিলের চারধারে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সবাই একে একে উঠে পড়লেন! রোজকার মতো আজও তাঁদের মাঝের ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। দরজার গায়ে আলো পড়ে আলোছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁদের জীবন আবার শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। একজনের অভাব ওঁরা কি রকম ভাবে অনুভব করছেন তা বলতে পারবো না। আমাদের বাড়ীর লোকেরা কিন্তু ওঁদের নিন্দেতে মশগুল।

সুখ

ভোলাবাবু অবসর নিয়েছেন এক সপ্তাহও হয়নি। তার মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেলো।

তিনি ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন। জানলা দিয়ে গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিকরে পড়েছে ভোলাবাবুর টাক ভরা মাথায়। ছোট্ট শিশুর হাতের মত গরম ও তুলতুলে। ভোলাবাবু শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন। দূরে তাকিয়ে দেখেন সূর্য পাহাড়ের অন্তরালে কোথায় যেন লুকিয়ে গেছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ মিলিয়ে যায়নি—যেমন ছিলো, তেমনি আছে।

ভোলাবাবু উঠে পড়লেন। সামনের দেওয়ালে হাতটা রাখলেন। কিছুক্ষণ আগে সূর্যের রঙ এখানে খেলা করছিলো। হাত দিতেই উষ্ণ স্পর্শ পান। হাতটা নিজের গালে রাখলেন। গালের চামড়া থেকে হাতের তেলোর তফাতটা এক ইঞ্চির মত। মনটা বেদনার্ত হয়ে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে সবুজ ঘাসে লালের আভা ঃ চারদিকের দেওয়ালে রঙের রক্তিম প্রভা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি এগিয়ে যান। পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এখান থেকেই সূর্য দেখা যাচ্ছে। এ পাহাড়ের কিছু ওপরে, যেখানে মেঘ-বৃষ্টি, তারই আশেপাশে—তাল ও বাবলা গাছের ফাঁকে। ভোলাবাবু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মার্কিনের সাদা পাঞ্জাবী—গোলাপী হয়ে গেছে। দুনিয়ায় কত বিচিত্র সুন্দর জিনিষ আছে ভেবে একটু মুচকি হাসলেন।

ভোলাবাবু চার দেওয়ালের বাইরে একবার তাকিয়ে দেখলেন। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে হরিজন বসতি। কুঁড়ে ঘরগুলো গোধূলির রঙে লম্বা দেখাচ্ছে। সুকালু গাছের মগ ডাল মন্দিরের গা ছুঁয়ে রয়েছে। মন্দিরের পাশে একটা গরু দাঁড়িয়ে ল্যাজ

নাড়ছে। গরুটাকে খুব ভাল করে দেখলেন; গরুটার রঙ লাল কি সাদা, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বা! কি মজার ব্যাপার, আবার মুচকি হাসলেন ভোলাবাবু।

তাঁর নজর পড়লো সূর্যের দিকে। বৃত্তাকার রূপ, কাঁপছে,—কখনও বড়, কখনও বা ছোট, ভোলাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, 'এই যে বিট্টির মা।'

কোনো জবাব পান না।

আবার চিৎকার করে ডাকলেন: 'ও বিট্টির মা।'

'কি হোলো?' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বিট্টির মা বেরিয়ে আসে।

'আরে এদিকে এসো না।'

বিট্টির মা ছুটে এসে ভোলাবাবুর পাশে দাঁড়ালো।

'সামনে ওদিকে দেখোতো।' বিট্টির মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'রাস্তার দিকে নয়, ঐ দূরে তালগাছের পেছনে।' বিট্টির মা গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে দেখতে লাগলো। ভোলাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে খুশীতে ভরে উঠলো। 'কি সুন্দর, না?' ভোলাবাবু গদগদ হয়ে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, খুব চমৎকার'—বিট্টির মা বলে।

'খুব চমৎকার? কোনটা?' ভোলাবাবু ডান দিকে ঘুরলেন।

'খচ্চরগুলো ইঁট বয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর মানুষগুলো পেছনে, এই তো।'

ভোলাবাবু খুব জোরে হেসে উঠলেন। 'স্ত্রী জাত তো! খচ্চর আর গাধা ছাড়া আর কী নজরে পড়বে?'

'কী দেখতে বলছো?'

'কিছু না, যাও ঘরে গিয়ে ফেন গালো আর আটা মাখো।'

'না, আমাকে একটু দেখাও না,' জেদ ধরে বিট্টির মা।

'কি দেখাবো ছাই? খচ্চর দেখাবার জন্যে এতক্ষণ পরিশ্রম করলাম?'

'তবে কি দেখাতে চাও?' বিট্টির মা জোর দিয়ে বলে ওঠে।

'তাল গাছের ফাঁকে কিছু দেখতে পাচ্ছো? আবছা আবছা ঐ যে পাহাড়?'

'হ্যাঁ।'

'আর ঐ লাল—রঙিন সূর্য?'

'হ্যাঁ।'

'সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার সোনালী মেঘ?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তবে দেখো। প্রাণ ভরে দেখো।'

'এ আর কি দেখবো। তুমি আজ দেখছো : আমি সারাজীবন ধরেই দেখে আসছি।'

'হুঁ'—ভোলাবাবু জোরে ঘাড নাড়লেন। 'সারাজীবন ধরেই দেখছো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা খুবই ভাল কাজ কবেছো। এখন এক কাজ করো, যাও গিয়ে উনুন ধরাও।'

বিট্টির মা ভোলাবাবুর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে।

'আমি বলছি···চলে যাও,' ভোলাবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন।

বিট্টির মা ভয় পেয়ে পালালো।

ভোলাবাবু দু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন।

সূর্য, মেঘ, মেঘের নানা রঙ, রঙের বিচিত্র বর্ণরেখা, পাহাড়ের সামনের দিকের আবছা আলো, আবছা আলোর মাথায় ক্ষীণ হয়ে আসা কুয়াসার লাল আভা···

ভোলাবাবু সারাজীবন তার-বাবু হয়েই কাটিয়ে দিলেন। পাহাড়ী এই জেলাতেই থাকতেন। এমন গ্রাম নেই যা দেখেননি, এমন জেলা নেই যেখানে যাননি, এমন সহর নেই যেখানে তিনি ঘোরেন নি। কিন্তু এই সূর্য! এই সূর্য এতদিন কোথায় ছিলো? এই গোধূলি সন্ধ্যা এতদিন কোথায় ছিলো?···ভোলাবাবু আজ এ কী দেখছেন?

একজন বাচ্চাকে খেলা করতে দেখে ভোলাবাবু ডাকলেন—'কে রে, নীলু নাকি ?'

নীলু লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো।

'আর সব কোথায় ?'

'খেলছে।'

'কোথায় ?'

নীলু বাড়ীর পেছনের ময়দানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

'দৌড়ে যা তো। সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।' নীলু এক দৌড় দেয়।

ভোলাবাবু আবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন—কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, কখনও গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে, কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে। আনন্দে তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন।

ভোলাবাবুর মনে হোলো বৃত্তাকার সূর্যের ওপরের ভাগে যেখানে কালো মেঘের পাতলা আঁচড়—সেটা ডুবে যাচ্ছে। সূর্যের কিরণ এখন ওদিকে নেই, ময়দানে নেই, সবুজ ক্ষেতে নেই, কুঁড়ে ঘরে নেই। মেঘ পেরিয়ে আকাশ ছুঁয়ে সে চলে যাচ্ছে, নানা বিচিত্র রঙে, নানা বিচিত্র ধারায়।

'নীলু'—ভোলাবাবু পেছন ফিরে চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ভোলাবাবু বিড়বিড় করে বললেন—'গেল কোথায় সব ?'

'আরে এ কে যায় রে ?'

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা উট যাচ্ছিল। উটের পিঠে ময়লা কাপড় জামা পরা একজন লোক। নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি ফুঁকছিলো।

'ওহে তোমাকেই বলছি।' উটের পিঠে বসে-থাকা লোকটি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলো।

'এই যে সামনের দিকে: ঐ তালগাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখ তো। বলতো, ওখানে কি আছে।'

উট-ওয়ালা একবার ওদিকে তাকিয়ে আবার চলতে লাগলো। ভোলাবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'শালা।'

সূর্য ডুবে গেছে। ভোলাবাবু ওদিক থেকে সরে গেলেন। চোখ বুজে আরাম কেদারায় চুপচাপ বসে পড়লেন। মনটা উদাস হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালা আসে। সামনের টেবিলের ওপর রাখা হয়। ভোলাবাবু চোখ খুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিট্টির মা।

'আমার ধুতি আর লাঠিটা নিয়ে এসো তো।'

'কেন, কোথায় যাবে?' ভোলাবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

ধুতি ও লাঠি এলো। ধুতি পরে লাঠিটা হাতে নিয়ে ভোলাবাবু বেরিয়ে পড়লেন। তিনি নিজের মনে বিচার করতে লাগলেন, এটা একটা ছোট-খাটো ব্যাপার নয় যে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি আজ যাবেন, বলবেন। সবাইকে বলবেন। সবার আগে যাবেন মাধবের কাছে। ঐ যে মাধব মোক্তার। ও সব জানে, সব বোঝে। তারপর ওকে নিয়ে যাবেন অন্য কোথাও।

ভোলাবাবু বটগাছের কাছে গিয়ে দেখেন বীজ গুদাম। কোথা থেকে জেলা সাহেবও এসে পড়েন। সেখানে আরোও কয়েকজন ছিলো। উনি ভেতরে ঢুকলেন।

'আসুন, আসুন, তার-বাবু বসুন', জেলা অফিসার বললেন। ভোলাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন। বুড়ো মানুষের চোখে কয়েকটা নতুন মুখ ধরা পড়ে। ভোলাবাবুর উপস্থিতি কথাবার্তায় বাধ সাধে।

'কি খবর বলুন। আপনাকে যেন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'চিন্তিত ঠিক নয়, ঐ একটু,' ভোলাবাবু হাসবার চেষ্টা করেন। একটু বাদেই আবার আলাপ আলোচনা সুরু হয়ে যায়। জেলা অফিসার সাহেব বললেন, 'এবার খালে খুব মাছ উঠছে।'

অন্য একজন বললেন—'জেলা সায়েব, মাছ ধরার সখ থাকলে আপনি একটা কাজ করুন।'

'কি ?'

'রাত্রিবেলা ভরা নদীতে জাল ফেলুন।'

'হ্যাঁ সাহেব, রাত্রে মাছ ওঠে', আর একজন মাথা নেড়ে সায় দেয়। ভোলাবাবু ভাবলেন এই সুযোগ।

তিনি একটু এগিয়ে এসে বললেন—'বিকেলে জাল ফেললে কেমন হয় ?'

'হ্যাঁ, তাও করা যায়', জেলা অফিসার সায় দেন।

ভোলাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—'বিকেল মানে ঠিক যখন সূর্য ডোবে ?'

প্রথম লোকটি বলে ওঠে—'আরে, বিকেল-টিকেল কিছুই নয়। মাছ ধরার সময় তো মাঝ রাত। আর সেটাই তো নিয়ম।'

মাঝ রাতে মাছ ধরাই সবচেয়ে প্রশস্ত। ভোলাবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। হাতে সুযোগ এসেও ফস্কে গেলো। মনে খুবই ব্যথা পান। কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভোলাবাবু ভাবলেন এত লোকের মাঝখানে বলাটা ঠিক হবে না। একা পেলে বলা যেতো। ধৈর্য ধরে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই ওঠার নাম করে না।

'জেলা অফিসার সাহেব'—ভোলাবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন। জেলা অফিসার ফিরে তাকাতে আবার বললেন—'আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে ?' জেলা অফিসার গম্ভীর হয়ে বলেন—'আচ্ছা, বলুন।'

ভোলাবাবু উঠে পড়ে ইশারা করলেন। জেলা অফিসারও উঠে দাঁড়ান। ভোলাবাবু তাঁকে গুদাম ঘরের নীচে নিয়ে গেলেন। একেবারে নিরালায়। 'জেলা অফিসার সাহেব আপনার কাছে আর কি লুকোবো। আর আপনি তো নিজেও সমঝদার।'

'আরে ভার-বাবু, আপনি যে কি বলেন !'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভোলাবাবু। তারপর বললেন—'আপনি তো রোজ বিকেলে বেড়াতে যান, না?'

'হ্যাঁ।'

'রাত হলে ফেরেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে আপনি নিশ্চয়ই সূর্য দেখেছেন।'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

ভোলাবাবু খানিকক্ষণ অফিসারের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জেলা অফিসারকে নীরব দেখে বললেন—'আজকে সূর্য কি চমৎকার ছিলো না? জেলা অফিসার সাহেব, এত অপরূপ লাগছিলো কি বলবো! সারা পৃথিবী রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিলো! আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

জেলা অফিসার বললেন—'এটা তো নতুন কিছু নয়। এরকম রোজই হয়। এটা তো রঙেরই ঋতু।'

ভোলাবাবু বিস্মিত হলেন—'না সাহেব, রোজই কি এরকম হয়?'

জেলা অফিসার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন—'যাক সে কথা; কি ব্যাপার আগে সেটাই বলুন।'

ভোলাবাবু চুপ করে গেলেন। বেশ একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হলেন।

জেলা অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—'ব্যাপার কি বলুন তো?'

ভোলাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনাকে আর কি বলবো সাহেব।'

ভোলাবাবু সোজা বাজারের দিকে চললেন। বাজারের এদিকটায় ততটা ভীড় নেই। রাস্তায় আলো। পরিচিত অপরিচিত লোক। ভোলাবাবু আপন মনেই চলেছেন। ভেবে বেরিয়েছিলেন যে সূর্যের সম্বন্ধে অনেককে অনেক কথাই বলবেন, কিন্তু আর কাউকেই কিছু বললেন না। খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

জেলা অফিসারের ঘরে কেন যে গিয়েছিলেন—সেটা ভেবে আরও কষ্ট হোলো। লোকে বলে জেলা অফিসার বুদ্ধিমান, যোগ্য লোক। শুনে শুনে তিনিও সে কথা বিশ্বাস করতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর আসল রূপ খুলে গেছে। যদি সূর্য না দেখতেন তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিলো। কিন্তু তিনি সূর্য দেখেছেন এবং বেশ ভাল ভাবেই দেখেছেন।

ভোলাবাবু সব কথা বাধ্য হয়ে আবার নতুন করে ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হোলো এ এমন একটা জিনিষ যা সবাইকে বোঝানো যায় না, আর সবাই বুঝবেও না। এ কথা যত ভাবেন দুঃখ তত বেশী হতে থাকে। ধীরে ধীরে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন—হ্যাঁ, জেলা অফিসার অনেক পড়াশুনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু শুধু পড়লেই কি হয়? বাস্তব জীবনে পড়া আর বোঝা তো এক জিনিষ নয়···আর তা ছাড়া এটা এমন একটা বিষয় যা বুঝতে হলে বয়স আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

ভোলাবাবু মাধবের বাড়ীর গলিতে ঢুকলেন। দেখলেন, হাতে একটা বালতি নিয়ে মাধব অন্য গলি দিয়ে আসছে। গলিটা একটু অন্ধকার।

ভোলাবাবু চিৎকার করে ডাক দেন—'মাধব'।

'বাবু, আমি সোহন।'

'ও, তুমি। হ্যাঁ, তাতে কিছু এসে যাবে না', তিনি সোহনকেই ডাকলেন।

সোহন বললো—'মোক্তার সাহেব দুপুরবেলাতেই বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'কাজে, একটা গ্রামে।'

'ও আচ্ছা, দুপুরবেলা থেকেই গায়েব বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আচ্ছা, তাহলে কোন জায়গা থেকে সূর্য দেখেছিলো? ভোলাবাবু

নিজের মনেই বিচার সুরু করেন। সোহনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন বয়স এর কত, এর অনুভূতিই-বা কতটা হতে পারে।

ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি বিকেল বেলা কি করো?'

'গোয়ালে যাই। খোল তৈরী করি। জাবনা বানাই, দুধ দুই আর…'

'সূর্য দেখিস?'

'সূর্য?' সোহন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তুই আজকে সূর্য দেখেছিলি?'

'কোন সূর্য? সুবজ তেলী?'

'না, তোর ঘানি। উজবুক কোথাকাব', ভোলাবাবু তেড়ে উঠলেন।

সোহন হাসতে লাগলো। 'আমি পড়াশুনা জানি না বাবু। কি করে বুঝবো, আপনি কাকে খুঁজছেন।'

'আমি আকাশের সূর্যেব কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, বাবু দেখেছি।'

'তোর নতুন কিছু কি মনে হয়েছে?'

'তার মানে'—সোহন বোকাব মত বললো।

'কিছুটা গোল গোল, কিছুটা লাল—লাল', ভোলাবাবু সোহনকে বোঝাবার চেষ্টা কবলেন।

'তো?'

'তোর মাথা'. ভোলাবাবু বেগে ওঠেন। 'আরও মোষ পাল।'

ভোলাবাবু ওখান থেকে চলতে লাগলেন। মনে যে ক্ষীণ আশার আলো ঝিলিক দিচ্ছিলো তাও এবার মিলিয়ে গেলো। রেগে উঠে তিনি যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন—'আমরা সত্যি কি হয়ে যাচ্ছি?'

বাড়ীতে এসে দরজা খুলে ভেতরে এলেন। লাঠিটা রেখে

বিছানায় শুয়ে পড়েন। হায়, ছুনিয়া কত বদলে গেছে। বার বার একই কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে।

ভোলাবাবু ভাবেন কালও গোধূলির সূর্য দেখা যাবে। তিনি সবাইকে ডাকবেন। সূর্য দেখাবেন। তাদের বোঝাবেন, দেখো এই ছুনিয়ায় উনুন, যোজনা, আদালত আর এই উট কিংবা শুধুই সব কিছু নয়। সূর্যও আছে। ঐ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওঠে, তাল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। কাঁপে। আবার সে মুহূর্তও আসে, যখন পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে যায়। আর ডোবার আগে তার মোলায়েম কিরণে তোমার টাক মাথায় আলোর কণা ছড়িয়ে দেয়।

ভোলাবাবুর হঠাৎ মনে পড়লো : মাথায় হাত দিলেন। খুঁজলেন। ঐ অংশটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। একটা কথা ভেবে তিনি আরও ছুঃখিত হলেন—আগামী কাল এসব কথা বুঝতে পারবে এমন কে আছে -কত লোকই বা আছে ? তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন।

ঘরের ভেতরে কেউ যে এলো: ভোলাবাবু তা টের পেলেন। দেখলেন, টেবিলে খাবার থালা সাজানো আর চারপায়ের এক কোণে বিট্টির মা বসে।

'বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে ?'

'কোথাও না', ভোলাবাবু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দেন।

'শরীর ভালো আছে তো ?'

ভোলাবাবু কোন জবাব দিলেন না। বিট্টির মা চাদরের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছুটো পায়ে হাত দিলো। 'ঠিক তো আছি'। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরই মধ্যে ঘরে এসে পড়লো বিট্টি, নীলু আর অন্য বাচ্চারা।

'এখন ওঠো, খেয়ে নাও।'

'আমি আজ খাবো না।'

বিট্টির মা বিস্মিত হোলো—'কেন ?'

ভোলাবাবু বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তাঁকে উদাস ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বললেন—'দেখো, বলতে গেলে আমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, এই বাড়ীটাও আছে, বিষয়-সম্পত্তিও কম নেই। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনও আছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, কেউ কারো নয়।'

'তুমি এ সব কি বলছো?'—বিট্টির মার চোখ ছলছল করে উঠলো।

'কেউ যখন আমার দুঃখ বুঝতে পারে না, তখন কিসের স্ত্রী, কিসের ছেলেমেয়ে?'

বিট্টির মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'আমার আপন বলতে কেউ নেই'—ভোলাবাবুর গলাও ধরে আসে।

'না, না, এসব তুমি কি বলছো? কি হয়েছে তোমার?' বিট্টির মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মাকে কাঁদতে দেখে বাচ্চারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

'এত কান্নাকাটির কি আছে? তোমরা যাও না, খাওয়া দাওয়া করো। আমি খাবো না।' বিমর্ষ ভোলাবাবু পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়লেন।

বিট্টির মা বাচ্চাগুলির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে জোরে কেঁদে উঠলো। বাচ্চারাও চেঁচাতে সুরু করে।

ভোলাবাবুও বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। বিট্টির মাকে এক ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলেন—'বিট্টির মা, এসব কি হচ্ছে?'

বিট্টির মা কোনোদিকে কাণ না দিয়ে আরও জোরে কান্না জুড়ে দিলো। ভোলাবাবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন এবং নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সবার মধ্যে ভোলাবাবুর স্বরই সবচেয়ে তীব্র ও করুণ শোনাচ্ছিলো।

লেখক-পরিচিতি

1. **চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী ঃ**

(1883-1920) পাঞ্জাবের গুলের স্থানে এঁর জন্ম। প্রথমে আজমীরের মেয়ো কলেজের শিক্ষক ছিলেন। পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত মহবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল হন। ইনি পুরাতত্ব ও ভাষাবিদ ছিলেন। 'কছুয়া ধর্ম্ম', 'মারেসি ভোঁহি', ও 'কুঠাউঁ' নামে হিন্দিতে কয়েকটি সরস প্রবন্ধ ও মোট তিনটি হিন্দী গল্প রচনা করেন। 'উসনে কহা থা' গল্পটি 1915 সালে 'সরস্বতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

2. **প্রেমচন্দ ঃ**

(1880-1936) উত্তর প্রদেশের বেনারসের লমহীতে এঁর জন্ম। প্রথমে উর্দুতে লেখেন, পরে হিন্দীতে। ইনি 'জাগরণ' সাপ্তাহিক পত্রিকার ও 'হংস' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কমবেশী বারোটি উপন্যাস ও দুশো পঁচিশটি গল্প লেখেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'সেবাসদন', 'প্রেমাশ্রম', 'রঙ্গভূমি', 'কর্মভূমি', 'গবন' ও 'গোদান' উল্লেখযোগ্য। আট খণ্ডে প্রকাশিত 'মান সরোবর'-এ তাঁর অধিকাংশ গল্পই ছাপা হয়েছে। 'কফন' প্রকাশিত হয় 1936 সালে।

3. **জয়শঙ্কর প্রসাদ ঃ**

(1889-1937) উত্তর প্রদেশের বেনারস সহরে জন্ম। ইনি আসলে কবি ও নাট্যকার। উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। এঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'কামায়নী'। নাটকের মধ্যে 'স্কন্দগুপ্ত' আর 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রসিদ্ধ। নামকরা উপন্যাস 'তিতলী' ও 'কঙ্কাল'। 'ছায়া', 'প্রতিধ্বনি', 'ইন্দ্রজাল', 'আঁধি', ও 'আকাশদীপ' প্রভৃতি গল্পেরও রচয়িতা।

4. জৈনেন্দ্র কুমার :

1905 সালে উত্তর প্রদেশের আলিগড়-এর কড়িয়াগঞ্জ জেলায় এঁর জন্ম। স্থায়ী বাস দিল্লীতে। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, কাহিনীকার ও দার্শনিক। এঁর নামকরা উপন্যাস—'পরখ', 'সুনীতা', 'ত্যাগপত্র' ও 'জয়বর্ধন'। এঁর অধিকাংশ গল্পই 'জৈনেন্দ্র কী কহাঁনিয়া' নামে গ্রন্থমালার দশটি খণ্ডে প্রকাশিত।

5. যশপাল :

পাঞ্জাবের পূর্বজ কাঙ্গড়ার ফিরোজপুর ক্যান্টনমেণ্টে 1903 সালে জন্মান। স্থায়ী বাস লক্ষ্ণৌ-এ। বহুকাল বিপ্লবী দলের সঙ্গে কাজ করেন ও জেল খাটেন। 1938 সাল থেকে লিখতে সুরু করেন। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক ও চিন্তানায়ক। 'দাদা কম্‌রেড', 'পার্টি কমরেড', 'দেশদ্রোহী', 'মনুষ্য কে রূপ', 'দিব্যা' ও 'ঝুঠা-সচ' তাঁর নামকরা উপন্যাস। গল্পের মধ্যে 'পিঞ্জরে কী উড়ান', 'জ্ঞানদান', 'বহু দুনিয়া', 'ধর্ম যুদ্ধ', 'চিত্র কা শীর্ষক' ও 'তুমনে কেঁও কহা থা ময় সুন্দর হুঁ' উল্লেখযোগ্য।

6. রাঙ্গেয় রাঘব :

(1923-1938) ইনি দক্ষিণ দেশীয়। মা কানাড়ী ও পিতা তামিল্‌নাড়ু। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি আগ্রা ও ভরতপুরে কাটান। চিন্তানায়ক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি আছে। কবিতাও লেখেন। উপন্যাসের মধ্যে নামকরা যায় 'ঘরৌন্দে', 'মুর্দোঁ কা টীলা', 'বিষাদ মঠ' ও 'কবতক পুকারু'। এঁর গল্প সঙ্কলনের নাম 'মেরী প্রিয় কহাঁনিয়া'।

7. ফণীশ্বরনাথ রেণু :

বিহারের পূর্ণিয়ায় 1921 সালে জন্ম। ইনি উপন্যাস ও গল্প দুইই লিখেছেন। 'ময়লা আঁচল', 'পরতী পরিকথা', 'দীর্ঘতয়া' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস। গল্পের মধ্যে নামকরা যায় 'ঠুমরী' আর 'আদিম রাত্রি কী গন্ধ'।

8. নির্মল বর্মা :

হিমাচল প্রদেশের সিমলা সহরে 1929 সালে জন্ম। স্থায়ী নিবাস দিল্লী। গত কয়েক বছর ধরে য়ুরোপে আছেন। ইনি সাধারণতঃ গল্প লেখেন। 'বেহ দিন' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন। গল্পের মধ্যে নাম করা যায় 'পরিন্দে', 'জলতী ঝাড়ী' ও 'পিছলী গর্মিয়োঁ মেঁ'।

9. রাজেন্দ্র যাদব :

উত্তর প্রদেশের আগ্রায় 1929 সালে জন্ম। সম্প্রতি দিল্লী বাসিন্দা। একযোগে গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক। এঁর একটি কবিতা সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। এঁর নামকরা উপন্যাস হোলো 'সারা আকাশ', 'উখড়ে হুয়ে লোগ', 'শহ অউর মাত', 'কুলটা অউর যন্ত্রবিদ'; গল্পের মধ্যে 'খেলখেলৌনে', 'যাঁহা লক্ষ্মী কয়েদ হ্যায়', 'ছোটে ছোটে তাজমহল', 'কিনারে সে কিনারে তক', 'প্রতীক্ষা' ও 'টুটনা'।

10. মোহন রাকেশ :

পাঞ্জাবের অমৃতসরে 1925 সালে জন্ম। উপস্থিত দিল্লী নিবাসী। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্প লেখক। নামকরা নাটক 'আষাঢ় কা একদিন', 'লহরোঁ কে রাজহংস' ও

'আধে অধুরে' ; উপন্যাস হোলো 'অঁধেরে বন্দ কমরে'; আর গল্প 'নয়ে বাদল', 'জানওয়ার অউর জানওয়ার', 'এক অউর জ়িন্দগী' ও 'ফৌলাদ কা আকাশ'।

11. কমলেশ্বর :

উত্তর প্রদেশের মৈনপুরে 1932 সালে জন্ম। কিছুদিন এলাহাবাদে থাকার পর দিল্লীবাসী হন। উপস্থিত বোম্বাইতে আছেন। উপন্যাস ও গল্প দুই-ই লেখেন। গল্পের মধ্যে 'রাজা নিরবংসিয়া', 'কসবে কা আদমী', 'খোঈ হুঈ দিশায়েঁ', ও 'মাঁস কা দরিয়া' নামকরা। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —'এক সড়ক, সত্তাবন গলিয়াঁ', 'ডাক বঙ্গলা' আর 'তীসরা আদমী'।

12. শ্রীকান্ত বর্মা :

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে 1931 সালে জন্ম। সম্প্রতি দিল্লীবাসী। ইনি কবি। উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। কবিতাবলীর মধ্যে 'মটকা', 'মেঘ', 'মায়াদর্পণ' ও 'দিনারম্ভ' নামকরা। 'দূসরী বার' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস। গল্পগুচ্ছর মধ্যে 'ঝাড়ী' ও 'সংবাদ' নামকরা।

13. অমর কান্ত :

উত্তর প্রদেশের বলিয়ায় 1924 সালে এঁর জন্ম। এলাহাবাদের স্থায়ী বাসিন্দা। ইনি সাধারণতঃ গল্পই লেখেন। উপন্যাসও লিখেছেন। নামকরা গল্প-সংকলন 'জ়িন্দগী' ও 'জোঁক'।

14. জ্ঞানরঞ্জন ঃ

উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে 1936 সালে জন্মান। গল্পই সাধারণতঃ লেখেন। নামকরা গল্প-সংকলন 'ফেন্সকে ইধর অউর উধর'।

15. কাশীনাথ সিং ঃ

1937 সালে উত্তর প্রদেশের বেনারসে জন্ম। ইনি গল্প-লেখক। প্রসিদ্ধ গল্প সংকলন 'লোগ বিস্তরোঁ পর'।

ভারতবর্ষ :— দেশ ও দেশবাসী

(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

ভারতবর্ষের সাধারণ পাখি

চিত্রসংগ্রহ : ডঃ সালিম আলি ও
শ্রীমতী লাইক ফতেহ্ আলি ॥

অনুবাদ : স্বর্গীয়া উষা গঙ্গোপাধ্যায়
ডঃ নীলরতন সেন ॥

দাম : দশ টাকা ।

সাধারণ বৃক্ষ : ডঃ এইচ. সান্তাপাউ

অনুবাদ : শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ কর ॥

দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ।

পুষ্প-বৃক্ষ : ডঃ এম. এস. রণধাবা

অনুবাদ : শ্রী সুকুমার বসু ॥

দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা ।

দেশ ও মাটি : ডঃ এস. পি. রায়চৌধুরী

অনুবাদ : শ্রী এন. সি. দেবনাথ ॥

দাম : চার টাকা পঁচাত্তর পয়সা ।

রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

কাজী নজরুল ইসলাম : শ্রী বসুধা চক্রবর্তী

দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা।

শঙ্করদেব : ডঃ মহেশ্বর নেওগ

অনুবাদ : শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত॥

দাম : দুই টাকা।

সমুদ্রগুপ্ত : ডঃ লল্লনজী গোপাল

অনুবাদ : শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়॥

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ত্যাগরাজ : অধ্যাপক পি. শম্বমূর্তি

অনুবাদ : শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ কর॥

দাম : দুই টাকা।

গুরু গোবিন্দ সিং : ডাঃ গোপাল সিং

অনুবাদ : শ্রী গুরুনেক সিং॥

দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবীর : ডঃ পারসনাথ তিবারী

অনুবাদ : শ্রী শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়॥

দাম : দুই টাকা।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর : শ্রী ভি. আর. আধাওড়ে

অনুবাদ : শ্রী সুধাংশু কুমার সাহা॥

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গুরু নানক : ডঃ গোপাল সিং
অনুবাদ : শ্রী গুরুনেক সিং ॥
দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে : ডঃ কৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকার
অনুবাদ : শ্রী সুনীল কুমার বসু ॥
দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা : (আদানপ্রদান)
(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

তাসের প্রাসাদ : শ্রীমতী মুপ্পাল রঙ্গনায়কম্মা
অনুবাদ : শ্রীমতী মিনতি দেবী ॥
দাম : তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

কথা-ভারতী (তামিল ছোটগল্প)
সম্পাদক—মি. পা. সোমাসুন্দরম ॥
অনুবাদ : অজিত কুমার দত্ত ॥
দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কথা পাঞ্জাব—(পাঞ্জাবী গল্প সংকলন)
সম্পাদক : ডঃ হরভজন সিং
অনুবাদ : প্রবোধ কুমার মজুমদার ॥
দাম : চার টাকা পঁচিশ পয়সা।

ভুলে যাওয়া ছবিগুলি : শ্রী ভগবতীচরণ বর্মা
অনুবাদ : শ্রীমতী কণিকা তোমর
দাম : আট টাকা পঁচিশ পয়সা।

অশোকের অনুশাসন :

সম্পাদনা ও

ইংরাজী অনুবাদ : এন্, এ, নিকম ও রিচার্ড ম্যাককেওন

অনুবাদ : সাবিত্রী দত্ত

দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা।

আকবর : লেখক : লরেন্স্ বিনিয়ান

অনুবাদ : শিশিরকুমার দাস

দাম : তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠন :

স্বর্গীয় ডঃ জাকির হুসেন

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

দাম : এক টাকা।

গৌতম বুদ্ধ—লেখক : আনন্দ কুমারস্বামী ও

আই, বি, হর্ণার

অনুবাদ : সুকুমা‍র দত্ত

দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বীর বিদ্রোহী— লেখক : ডেনিস কিন্‌কেয়াড

অনুবাদ : শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

দাম : পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা।

নেহরু বাল পুস্তকালয় সিরিজের প্রকাশিত বই

বাপু (মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী—দুই খণ্ডে)	লেখা ও চিত্র : এফ. সি. ফ্রীটস
কাশ্মীর	চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্ম্মা লেখিকা : মালা সিং
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
শিখর থেকে শিখরে	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং
স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কথা	বিষ্ণু প্রভাকর
ভারতে বিদেশী যাত্রী	কে. সি. খান্না
আমাদের রেলের কথা	জগজ্জিৎ সিং
এস, আমরা নাটক করি	উমা আনন্দ
বাঘের মাসী বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী
সে অনেক কালের কথা—১ম খণ্ড	এম. চোকসী ও পি. এম. যোশী
রোহান্তা ও নাস্ত্রিয়া	কৃষ্ণ চৈতন্য
যুগ যুগের কাহিনী	শান্তা রঙ্গচারী
বড়পানি	লীলা মজুমদার
বীর কাহিনী	রাজেন্দ্র অবস্তি

প্রত্যেকটি বইয়ের দাম ১'৫০

এইসব বই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়